ইতিহাস

দ্বি বার্ষিক **সেমেস্টার ভিত্তিক** স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

এম এ তৃতীয় সেমেস্টার

সাধারন নির্বাচিত পাঠ - **৩১২**

COR-312

Modern World-19th and 20th Centuries

পাঠ সহায়ক গ্রন্থ

Directorate of Open and Distance Learning (DODL),

University of Kalyani,

Kalyani, Nadia.

<u>বিষয় সমিতিঃ</u>

১) শ্রী অলোক কুমার ঘোষ (প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) – সভাপতি।

২) ডঃ সুতপা সেনগুপ্ত (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)- সদস্য।

৩) অধ্যাপক অনিল কুমার সরকার (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৪) অধ্যাপক রূপকুমার বর্মণ (ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)- সদস্য।

৫) অধ্যাপক মনশান্ত বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, সিধু-কানহু-বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৬) শ্রী সুকৃত মুখাজ্জী (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৭) শ্রীমতী পুবালি সরকার (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)-সদস্য।

৮) অধিকর্তা, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়) - আহ্বায়ক।

- মুদ্রণ জুন ২০২৩ ।
- গ্রন্থটি বিভিন্ন বই ও ইন্টারনেট সূত্র থেকে তথ্য একত্র করে নির্মিত।
- প্রণেতাগণ এর মৌলিকত্ব দাবী করেন না।

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Amalendu Bhunia, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Date: 24.06.2023

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani,
Kalyani, Nadia,
West Bengal

Syllabus

COR-312: Modern World-19th and 20th Centuries

Block- 1: Forces of continuity and change in the 19th century world-

Unit-1: Revolutions, both political and industrial, revisited –

Unit-2: Growth of capitalism and imperialism - England, France, Germany, Italy and Japan

Unit-3: Spread of liberalism, nationalism and socialism

Block- 2: The world in Wars

Unit-4: The world in Wars

Unit-5: Changes in politics between two World Wars

Unit-6: Crisis in the capitalist power block and the socialist challenge the Sino-Soviet rift-decolonization.

Block- 3: The Bipolar world

Unit-7: The bipolar world from Cold War to Détente

Unit-8: Spread of regional tensions in Palestine, Cuba, Korea, Vietnam, Afghanistan and Kashmir

Unit -9: New trends in water and oil politics - the nuclear diplomacy –

Unit-10: Non-aligned Movement and the Third World - concept of world peace UNO and the Third World organizations.

Block- 4: Age of progress

Unit-11: Economy and society agriculture, industry, science and technology-

Unit-12: Apartheid, civil rights movements and feminism.

Block- 5: Genesis and process of disintegration of the socialist block

Unit-13: Disintegration of the socialist block

Unit-14: Rise of neo-capitalism impact on world politics-towards globalization.

Block- 6: Conceptual aspects of globalization

Unit-15: Socio-economic structural changes-rise of the global village through information revolution

Unit-16: cultural transformation-critique of the new notion of development.

ACKNOWLEDGEMENT (Will be Completed in final copy)

Unit-1: Revolutions, both political and industrial, revisited		
Unit-2: Growth of capitalism and imperialism - England, France, Germany, Italy and Japan		
Unit-3: Spread of liberalism, nationalism and socialism		
Unit-4: The world in Wars		
Unit-5: Changes in politics between two World Wars		
Unit-6: Crisis in the capitalist power block and the socialist challenge the Sino-Soviet rift-decolonization.		
Unit-7: The bipolar world from Cold War to Détente		
Unit-8: Spread of regional tensions in Palestine, Cuba, Korea, Vietnam, Afghanistan and Kashmir		
Unit -9: New trends in water and oil politics - the nuclear diplomacy		
Unit-10: Non-aligned Movement and the Third World - concept of world peace UNO and the Third World organizations.		
Unit-11: Economy and society agriculture, industry, science and technology		
Unit-12: Apartheid, civil rights movements and feminism.		
Unit-13: Disintegration of the socialist block		
Unit-14: Rise of neo-capitalism impact on world politics-towards globalization		
Unit-15: Socio-economic structural changes-rise of the global village through information revolution		
Unit-16: cultural transformation critique of the new notion of development.		

পর্যায়- ১

একক-১

বিপ্লবঃ রাজনৈতিক ও শিল্পক্ষেত্রে

৩১২.১.১.০ উদ্দেশ্য

৩১২.১.১.১ ফরাসী বিপ্লবের প্রকৃতি

৩১২.১.১.২ শিল্পবিপ্লব

৩১২.১.১.৩ ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের প্রসার (Industrialisation in Europe)

৩১২.১.১.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩১২.১.১.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৩১২.১.১.০ উদ্দেশ্য

বর্তমান এককটি ছাত্রছাত্রীদের বিপ্লব সম্পর্কিত একটি পূর্ববর্তী ধারণার পুনরায় আলোচনা করেছে। যার উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আকস্মিক আমূল বদল সম্পর্কে ধারণা করা। যেকোনো ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবস্থার ব্যাপক বদল যা সমাজে গভীর প্রভাব আনে তা, বিপ্লব নামে পরিচিত। বিশ্ব ইতিহাসে সেইরকম ফরাসী বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লব বিশাল পরিবর্তন এনেছিল, যা ইতিহাসকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে।

১.৭.২.১ ঃ ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯)

ফরাসী বিপ্লবের কারণগুলির মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কারও মতে, সামাজিক অর্থনৈতিক কারণই বিপ্লবের জন্য দায়ী। আবার কারও মতে রাজতন্ত্রের দুর্বলতাই বিপ্লবের মৌলিক কারণ। আবার কেউ কেউ মনে করেন, দার্শনিকরাই বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেন। ঐতিহাসিকদের এই পরস্পর বিরোধী মতের কারণ হল, তাঁরা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ফরাসী বিপ্লবের কারণ অনুসন্ধান করেছেন। যার ফলে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কারও মধ্যে গড়ে ওঠেনি।

উনিশ শতকের ঐতিহাসিকদের কাছে ফরাসী বিপ্লবের কারণ হলো মানসিক ও রাজনৈতিক। এঁরা বিপ্লবকে 'ওপর থেকে চাপানো' বলে মন্তব্য করেছেন। বার্কের মতে, প্রাচীন রাজতন্ত্র নির্দোষ ছিল। এমনকী তাকে সংস্কারকামী আখ্যাও দেওয়া যেতে পারে। ভলতেয়ার, রুশো, প্রমুখ চার্চ-বিরোধী দার্শনিক এবং ক্রমবর্ধমান ধনিক গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের ফলেই বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে। অর্থাৎ বিপ্লব স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না, ওপর থেকে চাপানো হয়। আবার ঐতিহাসিক ফিশারের মতে রাজতন্ত্রের ব্যর্থতাই বিপ্লবের জন্য দায়ী। তিনি বলেন, রাজতন্ত্র ফ্রান্সের উর্ধতন সম্প্রদায়ের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা রোধ করতে অক্ষম হওয়ায় বিপ্লব ঘটেছিল। গিজো বলেছিলেন, রাজা, চার্চ ও অভিজাতদের স্বৈরাচার বিপ্লব অনিবার্য করে তুলেছিল। অধ্যাপক গুডউইন মনে করেন, বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ কৃষকদের অর্থনৈতিক অভিযোগ ও বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক অধিকারের দাবী নয়। ফরাসী অভিজাত শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল আকাঙ্ক্ষা থেকেই বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। বিপ্লব প্রধানত অভিজাত শ্রেণীর ভুলের ফলেই হয়েছিল। কারণ ১৭৮৭ ও ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এই শ্রেণী তাদের অধিকার ও সুযোগসুবিধা বজায় রাখার জন্য রাজার সংস্কার নীতির বিরোধিতা করেছিল। অভিজাতশ্রেণী কখনই ভাবতে পারেনি যে তৃতীয় সম্প্রদায় প্রত্যেকের পৃথক ভোটের দাবী করতে পারে। সুতরাং অভিজাতশ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল আকাঙ্খার ফলেই বিপ্লব হয়েছিল। কিন্তু ফিশারের মত অনুযায়ী শুধুমাত্র শক্তিশালী রাজতন্ত্র থাকলেই বিপ্লব ঘটত না— একথা মেনে নেওয়া যায় না। আসলে তখন লোকের মনে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের প্রতি ঘৃণা জন্মেছিল। সুতরাং অন্যান্য সমস্যা দূর করতে পারলেও স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে বিপ্লব এড়ানো যেত না।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিকরা বিপ্লব সৃষ্টিতে এইসব কারণকে গুরুত্ব দিতে রাজী নন। ইতিহাসের মার্কসীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মাতিয়ে, লেফেভ্র, ল্যব্রুস প্রমুখ ঐতিহাসিকরা গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণই বিপ্লবের জন্য দায়ী। তাছাড়া বিপ্লবের আগের পঁচিশ বছরের ইতিহাসের উপরও তারা জোর দিয়েছেন। আধুনিক গবেষকরাও বিপ্লবের জন্য এখন আর কেবলমাত্র ভার্সাই ও প্যারিসের ঘটনাবলীর

উপর বিশেষ জোর না দিয়ে প্রদেশগুলির ঘটনাবলীর উপর জোর দিয়ে থাকেন এবং যুক্তি দেখিয়েছেন যে আঠারো শতকের বেশিরভাগ সময়ে কৃষকরা জমি কিনেছে। অলার্দ মনে করেন, ১৭৮৯ সালে সামন্ততান্ত্রিক কর আগের মত এত কষ্টকর ছিল না। অনেক কর হ্রাসও পেয়েছিল। তবে স্বচ্ছলতার ফলে কৃষকরা আর্থিক চাপ আগের মত সহ্য করতে চায়নি। আঁরি সে প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করে বলেন যে কৃষিযোগ্য জমির বেশিরভাগ কৃষকদের হাতেই ছিল; যাজক ও অভিজাত শ্রেণীর হাতে নয়। লাব্রুস আঠারো শতকের দ্রব্যমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির সংখ্যাতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে ১৭৭৮ সাল পর্যন্ত জনগণের অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হতে থাকে। এ সময় তারা জমি কেনে। কিন্তু ১৭৭৮ সালের পর ক্রমাগত মন্দার ফলে ভাগচাষী, ক্ষুদ্রকৃষক ও ক্ষুদ্র পত্তনিদাররা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৭৮৫ সালে ইঙ্গ-ফ্রান্স বাণিজ্য চুক্তির ফলে ইংল্যাণ্ড থেকে পণ্য আমদানী হতে থাকে। স্বভাবতই ফ্রান্সের শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেখা দেয় বেকার সমস্যা। এর উপর দেখা দেয় অজন্মা। খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভূমিহীন কৃষক, শ্রমিক, বেকার সকলেই চরম দুরবস্থার মধ্যে পড়ে। এরা জমিদার, মজুতদার, ধর্মকর আদায়কারী যাজকদের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সুতরাং অবস্থা ভালোর থেকে খারাপ দিকে যাওয়ায় জনগণ নিরাশ হয়ে পড়ে। এই আশাভঙ্গই তাদের মধ্যে বিপ্লবী মানসিকতার সৃষ্টি করেছিল।

১৭৮৯ সালের ফরাসী বিপ্লবের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রত্যেক ঐতিহাসিকই তাদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেছেন। একারণে একটি সামাগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কারও মধ্যে গড়েও ওঠেনি। কারও মতে সামাজিক অর্থনৈতিক কারণই বিপ্লবের জন্য দায়ী। কারও মতে রাজতন্ত্রের দুর্বলতা, আবার কারও মতে দার্শনিকরাই বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেন।

ফরাসী বিপ্লবের কারণ অনুসন্ধানকারী গবেষক ঐতিহাসিকদের মতামতগুলিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়— (ক) 'Voluntarism' বা স্বতঃস্ফূর্তবাদ এবং (খ) 'Structuralism' বা গঠনবাদ। স্বতঃস্ফূর্তবাদী শ্রেণী সংঘাতই ফরাসী বিপ্লবের প্রধান কারণ বলে মনে করেন। এঁরা বিপ্লবকে 'তলা থেকে দেখা'র (history from below) ওপর জোর দিয়েছেন।

ফরাসী বিপ্লবকে তলা থেকে দেখার পত্তন করেন জ্যরেজ ও মাতিয়ে। এঁরা বিপ্লবের পিছনে শ্রেণী সংঘাতের নিদর্শন দেখতে পেয়েছেন। Histoire Socialiste গ্রন্থে জ্যরেজ দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে ফরাসী বিপ্লব ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি বুর্জোয়া বিপ্লব। বণিক, ব্যাঙ্কার, রঁতিয়ার প্রমুখ যারা রাষ্ট্রীয় ঋণখাতে মূলধন বিনিয়োগ করেছিল তাদেরকেই তিনি বুর্জোয়া বলে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে এই বুর্জোয়া শ্রেণী বিপ্লব করেছিল সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে। পরে তিনি স্বীকার করেছেন বুর্জোয়া শ্রেণীর আসল লক্ষ্য ছিল অন্য। বুর্জোয়া বিপ্লব ছিল এক সামাজিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ। অভিজাত ও যাজকরা নানাভাবে রাষ্ট্রীয় শক্তির অপব্যবহার করছিল। এর ফলে জনসাধারণের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছিল এবং রাষ্ট্রও ক্রমশঃ দরিদ্র ও দুর্বল হয়ে পড়ছিল।

আঁরি সে মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের শ্রেণী সংঘাতের ধারণার বিরোধিতা করেন। তিনিই প্রথম বলেন যে মার্কসবাদীরা শ্রেণী বলতে যে 'homogeneous unit' এর কথা বলেন তা বাস্তবে কিছু ছিল না। কারণ, প্রত্যেকটি শ্রেণীর মধ্যে ছিল পরস্পরবিরোধী উপশ্রেণী। এই ধারণাকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন লেফেভ্র। তিনি সাধারণ মার্কসবাদীদের মত ফরাসী বিপ্লবকে নিছক বুর্জোয়া বিপ্লব আখ্যা দেননি। প্রথমতঃ বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী ও 'জনগণ' — এই প্রত্যেকটি শ্রেণির অনেক উপশ্রেণী ছিল এবং এদের মধ্যে স্বার্থগত ঐক্য ও বিরোধ দুইই ছিল। লেফেভ্র কৃষকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এক ধরনের গ্রামীণ বুর্জোয়ার অস্তিত্ব চিহ্নিত করেন। সুতরাং কৃষকশ্রেণীও কোনো অখণ্ড শ্রেণী

ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, কৃষকরা বুর্জোয়াদের কথায় সবসময় চলেনি। তাদেরও একটা নিজস্ব কর্মপদ্ধতি ছিল। তৃতীয়তঃ, বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রধানতঃ রাজকর্মচারী, ইজারাদার, ব্যবহারজীবী ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর লোকেরা। তা শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের হাতে ছিল না। তাছাড়া, লেফেভ্‌র যে গ্রামীণ বুর্জোয়াদের কথা বলেছেন, তাদের মধ্যেও শ্রেণীস্বার্থের ঐক্য ছিল না। ঐতিহাসিক কোবান সামন্ততান্ত্রিক কর ও বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে তারা অনেক করকেই 'সামন্ততান্ত্রিক' বলে মনে করেননি। তাছাড়া কোবান দেখিয়েছেন যে সামন্তপ্রভুরা অনেক কর বুর্জোয়াদের কাছে বিক্রি করে দেয় এবং বুর্জোয়ারা তা কঠোর হাতে আদায় করে।

বিপ্লব সৃষ্টিতে অর্থনৈতিক কারণেরও গুরুত্ব নিয়েও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। জুল মিসেল মনে করেন, জনগণের দুর্দশাই বিপ্লবের কারণ ছিল। অত্যধিক কর, উৎপাদন হ্রাস ও দুর্ভিক্ষের ফলে কৃষক শ্রেণী এক অসহনীয় অবস্থায় পৌঁছায়। ভূমিহীন কৃষক ও শহরের সাঁকুলোৎ শ্রেণী আর্থিক সংকটে পড়ে। অন্যদিকে ঐতিহাসিক তোকবিল এই মতের সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে কৃষকদের ক্রমবর্ধমান সম্পদই বিপ্লবের কারণ; দারিদ্র্য ও দুর্দশা নয়। তিনি মনে করেন, কৃষকদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির ফলে সামন্ততন্ত্রের অবশিষ্ট চিহ্নগুলিকে তারা আর সহ্য করতে চাইছিল না। ঐতিহাসিক লুচিস্কির ব্যাখ্যার মূল কথা হল সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন সমাজে নতুন শ্রেণী বা গোষ্ঠীস্বার্থের উদ্ভব ঘটায় এবং প্রচলিত সরকার ও সমগ্র সামাজিক বিন্যাসের উচ্ছেদ ঘটানোর জন্য আন্দোলন দেখা দেয়। স্বতঃস্ফূর্তবাদীরা পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত কোন আন্দোলনের উপর গুরুত্ব দিতে চান না। এঁরা বিপ্লব-পূর্ব রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিযোগী রাষ্ট্রগুলির সম্পর্কের উপর জোর দিয়েছেন। গঠনবাদী ঐতিহাসিক থেডা স্কোকপোল বলেছেন যে বুরবোঁ রাজাদের ইউরোপীয় শক্তিবর্গের উপর আধিপত্য বিস্তারের উচ্চাশার পূর্ণ করতে গিয়ে ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যে ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জড়িয়ে পড়েছিল তার ফলে ফ্রান্সের অর্থনীতি ও রাজতন্ত্র ভীষণভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। রাজা ও আমলাতন্ত্র বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে সংঘাতের সম্মুখীন হয়। এর ফলেই বিপ্লব ঘটেছিল। ঐতিহাসিক বেইলী স্টোন অবশ্য মনে করেন, স্বতঃস্ফূর্তবাদ ও গঠনবাদ উভয়ের সংমিশ্রণেই ফরাসী বিপ্লব ঘটেছিল। তবে তাঁর মতে, ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক রাজনীতি তার আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল, তার উপর ঐতিহাসিকদের গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

প্রশ্ন

১। ফরাসী বিপ্লবের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে Voluntarism এবং Structuralism ব্যাখ্যা দুটি কি?

১..৭.২.২ ঃ সহায়ক গ্রন্থ (Reference Books)

1. অমলেশ ত্রিপাঠী : ইতিহাস ও ঐতিহাসিক
2. Arthur Marwick : The Nature of History
3. Albert Soboul : Understanding the French Revolution.
4. G. M. Trevelyan : English Social History.
5. D.H. Pennington : Seventeenth Century Europe.

৩১২.১.১.২ শিল্পবিপ্লব

'শিল্পবিপ্লব' শব্দটি বর্তমানে একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। সাধারনভাবে শিল্পের ব্যাপক বিকাশ কে 'শিল্পবিপ্লব বলা হয়। ফরাসি দার্শনিক অগাস্তে ব্লাঙ্কি (Blanqu) ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম 'শিল্পবিপ্লব' কথাটি ব্যবহার করেন। বিশিষ্ট ইংরেজ ঐতিহাসিক টয়েনবি (A. Toynbee) 'শিল্পবিপ্লব' কথাটি জনপ্রিয় করে তোলেন। শিল্পবিপ্লবের সংজ্ঞা নিয়ে ঐতিহাসিক মতভেদ আছে। সাধারণভাবে মনে করা যায়, অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বহু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কার এবং উৎপাদনক্ষেত্রে তা প্রয়োগের ফলে শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগত মানের ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দেয়, তা শিল্পবিপ্লব নামে খ্যাত। ঐতিহাসিক ফিশার মনে করেন যে, দৈহিক শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রপাতির দ্বারা শিল্পসামগ্রীর উৎপাদন এবং এর ফলস্বরূপ উৎপাদন বৃদ্ধিকে 'শিল্পবিপ্লব' বলা হয়। ঐতিহাসিক প্লাম্ব (J. H. Plumb) বলেন যে, নব্যপ্রস্তর যুগের পর মানব-সভ্যতার অর্থনৈতিক জীবনে এত বড়ো পরিবর্তন আর ঘটেনি। ঐতিহাসিক সিপোল্লা (C. M. Cipolla) বলেন যে, বিশ্ব ইতিহাসের কোনো বিপ্লবই শিল্পবিপ্লবের মতো নাটকীয় নয়।

শিল্পবিল্পবের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ধীর গতিতে বহু মানুষের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। ফরাসি বিপ্লব বা অন্য কোনো বিপ্লবের মতো এতে কোনো চমক বা আকস্মিকতা নেই। তাই হ্যাজেন (Hazen), হেজ (Hayes) প্রমুখ ঐতিহাসিক 'শিল্পবিপ্লব' কথাটির পরিবর্তে শিল্প বিবর্ত ('Industrial Evolution) কথাটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। তবে এ কথাও ঠিক যে, শিল্পক্ষেত্রে এই মন্থর পরিবর্তনটি মানুষের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে আমূল সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এনেছিল তাতে তাকে বিপ্লব বলা অযৌক্তিক না।

এই বিপ্লব সর্বত্র একই সময়ে দেখা দেয়নি। বিপ্লবের সূচনা ইংল্যান্ডে এবং পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ইংল্যান্ডে এই বিপ্লবের সূচনা করে তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। আর্নল্ড টয়েনবির মতে ১৭৪০-৬০ খ্রিস্টাব্দ শিল্পবিচারের সূচনাকাল, আবার ফিলিস ডীন (P. Deane) মনে করেন ১৭৬০-৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই ঘটনা ঘটেছিল ।ঐতিহাসিক রোস্টো (Rostow), হবসবম (E. J. Hobsbawm) প্রমুখ পণ্ডিত, ডীনের মতটিকেই সমর্থন করেন। মার্কিন ঐতিহাসিক Nef অবশ্য সুনির্দিষ্ট কালসীমা চিহ্নিতকরণের বিরোধী এবং তিনি ইতিহাসের প্রবহমানতায় বিশ্বাসী।

- শিল্পবিপ্লব প্রথম ইংল্যান্ডে শুরু হওয়ার কারণ

ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব সূচনাসম্পর্কে পণ্ডিতরা নানা কারণের উল্লেখ করেছেন। অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্য ও কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। এক কথায়, এ সময় ইংল্যান্ডে কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটে যায়। এর ফলে শিল্পের জন্য কাঁচামাল ও শ্রমিকদের জন্য সস্তায় খাদ্যের কোনো অভাব হয় না। আর্থিক সচ্ছলতার ফলে কৃষকেরা শিল্পদ্রব্য ক্রয়ে সমর্থ হয়। এভাবে দেশের অভ্যন্তরে একটি বাজার গড়ে ওঠে।

শিল্প- বিপ্লবের জন্য তিনটি প্রয়োজনীয় উপাদান হল কাঁচামাল, একচেটিয়া বিস্তৃত বাজার ও মূলধন। ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে এর কোনোটিরও অভাব হয়নি। উত্তর আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইংল্যান্ডের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এইসব অঞ্চল থেকে ইংল্যান্ড অবাধে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল সংগ্রহ করত এবং তার উৎপাদিত পণ্যাদিও দেখানে বিক্রি করত। এইসব স্থানে কার্যত একচেটিয়া বাণিজ্যের ফলে ইংরেজ বণিকরা ব্যাপক মুনাফা অর্জন করে। এইসব কারণে ইংরেজ বণিকদের কখনোই পুঁজির সমস্যায় পড়তে হয়নি।

শিল্প বিপ্লবের জন্য সুলভ শ্রমিক প্রয়োজন। ষোড়শ শতক থেকে ইংল্যান্ডে কৃষিজমিকে পশুচারণ ভূমিতে পরিণত করা শুরু হয়। এর ফলে অসংখ্য ভূমিহীন বেকার কৃষক সৃষ্টি হয়। যারা শহরের কলকারখানাগুলিতে নামমাত্র মজুরিতে শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত হতে থাকে। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলেও শ্রমিকের জোগান সহজলভ্য হয়। শিল্পবিপ্লবে এই সুলভ শ্রমিক সহায়ক হয়।

১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে গৃহযুদ্ধের ফলে মধ্যবিত্তদের রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। তারা ইংল্যান্ডের অর্থনীতিতে নেতৃত্ব স্থাপন করে এবং শিল্পবিপ্লবেও তাদের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা পার্লামেন্টে সরকারকে শিল্পের উন্নয়নের জন্য সাহায্য করতে বাধ্য করে। ব্রিটিশ সরকারও দেশের ব্যবসারী ও শিল্পপতিদের নানাভাবে সাহায্য করে। আমদানিকৃত বিদেশি পণ্যের ওপর উচ্চহারে শুল্ক বসিয়ে দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষিত করে।

প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ইংল্যান্ডে প্রচুর পরিমাণে কয়লা, লোহা, টিন ও তামা পাওয়া যেত। ইংল্যান্ডের স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া বস্ত্রশিল্পের উপযোগী ছিল। পাশাপাশি প্রাকৃতিক বন্দর এবং দেশের অভ্যন্তরে প্রচুর খাল ও খাড়ি থাকায় কাঁচামাল ও পণ্য চলাচল অনেক সুবিধাজনক হয়।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার:

এই অনুকূল পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বেশ কিছু যন্ত্রপাতির সময়োপযোগী আবিষ্কার, যা শিল্পবিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল। (১) ইংল্যান্ডে বস্ত্রশিল্পেই প্রথম যন্ত্রভিত্তিক উৎপাদন শুরু হয়। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে জন কে উড়ন্ত মাকু বা ফ্লাইং শাটল নামে কাপড় বোনার এক উন্নতমানের যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে হারগ্রিভস্ আবিষ্কার করেন সুতো কাটার উন্নত যন্ত্র "স্পিনিং

জেনি'। আর্করাইট আবিষ্কার করেন জলশক্তিচালিত কাপড় বোনার যন্ত্র 'ওয়াটার ফ্রেম' (১৭৬৯ খ্রি.)। কার্টরাইট আবিষ্কার করেন মিউল (১৭৮৫ খ্রি.) নামে কাপড় বোনার এক উন্নত ধরনের যন্ত্র। (২) এতদিন এই যন্ত্রগুলি জলশক্তি ও বায়ুশক্তির সাহায্যে চালানো হত। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে জেমস্ ওয়ার্ট বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করলে শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটে গেল। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সাহায্যে যন্ত্রগুলিকে ইচ্ছেমতো চালানো যায় এবং বড়ো বড়ো কারখানা চালু করা সম্ভব হয়। ম্যাথু বোল্টন বাষ্পীয় ইঞ্জিনের কিছুটা উন্নতিসাধন করে,বোল্টন ইঞ্জিন নামে বাণিজ্যিকভাবে বাজারে বিক্রি করতে থাকেন। এর ফলে যন্ত্রগুলিকে ইচ্ছেমতো চালিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। হয়। (৩) ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে জন স্মিটন কাঠকয়লার পরিবর্তে কয়লার সাহায্যে লোহা গলাবার চুল্লি বা ব্লাস্ট ফার্নেস আবিষ্কার করেন। (৪) খনিগর্ভে নিরাপদে কাজ করার জন্য হামফ্রি ডেভি আবিষ্কার করেন সেফটি ল্যাম্প (১৮১৫ খ্রি.)। (৫) পরিবহনের ক্ষেত্রেও যুগান্তর আসে। ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে টেলফোর্ড ও ম্যাকডাম পাথরকুচি ও পিচ দিয়ে মজবুত রাজপথ তৈরির কৌশল আবিষ্কার করেন। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে জর্জ স্টিভেনসন বাষ্পচালিত রেলইঞ্জিন তৈরি করেন। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে ফুলটন তৈরি করেন বাষ্পীয় পোত বা স্টিমার। এইসব আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে ইংল্যান্ড প্রথম শিল্পবিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়।

ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ে শিল্পক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি দেখা যায়। ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ের সময়কাল নিয়ে পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। অনেকের মতে, ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে শিল্পবিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা। অনেকে আবার এ সম্পর্কে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের কথা বলে থাকেন। এরিখ হবসবম ১৮৪০-১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দকে দ্বিতীয় পর্যায়ের সময়সীমা বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রথম পর্বের শিল্পবিপ্লবের মূল ভিত্তি ছিল বস্ত্রশিল্প। এই সময় মূলত বস্ত্রশিল্পকে কেন্দ্র করেই শিল্পবিপ্লব বিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছিল। তাই শিল্পবিপ্লবের প্রথম পর্বকে বস্ত্রশিল্প বা কাপড়- কলের যুগ' বলা হয়। শিল্পবিপ্লবের দ্বিতীয় পর্বে এর পরিবর্কতে কয়লা, লোহা, ইস্পাত প্রভৃতি মূলধনি উপকরণ শিল্পবিপ্লবের ভিত্তি হয়ে ওঠে। এই কারণে এই যুগকে মূলধনি শিল্পসম্ভারের যুগ' ('Age of Capital Goods Industries') বলা হয়। শিল্পায়নের গতি এই যুগে ছিল দ্রুত ও ব্যাপক, যা ইংল্যান্ডের সীমানা অতিক্রম করে তা ইউরোপের অন্যান্য দেশেও সম্প্রসারিত হয় এবং এই শিল্পবিপ্লবকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বহু মানুষের বিশাল কর্মপ্রচেষ্টা।

ইংল্যান্ডের বৈদেশিক বাণিজ্য বহু-গুণ বৃদ্ধি পেতে থাকলে, এই বর্ধিত চাহিদার জোগান সুনিশ্চিত করতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নানা পরিবর্তন আনতে হয়। ইংল্যান্ডের বস্ত্র-কারখানাগুলিতে ব্যবহৃত যন্ত্রগুলি অধিক উৎপাদনের জন্য ক্রমাগত ব্যবহার হতে থাকে এবং সেগুলিকে বাষ্পীয় ইঞ্জিন দ্বারা চালানো শুরু হয়। এর ফলে, যন্ত্রগুলি কাঠের পরিবর্তে লোহা দিয়ে তৈরি করা শুরু হয়। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডে বাষ্পচালিত তাঁতের সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার। এইসব যন্ত্রপাতি তৈরির জন্য লোহা এবং লোহা গলানো ও বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালাবার জন্য কয়লার ব্যাপক প্রয়োজন দেখা দেয়। ইতিমধ্যে ইউরোপের অন্যান্য দেশে শিল্পবিপ্লব সম্প্রসারিত হলে সেসব দেশেও লোহা ও কয়লার প্রয়োজন দেখা দেয়। ইংল্যান্ড ছিল লোহা ও কয়লার অফুরন্ত ভাণ্ডার। ব্যাপকতর প্রয়োজনের ফলে ইংল্যান্ডের লোহা ও কয়লা শিল্পে প্রভূত উন্নতি দেখা দেয়। হেনরি

ঘুরসামার আকরিক লোহাকে শোধন করে ইস্পাত তৈরির কৌশল আবিষ্কার করেন। ফলে কয়লা, লোহা ও ইস্পাত শিল্পে বিপ্লব ঘটে যায়।লোহার ব্যবহার বৃদ্ধি পায়।

কয়লা, লোহা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি পরিবহনের জন্য দরকার ভারী যানবাহন। এ ব্যাপারে ইংল্যান্ডের রেলপথ ও জাহাজ শিল্প প্রভূত সাহায্য করে। রেলপথ নির্মাণ ও চলাচলকে কেন্দ্র করে লোহা, ইস্পাত ও কয়লার চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে ৬ হাজার মাইল রেলপথ ছিল। ১৮৮০-তে তার পরিমাণ হয় ১৭ হাজার মাইল। রেলপথ আধুনিক শিল্প, সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনে এমন বৈপ্লবিক ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এনেছিল যে, শিল্পবিপ্লবের এই দ্বিতীয় পর্যায়কে নিঃসন্দেহে 'রেলের যুগ' ('Age of Railway') বলে অভিহিত করা হয়। জাহাজগুলিও কাঠের পরিবর্তে ইস্পাত দ্বারা নির্মিত হতে থাকে এবং সেগুলি বাষ্পীয় ইঞ্জিন দ্বারা চালানো হয়। এর ফলে একদিকে যেমন ইস্পাত ও কয়লার চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তেমনি সামুদ্রিক মাল পরিবহনের ক্ষেত্রেও যুগান্তর আসে।

শিল্পবিপ্লবের প্রথম পর্বে ইংল্যান্ডে স্বল্প পুঁজিতে ছোটো ছোটো কারখানা গড়ে উঠেছিল, কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের শিল্পবিপ্লবের জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন ছিল। ইংল্যান্ডের অভ্যন্তরে তো বটেই—ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারত প্রভৃতি স্থানে ইংল্যান্ড বিরাট ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ও বাজার গড়ে তোলে। তাই উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার জাতকরণের অসুবিধা ছিল না। এইভাবে ইংল্যান্ড বিশ্বের প্রধান কারখানায় পরিণত হয় ("England became the first workshop in the World.")।

৩১২.১.১.৩ ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের প্রসার (Industrialisation in Europe)

ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের সূচনা হলেও ধীরে ধীরে তা ইউরোপের অন্যান্য দেশে সম্প্রসারিত হয়। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড অপেক্ষা অন্যান্য দেশের পশ্চাৎপদতার নানা কারণ ছিল। (১) ঐতিহাসিক ডেভিড ল্যান্ডেস (D. S. Landes) বলেন যে, ওই যুগে ইউরোপের জনসাধারণ সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারায় আচ্ছন্ন ছিল। তারা যুদ্ধ-বিগ্রহ, জমিদারি পরিচালনা ও প্রশাসনিক কাজকর্মকে সম্মানজনক বলে মনে করত। ব্যাবসা-বাণিজ্য বা কলকারখানার কাজকর্মকে তারা হেয় বলে মনে করত। এর ফলে ইউরোপের অন্যান্য দেশ শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড অপেক্ষা পিছিয়ে পড়ে। (২) ইংল্যান্ড ব্যতীত ইউরোপের অন্যান্য দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অপ্রতুল এবং রাস্তাঘাট, খাল নদীপথ ছিল খুবই অনুন্নত। অধ্যাপক ডেভিড টমসন রেলপথ আবিষ্কারের পূর্বে এই অনুমত যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থাকে শিল্পায়নের পথে অন্যতম প্রতিবন্ধক বলে উল্লেখ করেছেন। (৩) শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজন গতিশীল শ্রমিকশ্রেণি ও উন্মুক্ত বাজার। অষ্টাদশ শতকের সূচনায় ইংল্যান্ডে ভূমিদাস প্রথা বিলুপ্ত হওয়ায় সেখানে স্বাধীন ও গতিশীল শ্রমিকশ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ইংল্যান্ডের উপনিবেশ থাকায় ইংল্যান্ডকে কখনোই কাঁচামাল সংগ্রহ বা উৎপাদিত পণ্যাদি বিক্রির জন্য বাজারের সমস্যায় পড়তে হয়নি। বলা বাহুল্য,

ইউরোপের অন্যান্য দেশকে কিন্তু এইসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।কালক্রমে ইউরোপের মানুষ তাদের ভুল বুঝতে পারে। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় ক্ষুদ্র দেশ ইংল্যান্ডের সামরিক বল ও আর্থিক সমৃদ্ধি তাদের চোখ খুলে দেয় এবং তারা শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

ফ্রান্স

সময়কাল : মার্কিন অর্থনীতিবিদ লুই ডানহাম (Louis Danham)-এর মতে ফ্রান্সে শিল্পবিপ্লবের সূচনা হয় ভিয়েনা সম্মেলন (১৮১৪-১৫ খ্রি.) ও ফেব্রুয়ারি বিপ্লব (১৮৪৮ খ্রি.)-এর মধ্যবর্তী সময়ে। রোস্টো-র মতে ১৮৩০ থেকে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তীকালে ফ্রান্সে শিল্পবিপ্লবের বিকাশ ঘটে।

শিল্পোদ্যোগ: ফরাসি সম্রাট ষোড়শ লুই-এর অর্থমন্ত্রী ক্যালোন ফ্রান্সে শিল্পায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি ইংল্যান্ড থেকে বিশেষজ্ঞদের আনিয়ে ফ্রান্সে কলকারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন ফ্রান্সে শিল্প গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। তিনি । নানাভাবে ফরাসি শিল্পোদ্যোগকে উৎসাহিত করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি স্বল্প সুদে ঋণ এবং নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কারে উৎসাহ দিতে থাকেন। এ সত্ত্বেও তাঁর আমলে ফ্রান্সে শিল্পায়নের গতি ছিল খুবই মন্থর। শিল্পবিপ্লব: অলিয়েন্স বংশের লুই ফিলিপ এর রাজত্বকালেই (১৮৩০-৪৮ খ্রি.) ফ্রান্সে প্রকৃতপক্ষে শিল্পবিপ্লবের সূচনা হয়। তিনি ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের নানা রকম সুযোগ-সুবিধা দান করেন এবং শিল্প-সংস্থা গঠনে উৎসাহ দেন। নবগঠিত এই সংস্থাগুলিকে বিদেশি প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষার জন্য তিনি শুল্ক-প্রাচীর গড়ে তোলেন। তাঁর আমলেই ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে প্রথম রেলপথ তৈরি হয়। নতুন নতুন রাস্তাঘাট তৈরি হতে থাকে। লায়নস্, বর্দো, তুলোঁ, প্রভৃতি শহরে বিভিন্ন শিল্পের বিকাশ ঘটতে থাকে। ফরাসি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের (১৮৫০-৭০ খ্রি.) আমলে শিল্পবিপ্লবের প্রসার ঘটে। তাঁর আমলে ফ্রান্সে রেলপথের বিস্তার ঘটে। তিনি ‘ক্রেডিট ফসিয়ার' ও 'ক্রেডিট মবিলিয়ার' নামে দুটি মূলধন- সরবরাহকারী ব্যাংক স্থাপন করেন। তাঁর উদ্যোগে 'ব্যাংক অব ফ্রান্স' পুনর্গঠিত হয়। রেলপথ সম্প্রসারণের ফলে লোহা, ইস্পাত ও কয়লা শিল্পের ক্ষেত্রেও উন্নতি ঘটে। বস্ত্রশিল্প, রেশমশিল্প ও গন্ধদ্রব্য উৎপাদনের জন্য ফ্রান্সের খ্যাতি বৃদ্ধি পায়।

জার্মানি

জার্মানি সেই সময় ছোট ছোট ৩৯টি রাজ্যে বিভক্ত ছিল।এই রাজ্যগুলির ওপর দিয়ে কোনো পণ্য নিয়ে যেতে হলে প্রত্যেক রাজ্যে আলাদা আলাদা শুল্ক দিতে হত। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে ১৮টি রাজ্যকে নিয়ে ‘জোলভেরাইন' নামে একটি শুল্কসংঘ বা শুল্ক-সমবায় প্রতিষ্ঠিত হলে এই অসুবিধা দূর হয় ও শিল্পোন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হয়। জার্মান রাজ্য প্রাশিয়াতে কিছুটা শিল্পের প্রসার লক্ষ করা যায়। প্রাশিয়ার এই অগ্রগতির মূলে কতকগুলি কারণ ছিল। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রাশিয়াতে ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ হলে মুক্ত ভূমিদাসরা শহরে এসে শিল্প-শ্রমিকের বৃত্তি গ্রহণ করে। ফ্রেডারিক লিস্ট নামক জনৈক অর্থনীতিবিদের উদ্যম এবং প্রাশিয়ার যুবরাজের

পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির প্রথম রেলপথ নির্মিত হয়। রেল যোগাযোগের ফলে জার্মানির ব্যাবসাবাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হয়।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হলে শিল্পক্ষেত্রে জার্মানিতে নবযুগের সূচনা হয়। ক্ষতিপূরণস্বরূপ ফ্রান্সের কাছ থেকে পাওয়া বিপুল পরিমাণ অর্থ জার্মান শিল্পে বিনিয়োগ করা হয়। ফ্রান্সের কাছ থেকে পাওয়া আলসাস-লোরেন থেকে জার্মানি পায় প্রচুর পরিমাণ লোহা ও কয়লা। এই দুটি খনিজ দ্রব্য পাওয়ায় জার্মান-শিল্পে বিপ্লব ঘটে যায়।নবগঠিত জার্মানির শিল্পোন্নয়নে জার্মান চ্যান্সেলার বিসমার্ক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন তিনি শিল্পকে কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত করে শিল্পোন্নয়নের ব্যবস্থা করেন। জার্মানির বিভিন্ন রাজ্যে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা, ওজন, মাপ ও শুল্ক-ব্যবস্থা বিলোপ করে জার্মানির সর্বত্র একই ধরনের মুদ্রা, ওজন ও মাপের পদ্ধতি এবং শুল্ক চালু করা হয়। ফলে ব্যাবসাবাণিজ্য ও আর্থিক লেনদেনের সুবিধা হয়। শিল্পে মূলধন সরবরাহের জন্য ব্যাংক-ব্যবস্থার পুনর্গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে দেশে রেলপথ নির্মা চলতে থাকে। বিদেশি প্রতিযোগিতার হাত থেকে জার্মান-শিল্পকে রক্ষার জন্য বিসমার শিল্প সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ করেন এবং বিদেশি পণ্যের ওপর অধিক শুল্ক আরোপ করেন ও ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা থেকে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আমদানি করে তা হুবহু নকল করেন এবং তার সঙ্গে নিজেদের দক্ষতা যোগ করে সেগুলিকে আরও উন্নত করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে কারিগরি দক্ষতায় জার্মানরা বিশ্বে শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করে।

রাশিয়া

দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ও উইটির ভূমিকা: ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার সিংহাসনে বসলে রুশ শিল্পায়নে নবযুগের সূচনা হয়। (১) ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভূমিদাস প্রথা নিষিদ্ধ করলে মুক্তিপ্রাপ্ত ভূমিদাসরা শ্রমিক হিসেবে কলকারখানায় যোগ দেয়। (২) তাঁর আমলে রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে রেলপথ সম্প্রসারিত হলে যোগাযোগ ব্যবস্থ ও পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে সত্যিই যুগান্তর আসে। রেলপথ নির্মাণকে কেন্দ্র করে লোহা, কয়লা ও আধুনিক প্রযুক্তির বিস্তার ঘটে। রুশ শিল্পায়নে জার দ্বিতীয় নিকোলাসের বাণিজ্য ও অর্থমন্ত্রী কাউন্ট সের্গেই উইটি (১৮৯২-১৯০৩ খ্রি.) এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি বাজেটে আয়ব্যয়ের সমতা স্থাপন করেন, আমদানি কমিয়ে রপ্তানি বৃদ্ধি করেন, তাছাড়া বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশ থেকে বৈদেশিক ঋণ সংগ্রহ করা হয়। মূলত বিদেশি পুঁজির ওপর নির্ভর করেই রাশিয়ায় শিল্পায়ন ঘটে। ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রসার ঘটে। দেশের নানা স্থানে ভারী শিল্প গড়ে উঠতে থাকে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রুশ বিপ্লবের পূর্বেই রাশিয়া শিল্পে যথেষ্ট অগ্রসর হয় এবং বিপ্লব-পরবর্তী যুগে তার গতি দুর্বার হয়ে ওঠে।

শিল্পবিপ্লবের ফলাফল

ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে শিল্পবিপ্লবের ফলাফল ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। শিল্পবিপ্লব বিশ্বের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা

করে। বর্তমান যুগে শিল্পোৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে এক নতুন সভ্যতার উন্মেষ হয়েছে। এই সভ্যতা 'শিল্পাশ্রয়ী সভ্যতা' নামে পরিচিত। প্রাচীন কুটির-শিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতি, সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রভৃতির স্থানে দেখা দেয় শিল্পাশ্রয়ী সভ্যতা, নগরজীবন, মধ্যবিত্তশ্রেণি ও গণতান্ত্রিক আদর্শ।

● রাজনৈতিক

শিল্পবিপ্লবের ফলে ইউরোপে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়। পূর্ববর্তী সময়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভূস্বামী ও অভিজাতরাই সব ক্ষমতা ভোগ করত, কিন্তু বিপ্লবের পরবর্তীকালে পুঁজিপতি শ্রেণি ও শ্রমিকশ্রেণি রাজনৈতিক প্রতিপত্তি লাভে উদ্যোগী হয়। গণতান্ত্রিক আদর্শ বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত মানুষদের চিন্তা ও চেতনায় আবদ্ধ ছিল, কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পর পুঁজিপতি শ্রেণি ও শ্রমিকশ্রেণি গণতান্ত্রিক অধিকার দাবি করতে থাকে। শ্রমিকরা ইউরোপের বহু দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু করে। কলকারখানায় কর্মরত শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে অর্থনৈতিক সংঘর্ষের সূচনা হয়। এর ফলে ইউরোপে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদী ভাবধারা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। শিল্পবিপ্লবের ফলে জাতীয়তাবাদী আদর্শ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এতদিন পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিক শুল্ক-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। শিল্পবিপ্লবের ফলে সমগ্র দেশে একই শিল্পনির্ভর অর্থনীতি চালু হলে জাতীয় সংহতি গড়ে ওঠে এবং জাতীয়তাবাদের পথ প্রশস্ত হয়। উন্নত পরিবহন-ব্যবস্থা, বাণিজ্যিক কারণে বিভিন্ন দেশ ও জাতিবর্গের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ আন্তর্জাতিকতাবাদের উন্মেষ ঘটায়। শিল্পোন্নত দেশগুলি নিজেদের দেশে উৎপন্ন উদ্‌বৃত্ত পণ্যাদি বিক্রির জন্য ইউরোপ ও তার বাইরে পৃথিবীর নানা দেশে বাজার খুঁজতে গিয়ে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করতে থাকে। এর ফলে তাদের মধ্যে তীব্র ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। এই উপনিবেশ দখলের লড়াই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যাবলির সৃষ্টি করে।

সামাজিক

ইউরোপের সামাজিক ক্ষেত্রেও শিল্পবিপ্লব বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। সমাজে দুটি নতুন শ্রেণির উদ্ভব হয়—পুঁজিপতি মালিক ও শোষিত শ্রমিক। শিল্পবিপ্লবের ফলে গ্রামের কৃষকরা মজুরির আশায় দলে দলে শহরের কলকারখানাগুলিতে যোগ দিতে থাকে। এর ফলে একদিকে যেমন গ্রামগুলি জনশূন্য হয়ে পড়ে, তেমনি অপরদিকে শহরগুলি জনবহুল হয়ে ওঠে। গ্রামীণ সভ্যতার বিনাশ ঘটতে থাকে এবং শিল্পাশ্রয়ী নগর সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। ৩) শিল্পবিপ্লব সমাজে নানা কুফল ডেকে আনে। শ্রমিকদের অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করতে হত। তাদের বাসস্থানগুলির অবস্থা ছিল অতি শোচনীয়, অস্বাস্থ্যকর ও অমানবিক। ধীরে ধীরে শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে এবং তারা শ্রমিক-সংঘ গঠন করে ধর্মঘটের মাধ্যমে তাদের দাবিদাওয়া আদায়ে সচেষ্ট হয়। (৪) শিল্পবিপ্লবের ফলে পূর্বের অভিজাত সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণির অবলুপ্তি ঘটে এবং শিল্পপতি, বণিক, মহাজন প্রভৃতির সমন্বয়ে। নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণির আবির্ভাব হয়। পূর্বতন কৃষিভিত্তিক সমাজের স্থলে শিল্পভিত্তিক ও বাণিজ্যনির্ভর নতুন সমাজব্যবস্থার পত্তন হয়।

অর্থনৈতিক

শিল্পবিপ্লব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বহুমুখী পরিবর্তনের সূচনা করে। শিল্পবিপ্লবের ফলে অল্প সময়ে প্রচুর পরিমাণ পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন হতে থাকে। এর ফলে ব্যাবসাবাণিজ্যের প্রসার ঘটে। নিজেদের কারখানায় তৈরি পণ্যসামগ্রী বিক্রির জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। শিল্পবিপ্লবের ফলে 'ফ্যাক্টরি প্রথা' বা বৃহৎ কারখানার উদ্ভব হয়। পূর্বে শ্রমিক নিজ গৃহে নিজস্ব যন্ত্রাদির সাহায্যে দ্রব্যাদি উৎপাদন করত। 'ফ্যাক্টরি প্রথার কাছে কুটিরশিল্পের টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। পূর্বে একজন কারিগর একটি দ্রব্যের সবটাই নিজে তৈরি করত, কিন্তু শিল্পবিপ্লবের ফলে ব্যাপক হারে দ্রব্যাদি উৎপন্ন হতে থাকে এবং শিল্পে 'শ্রম বিভাজন নীতি' চালু করে। শিল্পবিপ্লবের পূর্বে পুঁজিপতিরা বাণিজ্যে মূলধন বিনিয়োগ করতেন। বাণিজ্যে নিয়োজিত এই মূলধন 'বাণিজ্যিক মূলধন' ('Mercantile Capital') নামে পরিচিত। শিল্পবিপ্লবের পর পুঁজিপতিরা ব্যাবসাবাণিজ্য অপেক্ষা পণ্যাদি উৎপাদনের জন্য শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করতে থাকেন। এই মূলধন 'শিল্প মূলধন' ('Industrial Capital') নামে পরিচিত। শিল্পবিপ্লবের ফলে 'বাণিজ্যিক মূলধন' 'শিল্প মূলধনে' পরিণত হয়। পুঁজিপতিরা শিল্পে প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করতে থাকেন এবং এইভাবে যৌথ বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান (Joint Stock Company)-এর উদ্ভব হয়। (৫) মুনাফা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শিল্পপতিরা শ্রমিকদের যতটা সম্ভব কম মজুরি দিতে থাকেন। শ্রমিকরা নানাভাবে শোষিত হতে থাকে। ধনী দিন দিন আরও ধনী এবং দরিদ্র আরও দরিদ্র হতে থাকে।

৩১২.১.১.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১) Industry and Empire- Eric Hobsbomn

২) Coming of French Revolution – George Lefevre

৩)History of Modern France- Alfred Cobban

৩১২.১.১.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

1) Discuss your views on the Nature of the French revolution?

2) Why Industrial revolution first occurred in England?

3) Did scientific discoveries played any role in industrial revolution?

4) Discuss the spread of Industrial revolution in Europe.

পর্যায় গ্রন্থ - ১
উনিশ শতকের দান
Legacy of the Nineteenth Century
একক - ২
ধনতন্ত্রবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের বিকাশ
Growth of Capitalism and Imperialism

বিন্যাসক্রম ঃ

উপ-একক - ১

২.১.১.১.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

২.১.১.১.১ ঃ ধনতন্ত্রবাদ বলতে কি বোঝায় এবং এর উদ্ভব

২.১.১.১.২ ঃ ইউরোপের দেশগুলিতে ধনতন্ত্রবাদের প্রসার

২.১.১.১.৩ ঃ পুঁজিবাদ বিকাশের ধারা

২.১.১.১.৪ ঃ বিশ্ব রাজনীতিতে পুঁজিবাদ সম্প্রসারণের প্রতিক্রিয়া

২.১.১.১.৫ ঃ ধনতন্ত্রবাদ ও মার্কসীয় চিন্তা-ভাবনা

২.১.১.১.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী (Reference Books)

২.১.১.১.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Probable Questions)

উপ-একক - ২

২.১.১.২.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

২.১.১.২.১ ঃ সাম্রাজ্যবাদ বলতে কি বোঝায়

২.১.১.২.২ ঃ সাম্রাজ্যবাদ শব্দের নানা ব্যাখ্যা

২.১.১.২.৩ ঃ নয়া সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ও নানা তত্ত্ব

২.১.১.২.৪ ঃ সাম্রাজ্যবাদ সম্প্রসারণ

২.১.১.২.৫ ঃ উপসংহার

২.১.১.২.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী (Reference Books)

২.১.১.২.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Probable Questions)

উপ-একক - ১
ধনতন্ত্রবাদের বিকাশ
Growth of Capitalism

২.১.১.১.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ধনতন্ত্রবাদের অর্থ, এর উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য।

(২) ইউরোপে কিভাবে ধনতন্ত্রবাদের প্রসার হয়েছিল।

(৩) ধনতন্ত্রবাদের বিকাশের ধারা।

(৪) ধনতন্ত্রবাদের সম্প্রসারণের প্রতিক্রিয়া-মার্কসের চিন্তাভাবনা।

২.১.১.১.১ ঃ ধনতন্ত্রবাদ বলতে কি বোঝায় এবং এর উদ্ভব

ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের সূত্র ধরেই ধনতন্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় যুগে ইউরোপ মানুষের জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্যাদির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। তবে যেটুকু শিল্পদ্রব্যাদি উৎপন্ন হত তা সমাজের মুষ্টিমেয় লোকের একচেটিয়া ছিল না। কুটির শিল্প, হস্তশিল্প ও আরও নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদক শ্রমের অনুপাতে পারিশ্রমিক ও কর্মের উৎকর্ষানুযায়ী স্বীকৃতি পেত। শিল্পপণ্যের প্রকৃত উৎপাদক ও লভ্যাংশভোগীদের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান আধুনিক যুগের মত এত অধিক ও ছিল না। অর্থবন্টন ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত না হয়ে সমাজের অধিকাংশের মধ্যে সঞ্চারিত হত।

কিন্তু অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের ফলে শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার বিপ্লব এল। এই 'শিল্পবিপ্লবের' সূচনা প্রথমে হল ইংল্যাণ্ডে অষ্টাদশ শতকের এবং এই বিপ্লবের জোয়ার ছড়িয়ে পড়ল ইউরোপের অন্যত্র ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে তুলনায়, ফ্রান্স, জার্মানীতে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে শিল্পায়ন শুরু হয়েছিল। রাশিয়াতেও ঊনিশ শতকের শেষে ও বিংশ শতকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ঐ সব দেশে শিল্পায়ন ইংল্যাণ্ডের তুলনায় দেরিতে শুরু হলেও দ্রুত অগ্রসর হয়েছিল। যন্ত্রযুগের আবির্ভাবে এবং দ্রুত শিল্পায়নের ফলে ইউরোপের ঐ সব দেশগুলিতে গড়ে উঠল প্রচুর পরিমাণে কলকারখানা এবং এর ফলে নতুন ফ্যাক্টরী ব্যবস্থা (Factory System) গড়ে উঠল। শিল্পবিপ্লব শুধু ইউরোপে নয়, অন্যান্য মহাদেশেও ছড়িয়ে পড়ল। কলকারখানায় নতুন যন্ত্রচালিত উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসারের ফলে পূর্বতন সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার অবসান ঘটল এবং প্রচলিত হল পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার। এই ব্যবস্থায় সকল প্রকার উৎপাদন কাজে যন্ত্র প্রধান হয়ে উঠল। কেবলমাত্র প্রয়োজন হল যন্ত্রকে সচল রাখার জন্য মজুরি ভিত্তিক শ্রমিকদের। যান্ত্রিক কলকারখানার প্রসারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল ধনতন্ত্রবাদের প্রসার এবং মুষ্টিমেয় Capitalism বা মূলধনী শ্রেণীর সৃষ্টি। মূলধনীশ্রেণী আর্থিক দিক দিয়ে প্রতিপত্তিশালী হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে অর্থ শিল্পে বিনিয়োগ করতে পারল। এই অর্থ বিনিয়োগ করে তারা শিল্পের উৎপাদনের জন্য কলকারখানা গড়ে তোলার

কাজ করল এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ যেগান দিতে লাগল। এই সব কলকারখানাতে অসংখ্য মানুষ কাজ পেল। মূলধনী শ্রেণী বা পুঁজিপতিশ্রেণী এদের সাহায্যে প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করত। বিনিময়ে তাদের পারিশ্রমিক হিসেবে মুজরি দিত অত্যন্ত অল্প। শ্রমিকগণ তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হলেও পুঁজিপতিরা কিন্তু বিনা পরিশ্রমে আর্থিক মুনাফা লাভ করে ধনী থেকে আরও বেশি ধনী হয়ে উঠল। এর ফলে সমাজে দুটি অসম শ্রেণীর সৃষ্টি হল -- একদিকে সুবিধাভোগী পুঁজিপতি শ্রেণী এবং অন্যদিকে সব প্রকার সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং সামান্য মজুরিতে জীবিকা নির্বাহে অসমর্থ, অসহায় 'সর্বহারা' শ্রমিকশ্রেণী। নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে মূলধনীশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান সৃষ্টি হতে থাকল। এ ব্যবধান সমাজের মধ্যে এক সর্বগ্রাসী ও সুদূরপ্রসারী সমস্যার সৃষ্টি করল।

শিল্পবিপ্লবের ফলে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার অবসান ঘটে প্রচলিত হয় পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার। যান্ত্রিক কল-কারখানার প্রসারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল ধনতন্ত্রবাদের প্রসার। এই ব্যবস্থায় শ্রমিকগণ তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হলেও পুঁজিপতিরা ধনী থেকে আরও ধনী হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন

১। কোন বিপ্লবের সুত্র ধরে ইংল্যান্ডে ধনতন্ত্রের উদ্ভব হয়?

২। ধনতন্ত্রের ফলে সমাজে সৃষ্ট দুটি শ্রেণীর নাম কর।

২.১.১.১.২ ঃ ইউরোপের দেশগুলিতে ধনতন্ত্রবাদের প্রসার

ইংল্যান্ডে 'শিল্পবিপ্লবের' সূত্র ধরে ধনতন্ত্রের উৎপত্তি ও প্রসার ঘটলেও তা পরবর্তীকালে ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। শিল্পায়ন শুধু ইউরোপেই নয়, অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়েছিল। ঊনিশ শতকের শেষ তিন দশকে পুঁজিবাদ বা ধনতন্ত্রবাদ দ্রুত প্রসারলাভ করেছিল। এই সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়ায় জাপান, এমন কি চীন, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে শিল্পোন্নয়নের পথে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল।

ইংল্যাণ্ডে 'শিল্পবিপ্লবের' সূত্র ধরে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরবর্তীকালে ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল — যেমন ফ্রান্স, জার্মানী ও রাশিয়া।

ইংল্যান্ড ঃ

ইংল্যান্ডে প্রথমে ধনতন্ত্রবাদের বিকাশের পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ ছিল। শিল্পায়নের বিকাশের সঙ্গে যে ধনতন্ত্রবাদের সম্পর্ক সেই শিল্পায়নের কিছু আবশ্যিক শর্তের উপস্থিতি ইংল্যাণ্ডে প্রথম দেখা দিয়েছিল, যা অন্যত্র দেখা যায়নি। প্রথমতঃ অষ্টাদশ শতকের প্রথম থেকেই ইংল্যাণ্ড আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল হতে শুরু করে। রপ্তানী, দাস ব্যবসা, ঔপনিবেশিক জমির আবাদ, ব্যক্তিগত পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি, মালবহনের মাশুল প্রভৃতির ফলে ইংল্যান্ড অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আর্থিক দিক দিয়ে এক অভাবনীয় উন্নতি ঘটায়। ইংল্যান্ডে অষ্টাদশ শতকে প্রচুর পরিমাণে বাণিজ্যিক পুঁজি সঞ্চয়ের সঙ্গে 'শিল্পবিপ্লব' ও পুঁজিবাদের উদ্ভবের সম্পর্কটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ইংল্যান্ডে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রভূত উন্নতি, নতুন চালিকাশক্তির উৎসের আবিষ্কার ও ব্যবহার, বস্ত্রশিল্পের যান্ত্রিকীকরণ, লোহা-ইস্পাতের বহুল ব্যবহার, কারখানাব্যবস্থা ও নতুন উৎপাদন পদ্ধতি, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং আরও নানা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ

পরিবর্তনের ফলে শিল্পায়ন অভাবনীয়ভাবে দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল। ইংল্যান্ড উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত তার একচেটিয়া প্রাধান্য শিল্পের ক্ষেত্রে বজায় রেখেছিল এবং সমগ্র 'বিশ্বের কারখানা'য় পরিণত হয়েছিল। এ সময়ে ইংল্যান্ডে ধনতন্ত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। পুঁজিপতিশ্রেণী তাদের পুঁজি বিনিয়োগ করেছিল কলকারখানা নির্মাণে এবং প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্যাদির উৎপাদনে। উদ্দেশ্য ছিল, অত্যধিক মুনাফা অর্জন। ইংল্যান্ডের পুঁজিপতিশ্রেণী যন্ত্রে উৎপাদিত উৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্যাদি সস্তা দামে বাজারে বিক্রী করে প্রচুর লাভ করত। কাঁচামালের অনায়াসলভ্যতা ইংল্যান্ডের শিল্পমালিকদের সুবিধা করে দিয়েছিল।

ইংল্যান্ডে এই ধনতন্ত্রবাদের প্রসারে পুঁজিপতিশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কারণ শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিপতিশ্রেণীর শোষণের নানাভাবে শিকার হয়েছিল, এর ফলে পুঁজিপতিশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল এবং তা দ্বন্দ্বে পরিণত হয়েছিল।

জার্মানী ঃ

জার্মানীতে উনিশ শতকের শেষার্ধে ধনতন্ত্রবাদের বিকাশ ঘটে। এর পশ্চাতে জার্মানীর রাজনৈতিক ঐক্য, ফ্রান্সের কাছ থেকে ফ্রান্স-প্রাশীয় যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ বিরাট অঙ্কের অর্থ আদায় এবং আলসাস লোরেন ফ্রান্সের কাছ থেকে প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়গুলি বড় কারণ ছিল। আলসাস-লোরেন লাভ করার ফলে জার্মানীর বস্ত্রশিল্পসহ অন্যান্য নানা শিল্পের উন্নতি ঘটে। লৌহ ও কয়লা শিল্প, রসায়ন ও বিদ্যুৎ শিল্পে জার্মানীতে অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। বৈদেশিক বাণিজ্য দ্রুত প্রসারলাভ করে। শিল্পোন্নয়নের জন্য বিসমার্ক শিল্প সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করেন। জার্মানী একটি ধনতান্ত্রিক দেশে পরিণত হয় এবং কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ম পুঁজিবাদের স্বার্থে সমুদ্রপারে উপনিবেশ বিস্তার এবং নৌবহর গড়ে তোলার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হন।

ফ্রান্স ঃ

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নানা কারণে ফ্রান্সের শিল্পায়ন অত্যন্ত মন্থর ছিল বলা চলে। বিপ্লবী ও নেপোলিয়নের সময়ে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ, কয়লার অভাব, কৃষির উপর অধিক নির্ভরশীলতা এর জন্য দায়ি ছিল। ফ্রান্সে উনিশ শতকের শেষ লগ্নে ধনতন্ত্রবাদ এবং পুঁজিপতিশ্রেণী বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ফ্রান্সে --- প্রাশীয় যুদ্ধে (১৮৭০-৭১) ফ্রান্সের পরাজয়ের ফলে তার অর্থনীতি সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। একদিকে খনিজ সম্পদ ও শিল্পসমৃদ্ধ আলসাস-লোরেন জার্মানীর কাছে পরিত্যাগ এবং অন্যদিকে যুদ্ধে পরাজয়ের ক্ষতিপূরণ বাবদ বিরাট অঙ্কের অর্থ জার্মানীকে প্রদানের ফলে ফ্রান্সের অর্থনীতিতে সাময়িক মন্দা দেখা দেয়। কিন্তু উনিশ শতকের শেষদশকে এবং বিংশ শতকের সূচনায় বৃহৎ পুঁজিপতিদের আবির্ভাবে এবং আধুনিকতম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ফ্রান্স শিল্পের ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতি ঘটায়। বৃহদায়তন নতুন কলকারখানা ও শিল্প গড়ে উঠতে থাকে। বিশ শতকে ফ্রান্সে কয়লা ও লৌহ-ইস্পাত শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, বস্ত্র শিল্প প্রসারলাভ করে। ফ্রান্সের শিল্পায়নের প্রধান ক্ষেত্র ছিল বস্ত্রশিল্প। এইভাবে ফ্রান্সে ধনতন্ত্রবাদ বিকাশলাভ করে।

রাশিয়া ঃ

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিদাসদের মুক্তি থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত সময়কালকে সোভিয়েত ঐতিহাসিকেরা রুশ ইতিহাসের পুঁজিবাদী যুগ বলে অভিহিত করেছেন। এই পর্ববিভাগ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের মহাসংস্কারসমূহকে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট বিভাজনরেখা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। মহাসংস্কারের ফলে একদিকে যেমন ভূস্বামী শ্রেণীর ক্রমিক অবক্ষয় শুরু হয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে শিল্পপতি, বণিক,

প্রযুক্তিবিদদের উত্থান ঘটেছিল। ১৮৯০ এর দশকে রুশ শিল্পের অস্বাভাবিক বিকাশ ঘটে। গেরসেনক্রনের হিসাব মতো বেড়ে যাওয়ার গড় ৮ শতাংশ। রেলপথের দ্রুত সম্প্রসারণ, দেশী ও বিদেশী পুঁজির ব্যাপক হারে বিনিয়োগ, বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা ইত্যাদির ফলে শিল্পোন্নয়নের গতিবেগ তীব্র হয়ে উঠেছিল। লৌহ ও কয়লার উৎপাদন অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত রুশ শিল্পায়ন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে থাকে। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের মতে, রুশ সরকার তার শিল্পের প্রসারে বিদেশী পুঁজির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন এবং রাশিয়ার সমগ্র শিল্পের বিনিয়োগের এক তৃতীয়াংশই ছিল বিদেশী পুঁজি। এর ফলে বিপ্লবপূর্ব রাশিয়া 'আধা-ঔপনিবেশিক' অবস্থায় পৌঁছেছিল বলে রুশ মার্কসবাদী ঐতিহাসিকগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন। ধনতন্ত্রবাদ ও পুঁজিবাদের এই বিকাশের ফলে দুর্দশা নেমে এসেছিল সীমাহীন দারিদ্র্যে নিপীড়িত ও বিক্ষুব্ধ সর্বহারা শ্রমিক ও কৃষক সমাজের উপর।

প্রশ্ন

১। ইউরোপের দেশগুলি ছাড়া অন্য কোন কোন দেশে শিল্প বিপ্লবের প্রসার ঘটে?

২। কোন সময়কে সোভিয়েত ঐতিহাসিকেরা রুশ ইতিহাসের পুঁজিবাদী যুগ বলে অভিহিত করেছেন?

২.১.১.১.৩ ঃ পুঁজিবাদ বিকাশের ধারা

ইউরোপে পুঁজিবাদ বিকাশের প্রাথমিক পর্বে পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত ভূমিকাই ছিল মুখ্য, রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল গৌণ। পুঁজিপতিরা তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে মূলধন বিনিয়োগ করে শিল্প গড়ে তোলে এবং নিজেদের মধ্যে মুনাফা অর্জনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু ঊনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথমদিকে (১৮৭১-১৯১৪) পুঁজিপতিশ্রেণী রাষ্ট্রের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বেসরকারী উদ্যোগের সঙ্গে সরকারী উদ্যোগ ও সাহায্য মিলিত হয়। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সরকার নিজের নিজের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাস্তাঘাট, রেলপথ, খাল ইত্যাদি গড়ে তোলার কাজ করেন। রাষ্ট্রের উদ্যোগে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো হয়। ব্যাঙ্ক থেকে সহজ শর্তে ঋণদানেরও ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এই সব নানা ব্যবস্থার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি ঘটে। তাছাড়াও ইউরোপের দেশগুলির সরকার নিজ নিজ দেশের শিল্পগুলিকে অপেক্ষাকৃত শিল্পোন্নত দেশগুলির অশুভ প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করার জন্য শিল্প সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করেন। এই সংরক্ষণ নীতি ইউরোপের অনেক দেশে কৃষির ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, সংরক্ষণ নীতি কার্যকর করার জন্য ইউরোপীয় দেশগুলির সরকার শিল্পজাত ও কৃষিজ দ্রব্যের আমদানির উপর উচ্চহারে শুল্ক আরোপ করে। এভাবে সরকার দেশীয় শিল্পমালিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি দেন।

ইউরোপে পুঁজিবাদ বিকাশের প্রাথমিক পর্বে পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত ভূমিকাই ছিল মুখ্য, রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল গৌণ। কিন্তু উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথমদিকে (১৮৭১-১৯১৪) পুঁজিপতি শ্রেণী রাষ্ট্রের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বড় বড় পুঁজিপতিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না দাঁড়াতে পেরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি পুঁজিপতিরা ধ্বংস হয়ে পড়ে।

১৮৭১ থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ-এই পর্বে পুঁজিবাদী বিকাশের একটি বৈশিষ্ট্য হল শিল্প-বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণের ঝোঁক। প্রতিটি দেশে বড় বড় পুঁজিপতিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না দাঁড়াতে পেরে ক্ষুদ্র ও মাঝারি পুঁজিপতিরা ধ্বংস হয়ে যায়। বৃহৎ পুঁজি বা উদ্যোগগুলি ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিকে গ্রাস করে নিতে থাকে। বিভিন্ন দেশে এই সমস্ত বাণিজ্যিক উদ্যোগ নানা স্বার্থপূরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্নভাবে জোটবদ্ধ হতে থাকে। ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় এই জোটবদ্ধতা 'একীকরণ'

(amalgamation) অথবা 'সমশিল্প জোট' (combine) ও 'ব্যবসায়-সংহতি'র (Trust) রূপ নিয়েছিল। জার্মানীতে এই জোটবদ্ধতা শিল্পসংঘ গড়ে তুলে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, কাঁচামাল সংগ্রহ, উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার ও মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এই জোটবদ্ধতার ফলে পুঁজি ক্রমশঃ কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। শিল্প উদ্যোগগুলির মতই ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলিও জোটবদ্ধ হতে থাকে। এগুলির মাধ্যমে ক্ষমতাশালী বড় বড় পুঁজিপতিরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে একচেটিয়া ব্যবসা গড়ে তুলেছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, জার্মানীর ব্যাঙ্কগুলি ও লগ্নীকারক সংস্থাগুলি শুধুমাত্র দেশের অভ্যন্তরে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গুলিকে অর্থ লগ্নী করেনি, এইসঙ্গে বিদেশেও পুঁজি বিনিয়োগ করে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে এগিয়ে এসেছিল। আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বার্লিন-বাগদাদ রেলপথ গড়ে তোলার পেছনে জার্মানীর ডয়েজ ব্যাঙ্ক প্রভূত সাহায্য করেছিল।

প্রশ্ন

১। মাঝারি ও ক্ষুদ্র পুঁজিপতিরা ধ্বংস হয়েছিল কেন?

২। দেশীয় শিল্প টিকিয়ে রাখার জন্য অপেক্ষাকৃত কম শিল্পোন্নত দেশগুলি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল?

২.১.১.১.৪ ঃ বিশ্ব রাজনীতিতে পুঁজিবাদ সম্প্রসারণের প্রতিক্রিয়া

পুঁজিবাদ প্রসারের ফলে একটি কেন্দ্রীভূত অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী শিল্পপতিগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছিল। এই শিল্পপতিগোষ্ঠী তাদের আর্থিক শক্তিতে বলশালী হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে প্রচেষ্টা চালায় এবং সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও পুঁজিবাদের প্রসার নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রের শিল্পসংরক্ষণ নীতি গ্রহণের পেছনে উদ্দেশ্য ছিল আমদানির উপর চড়া শুল্ক ধার্যের মাধ্যমে রপ্তানী বৃদ্ধি করা এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হওয়া। এর ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্ক ব্যাহত হয়েছিল এবং তিক্ততা দেখা দিয়েছিল। অনেক দেশের সরকার শুল্ক প্রাচীর নির্মাণকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত। এর ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বহু কূটনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। এ ছাড়া সামরিক অস্ত্রশস্ত্রের কারখানার মালিকগণ তাদের কারখানায় তৈরি সামরিক সরঞ্জাম বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করে প্রভূত মুনাফা অর্জনের জন্য সচেষ্ট হয়। ফলে ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেতে থাকে, যার পরিণতি হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এ কথা অনস্বীকার্য যে, পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থসংঘাত এবং উপনিবেশ বিস্তারের প্রবল আগ্রহ থেকেই নয়া সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ঘটে এবং এই সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বে প্রথম মহাযুদ্ধের পথ প্রশস্ত করে। উপনিবেশগুলি থেকে পুঁজিপতিরা শুধু শিল্পপণ্যের কাঁচামালই সংগ্রহ করত না, সেই সঙ্গে সেখানে পণ্যের বিস্তৃত বাজার গড়ে তুলল এবং পুঁজি বিনিয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবেও তা কাজে লাগাল। তাই অর্থনৈতিক দিক থেকে ঔপনিবেশিক বিস্তার একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল। ব্রিটেনের পুঁজিপতি শ্রেণীর হাতে বিশাল পুঁজি সঞ্চিত হল— এসব পুঁজি নির্গমনের জন্য সাম্রাজ্যবাদী বিস্তারের প্রয়োজন দেখা দেয়। নিজেদের পুঁজির নিরাপত্তা ও মুনাফা অর্জন সুনিশ্চিত করতে পুঁজিবাদী দেশগুলি উপনিবেশগুলি জয় করে নিতে থাকে। এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ

চড়া শুল্ক ধার্য করার ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ব্যাহত হয়েছিল। ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। নিজেদের নিরাপত্তা ও মুনাফা সুনিশ্চিত করতে পুঁজিবাদী দেশগুলি উপনিবেশ জয় করে নিতে থাকে। পুঁজিপতি শ্রেণীর মুনাফার লালসা শ্রমিক শ্রেণীর সংঘর্ষ অনিবার্য করে তুলল।

আমেরিকার দেশগুলিতে পুঁজিবাদী দেশগুলি বিস্তারনীতি গ্রহণ করল। এইভাবে শিল্পে উন্নত ইউরোপীয় দেশগুলি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্ব জুড়ে নিজেদের উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যের ব্যাপক বাজার গড়ে তুলল এবং সঞ্চিত পুঁজি বিনিয়োগ করল। এর ফলে একদিকে যেমন ধনতন্ত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটল, তেমনি অন্যদিকে বিশ্ব অর্থনীতির উদ্ভব ঘটল।

ধনতন্ত্রের ব্যাপক প্রসার এবং পুঁজিপতি শ্রেণীর মুনাফার লালসা শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ অনিবার্য করে তুলল। শ্রমিকশ্রেণী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলল পুঁজিপতি শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে।

Laissez-faire বা না হস্তক্ষেপ নীতি পুঁজিপতিশ্রেণীকে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণমুক্ত অবাধ বাণিজ্য অধিকারের সুযোগ দিল। এই তত্ত্বের ফলে শ্রমিকদের উপর মালিকশ্রেণীর শোষণ তীব্র হল। উৎপাদনব্যবস্থার উপর মালিকশ্রেণী তাদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করল।

প্রশ্ন

১। পুঁজিবাদী দেশগুলি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল কেন?

২। Laissez-faire কি?

২.১.১.১.৫ ঃ ধনতন্ত্রবাদ ও মার্কসীয় চিন্তা ভাবনা

কার্ল মার্কস তার 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে ধনতন্ত্রবাদের বিকাশের ফলে বিত্তবান পুঁজিপতিশ্রেণী ও শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রামের অনিবার্যতার কথা বলেছেন। এই শ্রেণীসংগ্রামই তাঁর অর্থনৈতিক তত্ত্বের মূলকথা। শোষণে জর্জরিত শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবের মাধ্যমে শোষণের হাত থেকে মুক্তির জন্য লড়াই করবে। লক্ষ্য রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রের উপর অধিকার স্থাপন। বস্তুত মার্কস বলেছেন, 'রাষ্ট্র শ্রেণীশোষণের যন্ত্র'। সুতরাং সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে পুঁজিপতিশ্রেণীকে হঠিয়ে দিয়ে নিজেদের অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র অধিকার করবে। এর ফলেই প্রতিষ্ঠিত হবে 'সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র'। শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব যখন পূর্ণাঙ্গতা লাভ করবে, তখন পুঁজিপতিশ্রেণী ও ধনতন্ত্রের অবসান ঘটবে এবং এক শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠবে। রাষ্ট্র তখন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে এবং তার অস্তিত্বও বিলুপ্ত হবে।

কার্ল মার্কসের মতে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে পুঁজিপতি শ্রেণীকে হটিয়ে দিয়ে নিজেদের অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র অধিকার করবে।

প্রশ্ন

১। "কমিউনিস্ট ম্যানিফোস্টো" কার লেখা?

২। 'রাষ্ট্র শ্রেণীশোষণের যন্ত্র' — উক্তিটি কার?

২.১.১.১.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী (Reference Books)

(১) প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী ---- ইউরোপের ইতিহাস।

(২) প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় ---- আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস।

(৩) নীহারেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ---- আধুনিক ইউরোপ সমীক্ষা।

(৪) ডেভিড টমসন ---- Europe since Napoleon

(৫) Hayes —— Contemporary Europe since 1870

(৬) Hazen —— Europe since 1815.

(৭) লেনিন --- রাষ্ট্র ও বিপ্লব

২.১.১.১.৭ ঃ সম্ভব্য প্রশ্নাবলী (Model Questions)

(১) ধনতন্ত্রবাদ বলতে কি বোঝায়? এর উদ্ভবের কারণ আলোচনা কর।

(২) শিল্পবিপ্লবের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে ধনতন্ত্রবাদের বিকাশ কিভাবে হয়েছিল।

(৩) ঊনিশ শতকের শেষার্ধে এবং বিশ শতকের সূচনায় ইউরোপে ধনতন্ত্র বিকাশের ধারা আলোচনা কর।

(৪) ধনতন্ত্রবাদের বিকাশের ফলে সামাজিক পরিবর্তন কি হল?

(৫) বিশ্বরাজনীতিতে ধনতন্ত্রবাদের প্রসারের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল?

(৬) ধনতন্ত্রবাদ সম্পর্কে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা কর।

উপ-একক - ২

সাম্রাজ্যবাদের বিকাশ
Growth of Imperialism

২.১.১.২.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) সাম্রাজ্যবাদ শব্দের অর্থ এবং এর নানা ব্যাখ্যা।

(২) নয়া সাম্রাজ্যবাদ বলতে কি বোঝায় এবং এই নয়া সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের কারণ।

(৩) বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের প্রসার।

(৪) সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের পরিণতি।

২.১.১.২.১ ঃ সাম্রাজ্যবাদ বলতে কি বোঝায়

'Imperialism' বা 'সাম্রাজ্যবাদ' রাজনীতির পরিভাষায় একটি নেতিবাচক ও নিন্দাসূচক শব্দ। এই শব্দটির সঙ্গে পৃথিবীর সব মানুষই আজ পরিচিত। সংবাদপত্র, নানাধরণের গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক সাহিত্যে আজ এই শব্দটি বহুনিন্দিত। শব্দটির সাধারণ অর্থ হল, এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য এক অপেক্ষাকৃত অনুন্নত, দুর্বল রাজ্য গ্রাস করার চেষ্টা। উদ্দেশ্য হল, নিজ রাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধি করা এবং পর রাজ্যের অধিবাসীদের উপর সর্ব দিক দিয়ে আধিপত্য স্থাপন এবং শাসনের নামে শোষণ করা।

'সাম্রাজ্যবাদ' শব্দটির সাধারণ অর্থ হল এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য এক অপেক্ষাকৃত অনুন্নত, দুর্বল রাজ্য গ্রাস করার চেষ্টা।

সাম্রাজ্যবাদ হল একটি রাজনৈতিক ধারণা ও নীতি যা সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপকে সদাসর্বদা উৎসাহ প্রদান করে। সাম্রাজ্যবিস্তার, নতুন নতুন স্থান দখলের নীতি, নিজ রাষ্ট্রের স্বাভাবিক সীমানা বৃদ্ধি করা এবং অন্য রাজ্য বা জাতির উপর শাসন কায়েম করার লক্ষ্য থেকেই সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ঘটেছিল। উগ্র জাতীয়তাবাদের ভয়াবহ পরিণতি হল সাম্রাজ্যবাদ।

প্রশ্ন

১। 'সাম্রাজ্যবাদ' কি?

২। সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য কি?

২.১.১.২.২ ঃ সাম্রাজ্যবাদ শব্দের নানা ব্যাখ্যা

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে 'Imperialist' শব্দটি প্রচলিত থাকলেও এই শব্দটি কিন্তু উনিশ শতকের পূর্বে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় নি। ফ্রান্সে ১৮৩০-৪৮ খ্রীঃ এই সময়ে যখন জুলাই রাজতন্ত্র (July Monarchy) প্রতিষ্ঠিত

ছিল তখন ফরাসী শব্দ 'অ্যাপিরিয়ালিজম' সাম্রাজ্যবাদের সমার্থক শব্দ হিসেবে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল। এই শব্দটি ''Bonapartism'' এর প্রায় সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছিল। ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে ফ্রান্সে তৃতীয় নেপোলিয়ানের 'দ্বিতীয় সাম্রাজ্য' (Second Empire) (১৮৫১) সম্বন্ধে এই শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তৃতীয় নেপোলিয়নের সরকার ছিল সাম্রাজ্যবাদী সরকার এবং ফ্রান্সের এই সরকারকে অনেকেই স্বেচ্ছাচারী, জঙ্গী, জনমত-বিরোধী এবং অসাংবিধানিক বলে বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে 'সাম্রাজ্যবাদ' বা 'imperialism' সম্রাটের স্বেচ্ছাচারিতা, খামখেয়ালিপনা ও স্বৈরাচারিতার রূপ লাভ করেছিল। ইংরেজ সমালোচকদের বিশেষ করে উদারপন্থীদের দৃষ্টিতে তৃতীয় নেপোলিয়নের শাসন ছিল ফ্রান্সে নৈরাজ্য ও রাজনৈতিক সুবিধাবাদী নীতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে 'সাম্রাজ্যবাদ' শব্দটির ব্যাখ্যায় নানা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয় নেপোলিয়নের পতন এবং জার্মানীর রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে উত্থান এবং রুশ ও অটোমান সাম্রাজ্যের শোষণ ও অত্যাচার প্রভৃতি নানা ঐতিহাসিক ঘটনা 'সাম্রাজ্যবাদ' শব্দটি'তে একটি নেতিবাচক, নিন্দাসূচক মাত্রা যোগ করে। ঊনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে এই শব্দটির ব্যাখ্যায় পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণের অভিধানে একটি নতুন শব্দ 'Anti - Imperialism' এর আলোকেও 'Imperialism' শব্দটির পরিবর্তনের কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নতুন নতুন ভাবধারা গড়ে উঠতে থাকে। ইংলন্ড এবং আমেরিকায় ঐ সময়ে 'Anti - imperialism' এর মনোভাব কারোর কারোর মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

১৮৩০-৪৮ খ্রীঃ ফ্রান্সে জুলাই রাজতন্ত্রের সময় ফরাসী শব্দ 'অ্যাপিরিয়ালিজম' সাম্রাজ্যবাদের সমার্থক শব্দ হিসাবে প্রথম ব্যবহৃত হয়। এই শব্দটি 'Bonapartism' এর প্রায় সমার্থক শব্দে পরিণত হয়। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণের অভিধানে একটি নতুন শব্দ 'Anti-Imperialism' এর আলোকেও 'Imperialism' শব্দটির পরিবর্তনের কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।

তবে এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, ব্রিটিশ রাজনীতিবিদগণ সকলেই অবশ্য সাম্রাজ্যবাদের কঠোর সমালোচক ছিলেন না। বরং ১৮৯০ সাল নাগাদ লর্ড রোজবেরির মত উদারপন্থীরা 'সাম্রাজ্যবাদে'র এক নতুন ব্যাখা করেন- এটি হল উদারপন্থী সাম্রাজ্যবাদ (Liberal Imperialism)। ব্রিটিশ লেখক ও চিন্তাবিদ সিলী (Seely), 'The Expansion of England' গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদ শব্দটিকে নিন্দাত্মক অর্থে ব্যবহার করেন নি। বরং তিনি সাম্রাজ্যবাদকে নৈতিক দিক থেকে সমর্থন করতে লাগলেন। লর্ড কার্জন সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে যুক্তি দেখাতে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদের উদারতাকেই বড় করে দেখান। প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ কি তা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য হল, মানুষের দুঃখ, দুর্দশা, দারিদ্র্য, অত্যাচার, অসুখ-বিসুখ ইত্যাদি দূর করার চেষ্টা। এই সব সমস্যা, তাঁর মতে, 'Radical Nationalism বা উগ্র জাতীয়তাবাদ বা 'Socialism' বা সমাজতন্ত্রবাদের দ্বারা দূর করা সম্ভব নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায়ই তা কেবল দূর করতে পারে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে এই সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। এই অর্থে কার্জনের কাছে সাম্রাজ্যবাদ লোভ ছিল না, শোষণও নয়। বরং এই সাম্রাজ্যবাদের ইতিবাচক দিক ছিল, কার্জনের এই সাম্রাজ্যবাদী ধ্যানধারণার দৃঢ় সমর্থক ছিলেন ইংরেজ কবি কিপলিং। তিনি তাঁর কবিতায় সাম্রাজ্যবাদের জয়গান গেয়েছেন। তাঁর মতে, শ্বেতাঙ্গ ইউরোপীয়দের উপর ঈশ্বরপ্রদত্ত দায়িত্ব হল অশ্বেতকায় জনগণের কাছে সভ্যতার আলো পৌঁছে দেওয়া। (White man's burden)

প্রশ্ন

১। 'Imperialism' এর সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত ফরাসি শব্দটি কি?

২। লর্ড কার্জনের মতে সাম্রাজ্যবাদ কি?

২.১.১.২.৩ ঃ নয়া সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ও নানা তত্ত্ব

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালে ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে সাম্রাজ্যবিস্তারের ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়েছিল। ১৮৭০ থেকে ১৯১৪ এই সময়কালে এক নয়া সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ইউরোপে দেখা যায়। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি আফ্রিকা ও এশিয়ায় উপনিবেশ বিস্তারের খেলায় মত্ত হয়ে উঠে। এই নয়া সাম্রাজ্যবাদের পেছনে অবশ্য কারণ ছিল। এই কারণগুলি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। এই পর্বকে (১৮৭০-১৯১৪) 'সাম্রাজ্যবাদের যুগ' হিসাবে নিন্দাও করা হল। ১৯০২ খ্রীঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়োর (Boer) যুদ্ধের বিরোধিতা করে ব্রিটিশ উদারনৈতিক অর্থনীতিবিদ্ জে.এ. হবসন (J. A. Hobson) (Imperialism-A study) গ্রন্থটি লেখেন। এতে তিনি সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই গ্রন্থে দেখানো হয়েছে যে সাম্রাজ্যবাদ হল একটি সচেতন রাষ্ট্রনীতি ও একচেটিয়া ধনতন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ। তাঁর মতে, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় মূলধনী শ্রেণী শ্রমিকদের ঠকিয়ে অত্যধিক মুনাফা অর্জন করে। তাদের হাতে মাত্রাতিরিক্ত সঞ্চয়ের ফলে প্রভূত পরিমাণে মূলধন স্তূপীকৃত হয়। সুতরাং এই 'মাত্রাতিরিক্ত মূলধনের লগ্নির ক্ষেত্র অনুসন্ধানের' জন্য সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ঘটে। উপনিবেশ বিস্তার করে সেখানে মূলধন বিনিয়োগ করে আরও মুনাফা বৃদ্ধির চেষ্টা মূলধনী শ্রেণী করে চলে। এজন্য তারা নিজ নিজ দেশের সরকারকে উপনিবেশ দখলের জন্য চাপ দিতে থাকে। উপনিবেশের কাঁচামাল ও বাজারকে একচেটিয়া দখল করে তারা অধিকতর বিত্তশালী হয়ে উঠে। সুতরাং নব সাম্রাজ্যবাদের মূল অর্থনৈতিক শিকড় ছিল উপনিবেশে লগ্নির জন্য অতিরিক্ত মূলধনের চাপ। এর প্রতিকারের উপায় হিসেবে হবসন বলেন যে, অভ্যন্তরীণ সামাজিক সংস্কার ও ধনের সুষম বন্টন প্রবর্তন করা প্রয়োজন। ধনবন্টনের বৈষম্য দূর করতে পারলে দরিদ্র জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং তারা উদ্বৃত্ত ভোগ্যপণ্য ক্রয় করতে পারবে। সেক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত ভোগ্যপণ্য বা মূলধন পাহাড় সমান হবে না। তখন নতুন নতুন বাজারের অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাবার ফলে সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতাও কমে যাবে।

সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়াও সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য উপনিবেশের বন্দর ও সামরিক ঘাঁটি অধিকার করার বাসনাও ছিল। অতিরিক্ত মনুষ্যশক্তি সংগ্রহের কামনাও ছিল।

সাম্রাজ্যবাদ উদ্ভবের জন্য হবসন যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে সমালোচনাও হয়েছে। শিল্পবিপ্লবের পর শিল্পমালিকদের মূলধন স্ফীতির ফলেই সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ঘটে বলে হবসন অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পূর্বেও তো সাম্রাজ্যবাদ ছিল। এর পেছনে কি কারণ তার ব্যাখ্যা কিন্তু হবসন দেন নি। তাঁর মতবাদের এই ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও একথা অনাস্বীকার্য যে, স্তূপীকৃত মূলধন এবং কাঁচামাল ও বাজার দখলের অভিপ্রায়ই নয়া সাম্রাজ্যবাদকে শক্তিশালী করেছিল। শিল্পবিপ্লব এবং ধনতন্ত্রবাদের বিকাশ সাম্রাজ্যবাদের অগ্রগতির সহায়ক হয়েছিল।

হবসনের এই অর্থনৈতিক ধারণা ও ব্যাখ্যার আরও বিশ্লেষণধর্মী ও বিস্তারিত আলোচনা পাই বিখ্যাত রুশ কমউনিস্ট নেতা ভি. আই. লেনিন রচিত 'Imperialism : the Highest Stage of Capitalism' (১৯১৬) নামক গ্রন্থটি থেকে। লেনিনের মতে, ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের ভিতরেই সাম্রাজ্যবাদের বীজ নিহিত আছে। পুঁজিবাদী দেশগুলির বৈদেশিক নীতি পুঁজিবাদীশক্তির অঙ্গুলি হেলনেই পরিচালিত হত। অধিক মুনাফার আশায় শিল্প মালিকরা দেশের

প্রয়োজনের মাত্রাতিরিক্ত শিল্পপণ্য উৎপাদন করত। এই উদ্বৃত্ত পণ্য বিক্রয় এবং বাজার দখলের জন্য পুঁজিবাদী উপনিবেশ দখল করত। যেহেতু বিশ্বে উপনিবেশের সংখ্যা সীমিত, সেহেতু প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশ উপনিবেশ দখল করার চেষ্টায় মত্ত হওয়ায় তাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশেষে যুদ্ধের আকার নিয়েছিল। এ ব্যাপারে লেনিনের অভিমত হল, সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের অন্তিমপর্ব, এবং সমাজতন্ত্রের আগমনের পূর্ববর্তী পর্ব। বৈরিভাবাপন্ন ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর সংঘাত বিশ্বযুদ্ধ ডেকে আনবে। লেনিনের মতে, বিত্তশালী বুর্জোয়া শ্রেণীরা উপনিবেশ দখলের পর সেই অনগ্রসর, দরিদ্র দেশের শ্রমিকদের শোষণ করে, উৎপাদনের পরিমাণ অত্যধিক বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করে। উপনিবেশের শ্রমিকশ্রেণী বেশি আয়ের আশায় এই শোষণের সামিল হয়। বিত্তশালী বুর্জোয়া শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণীর একটি মুখ্য অংশকে উপনিবেশ থেকে প্রাপ্ত মুনাফার কিছু অংশ উপঢৌকন দেয়। এর ফলে সেই শ্রমিকরা তাদের বৈপ্লবিক প্রবণতাকে বিসর্জন দিয়ে ধনী বুর্জোয়াদের সহযোগী হয়। কিন্তু শ্রমিকরা ভুলে যায় যে তাদের এই সুবিধা হল নিতান্তই সাময়িক। একটা সময়ে এর অবসান ঘটবে। সীমিত উপনিবেশের দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনিবার্য্য পরিণতি হবে যুদ্ধ। আর তখন শ্রমিকদের দুর্দশার অন্ত থাকবে না। রোজা লুক্সেমবার্গ তাঁর 'Accumulation of Capital' গ্রন্থে (১৯১৩) লেনিনের মতই একই অভিমত ব্যক্ত করেন।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক যেমন- ডেভিড টমসনের মতে, লেনিনের এই যুক্তি কয়েকটি অসুবিধাজনক সত্যকে উপেক্ষা করেছে। লেনিনের তত্ত্বের বিরুদ্ধে বলা যায় যে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির বিদেশে মূলধন বিনিয়োগের অধিকাংশ ঔপনিবেশিক রাজ্যে হয়নি, মূলতঃ হয়েছে দক্ষিণ আমেরিকা ও রাশিয়ায়। সুতরাং উদ্বৃত্ত মূলধনের বিনিয়োগের জন্যই উপনিবেশ গড়ে ওঠে, এই চুক্তি সবসময় গ্রাহ্য নয়। তাছাড়া এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ডেনমার্ক ও সুইডেনের মত জীবনমাত্রার মানোন্নত দুটি দেশের কোন উপনিবেশ ছিল না। আবার ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের বিস্তৃত ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ছিল। কিন্তু এই দুই দেশের শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান অনুন্নত ছিল।

তথাপি, লেনিনের মতবাদের খুঁটিনাটি ত্রুটি-বিচ্যুতি বাদ দিলে একথা স্বীকার্য যে, সাম্রাজ্যবাদ বিস্ফোরণের পেছনে শিল্পবিপ্লব, মূলধনী শ্রেণীর মূলধন বিনিয়োগ ও বাজার দখলের আগ্রহই বিশেষভাবে কাজ করেছিল।

তবে ডেভিড টমসন মনে করেন যে, সামগ্রিক বা মৌলিক কোনো অর্থেই সাম্রাজ্যবাদের শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা করা চলে না। অর্থনৈতিক শক্তি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার্য যে, উপনিবেশ বিস্তারের জন্য অর্থনীতি ছাড়াও অন্য আরো কারণও থাকতে পারে। ঐতিহাসিক গর্ডন এ. ক্রেগ অর্থনৈতিক উপাদানের চেয়ে রাজনৈতিক উপাদানের গুরুত্ব বেশি বলে মনে করেন। তিনি বলেছেন যে, ইউরোপীয় রাষ্ট্র উপনিবেশগুলিতে প্রকৃত রাজনৈতিক ও সামরিক সুযোগ সুবিধার কথা জনগণের মধ্যে প্রচার না করে সেখানকার অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার কথা প্রচার করত নিজেদের কাজের সমর্থনে। কেননা এতে জনসাধারণের সমর্থন পাওয়া সহজ ছিল। তিনি আরও বলেন, বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির কর্ণধাররা সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণে অর্থনীতির প্রয়োজনের চেয়ে রাজনীতির প্রয়োজনকেই প্রধান বলে বিবেচিত করতেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে ফ্রান্স-প্রাশীয় যুদ্ধের (১৮৭০-৭১) পরের রাজনৈতিক পরিচিতি বিচার করা যেতে পারে। এই যুদ্ধের পর ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের একটি মনস্তত্ত্ব গড়ে উঠে এবং তা

হল ঃ বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি শুধুমাত্র নিজেদের শক্তিমত্তার পরিচয় দিতে পারলেই প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি তাদের ভয় করে চলবে এবং শক্তির মর্যাদা দেবে। অতএব এক্ষেত্রে উপনিবেশ বিস্তার হল বিজিত রাষ্ট্রের সমীহ আদায় করা এবং নিজ রাষ্ট্রের মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি করা।

গর্ডন ক্রেগের মতানুসারে সাধারণভাবে এ কথা বলা যায় যে, অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে রাজনৈতিক স্বার্থের সহাবস্থান দেশকে সাম্রাজ্যবাদী করে তোলে, কোনো কোনো দেশ, যেমন ইটালী ও রাশিয়াতে অর্থনৈতিক উপাদানের চেয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রভাব বেশি ছিল। তবে এ সাধারণীকরণ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ঔপনিবেশিকতা বিস্তারে খ্রীষ্টান মিশনারীদেরও বিশেষ ভূমিকা আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত স্কট, ডেভিড লিভিংষ্টোন প্রমুখ। মিশনারীরা অনগ্রসর সব দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তারা সাম্রাজ্যবাদের পথ অনেক প্রশস্ত করে দিয়েছিল। এই মিশনারীদের অনুসরণ করেছিল বিভিন্ন দেশের বণিকের দল।

সাম্রাজ্যবাদের বিকাশে আরো একটি উপাদান হল প্রশাসক ও সৈনিক। জটপাকানো প্রশাসনিক অবস্থা থেকে শৃঙ্খলা ও দক্ষ প্রশাসন ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক প্রশাসকগোষ্ঠী তৎপর ছিল। এদের মধ্যে মিশরের লর্ড ক্রোমার উত্তমাশা অন্তরীপে লর্ড মিলনারের এবং জার্মান পূর্ব আফ্রিকায় কার্ল পিটার্সের নাম উল্লেখযোগ্য। এরা নিজ উদ্যোগে সাম্রাজ্যবিস্তার করেন। জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য উপনিবেশ স্থাপনের আগ্রহ দেখা দেয়। সাম্রাজ্যস্থাপন বড় বড় শক্তিগুলির কাছে শক্তি জাহির করার ও মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যও এই সাম্রাজ্যবিস্তার একান্ত প্রয়োজন ছিল।

ডেভিড টমসনের মতে কোনো দেশ সাম্রাজ্যবাদী হবে কিনা তা নির্ভর করে বুদ্ধিজীবী, অর্থনীতিবিদ, দেশপ্রেমিক, সাংবাদিক বা রাজনীতিবিদদের ছোট ছোট গোষ্ঠীর সক্রিয়তার উপর। তারা হয়তো জাতীয় নিরাপত্তা চায়, স্বয়ংম্ভরতা চায়, অথবা অর্থনীতির উন্নতি চায়। তাছাড়া ঔপনিবেশিকতার ঐতিহ্য আছে এমন দেশই সাধারণতঃ তাড়াতাড়ি উপনিবেশের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। এর দৃষ্টান্ত ব্রিটিশ, পর্তুগীজ, ফরাসী, ওলন্দাজ প্রভৃতি জাতিসমূহ। জার্মানী ও ইটালীর ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য ছিল না। তাই ঔপনিবেশিক রঙ্গমঞ্চে তাদের আবির্ভাব দেরিতে হয়েছিল।

সাম্রাজ্যবাদের সরাসরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়াও সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য উপনিবেশের বন্দর ও সামরিক ঘাঁটি অধিকার করার বাসনাও দেখা যায়। অতিরিক্ত মনুষ্যশক্তি সংগ্রহের কামনাও ছিল। ফরাসীরা আফ্রিকায় এই মনুষ্যশক্তিই চেয়েছিল, জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধির কামনা যা ইটালীয়রা লিবিয়ায় চেয়েছিল এবং এইসব ছাড়াও অনেক মিশ্রিত কামনা ঔপনিবেশিক আকাঙ্খার সঙ্গে মিশেছিল।

সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার প্রধান তিনটি বলয় ছিল — আফ্রিকা, নিকট প্রাচ্য ও সুদূর প্রাচ্য। ইউরোপীয় দেশগুলি যেমন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালি প্রভৃতি আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে আফ্রিকাকে নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণের একটি ক্ষেত্র ছিল।

অতএব সবশেষে বলা যায়, সাম্রাজ্যবাদের প্রেরণার উৎস ও প্রকৃতি এক নয়, একাধিক। বিভিন্ন দেশে উৎস ও প্রকৃতির বিভিন্নতা আছে। পতাকাকে বাণিজ্য অনুসরণ করেছে ঠিক তা বলা চলে না। বরং উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও জলদস্যু, বাইবেল ও আমলা, ব্যাঙ্কমালিক ও

ব্যবসায়ীর সঙ্গে পতাকা গেছে। পৃথিবীর অনাবিষ্কৃত ও অশোষিত অংশ নানা সুযোগ-সুবিধা এনে দিত যা ঊনিশ শতকের অন্তিমপর্বের প্রতিযোগিতার জগতে সবাই দুহাত বাড়িয়ে নিত।

প্রশ্ন

১। 'Imperialism : The Highest Stage of Capitalism' গ্রন্থটি কার লেখা?
২। উপনিবেশিকতা স্থাপনে যে খ্রীষ্টান মিশনারী সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্থাপন করেছিল তার নাম কি?

২.১.১.২.৪ ঃ সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণ

সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতার প্রধান তিনটি বলয় ছিল আফ্রিকা, নিকট প্রাচ্য ও সুদূর প্রাচ্য, আফ্রিকায় ব্রিটিশ, ফরাসী এবং জার্মানী ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যিক বিস্তারকে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের দিক দিয়ে অত্যন্ত অপরিহার্য মনে করল।

অধ্যাপক ফ্রিজ ফিশার (Fritz Fischer) প্রমুখ জার্মান সংশোধনবাদী ইতিহাসবিদগণ গবেষণার মাধ্যমে জার্মানীর বিশ্বজনীন বিস্তারনীতির কারণ ও উদ্দেশ্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। এর পশ্চাতে জার্মানীর রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলোর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। এরা সকলে সুপরিকল্পিতভাবে সম্প্রসারণশীল নীতি গ্রহণে রাষ্ট্রকে বাধ্য করে এবং ঔপনিবেশিক ও রাজনীতির স্বার্থে ইউরোপের অভ্যন্তরে দক্ষিণ-পূর্ব-ইউরোপে ও ইউরোপের বাইরে মধ্য-প্রাচ্য ও মধ্য আফ্রিকার এক ব্যাপক অঞ্চলে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে দৃঢ়সংকল্প হয়। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের পর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের সময় থেকেই এই বিস্তারধর্মী নীতি গ্রহণ করা হয়। ১৮৯৭ খ্রী. কাইজার উইলিয়াম ঘোষণা করেন যে, জার্মানী আর মহাদেশীয় গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে প্রস্তুত নয়, এবার সে বিশ্বনীতির বা 'Welt Politik' (World Politics) -র পথে অগ্রসর হবে। জার্মান রাজনীতিতে বিত্তবান শ্রেণী তাদের প্রাধান্য অপ্রতিহত রাখার জন্যই বিশ্বজনীন বিস্তারধর্মী নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল।

আফ্রিকার ব্যবচ্ছেদ

ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্যবাদী লালসা এবং শক্তিবৃদ্ধির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল আফ্রিকা ব্যবচ্ছেদের মধ্য দিয়ে। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনার মধ্যেই এই কাজ সম্পন্ন হয়। ইউরোপীয় রাজনীতিতে ইতালী ও জার্মানীর দ্রুততর শক্তিবৃদ্ধির ফলে ইউরোপীয় দেশগুলি যথা-ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ন হয়ে আফ্রিকাকে নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ড বুয়োর রাজ্যদুটি অধিকার করে নেয়। এরপর সাময়িকভাবে বুয়োররা তাদের হৃত রাজ্যগুলি পুনরুদ্ধার করলেও ইংরেজরা বুয়োরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ১৯০২ খ্রীঃ তা পুনরায় নিজেদের দখলে আনে। এর ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজ প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছিল। আফ্রিকার একটি বৃহৎ অংশের উপর ফরাসী আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল, আলজেরিয়া, টিউনিস, সমগ্র সাহারা অঞ্চল, সেনেগাল প্রভৃতি এক বিস্তীর্ন অঞ্চলে ফরাসীরা তাদের দখল বিস্তার করে। আফ্রিকার উত্তর উপকূল থেকে কঙ্গো পর্যন্ত বিস্তীর্ন ভূভাগের উপর ফরাসী আধিপত্য বিস্তৃত হয়।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জার্মানী তোগোল্যাণ্ড, ক্যামেরুন ও আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করে। ইতালী ও পর্তুগালও আফ্রিকাতে তাদের উপনিবেশ গড়ে তোলে। এভাবে প্রায় সমগ্র আফ্রিকায় ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে।

এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতা

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণের একটি ক্ষেত্র ছিল। ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলার জন্য ইঙ্গ-ফরাসীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়েছিল। ফরাসীদের প্রাধান্য খর্ব করে শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা সারা ভারতবর্ষে তাদের উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল, পরবর্তীকালে ভারত সীমান্তে রুশ প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনাকেও ইংরেজরা প্রতিহত করেছিল। এ ছাড়া সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয় প্রভৃতি স্থানেও ইংরেজ উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল।

ফরাসীরা ইন্দো-চীনের এক বিস্তৃত অঞ্চলে অর্থাৎ কোচিনচীন, কাম্বোডিয়া, আন্নাম, লাওস প্রভৃতির উপর ঔপনিবেশিক আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

মধ্য এশিয়ায় ইঙ্গ-রুশ ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হয়ে উঠেছিল। আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে উভয়ের সংকট অত্যন্ত তিক্ত হয়ে উঠেছিল। এই আফগান সমস্যাকে কেন্দ্র করে খাইবার গিরিপথ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ইংরেজদের অধিকারে আসে। রাশিয়াও এই অঞ্চলে তার বিস্তারনীতি অব্যাহত রেখেছিল।

একইভাবে মধ্যপ্রাচ্যে ইঙ্গ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হয়ে উঠেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পারস্য উভয়ের দ্বন্দ্বের ঝটিকাকেন্দ্রে পরিণত হয়। অবশেষে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-রুশ-চুক্তির মাধ্যমে পারস্য দুটি প্রভাব-বলয়ে বিভক্ত হয়। উত্তরাংশ রাশিয়া এবং দক্ষিণাংশ ইংল্যান্ডের প্রভাব বলয় হিসেবে স্থিরীকৃত হয়।

একইভাবে নিকট প্রাচ্য বা তুরস্ক ছিল ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সাম্রাজ্য বিস্তার এবং সংঘর্ষের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র, মৃতপ্রায় তুরস্ককে গ্রাস করাই ছিল ইউরোপীয় শক্তিগুলির উদ্দেশ্য। এই সংঘর্ষের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরা ছিল রাশিয়া, অস্ট্রিয়া এবং ইংল্যান্ড। তুরস্কের অখণ্ডতা বজায় রাখা ছিল ইংল্যান্ডের দীর্ঘ অনুসৃত নীতি। আর তুরস্ককে গ্রাস করা ছিল রাশিয়ার নীতি। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-রুশ কনভেনশন স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ইংল্যান্ডকে তার দীর্ঘদিনের তুরস্ক নীতি পরিহার করে রাশিয়ার মতই তুরস্ককে গ্রাস করতে অগ্রসর হয়।

দূর প্রাচ্যে চীন ছিল ইউরোপীয় শক্তিগুলির সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রধান লক্ষ্য। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি সেখানে অর্থনৈতিক শোষণ এবং রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনের জন্য ব্যস্ত হয়ে হড়ে। প্রথম চীনযুদ্ধ (১৮৩৯-৪২ খ্রী:) এবং দ্বিতীয় চীন যুদ্ধের (১৮৫৬-৬১খ্রী:) সুযোগ নিয়ে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স বাণিজ্যিক অতিরাষ্ট্রিক সুযোগ-সুবিধা অর্জন করে। চীনের দুর্বলতার সুযোগে জাপানও সাম্রাজ্যবাদী হয়ে ওঠে। কোরিয়ার উপর চীনের আধিপত্য চলে যাওয়ার পর সেখানে জাপান তার আধিপত্য বিস্তার করে। রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী, ইংল্যান্ড, জাপান প্রভৃতি দেশ চীনে বিস্তারনীতি অনুসরণ করে চলে। জার্মানী সান্টুং অঞ্চলে, ইংল্যান্ড ইয়াং সিকিয়াং অঞ্চলে, রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়ায়, ফ্রান্স কোয়াং চোয়াং, টনকিন ও ইউনান অঞ্চলে তাদের প্রাধান্য স্থাপন করেছিল। দূর প্রাচ্যে রাশিয়ার অগ্রগতিতে জাপান ও ইংল্যান্ড আশঙ্কিত হয়ে পড়েছিল।

১৯০৪ খ্রী: জাপান শেষ পর্যন্ত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হল। রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়া পরাজিত হয়ে মাঞ্চুরিয়া ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে জাপান কোরিয়া দখল করে নেয়। সাম্রাজ্যবাদী জাপান প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় চীনের কাছে একুশ দফা দাবী পেশ করেছিল।

প্রশ্ন

১। আফ্রিকার কোন কোন দেশে ফরাসীরা তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে?

২। কত খ্রীষ্টাব্দে জাপান কোরিয়া দখল করে?

২.১.১.২.৫ ঃ উপসংহার

১৮৯৭-৯৮ খ্রীষ্টাব্দের পর ইউরোপীয় রাজনীতি বিশ্বরাজনীতির সঙ্গে সমপৃক্ত হয়ে পড়েছিল। অধ্যাপক জি. বারাক্লু (G. Barraclough) মনে করেন ১৮৯৮ খ্রীঃ থেকে ইউরোপের দেশগুলি এবং জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমশ: বিশ্বরাজনীতিতে নিজেদের স্বতন্ত্র অবস্থান গ্রহণ করে। তাই একদিকে যেমন মহাদেশীয় রাজনীতিতে জার্মানীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দ্যোগ ছিল ইউরোপীয় রাজনীতি থেকে উদ্ভূত, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান এই দুটি দেশের কাছে জার্মানীর প্রাধান্যের প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ উদ্বেগ ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ব্রিটেনের সামুদ্রিক আধিপত্য ছিল প্রধান প্রতিবন্ধক, জাপানের কাছে এশিয়ার বিশেষত সুদূর প্রাচ্যে রাশিয়ার ক্রমিক বিস্তারনীতি অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে মহাদেশীয় রাজনীতির চিরায়ত ধারার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক রাজনীতির অভ্যুদয় ঘটেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপ ও ইউরোপ- বহির্ভূত দেশগুলোর যোগদানের ফলে একটি সার্বিক বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল।

২.১.১.২.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী (Reference Books)

(১) প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী — ইউরোপের ইতিহাস।

(২) ডেভিড টমসন (David Thomson) — Europe since Napoleon

(৩) Lenin — Imperialism, the Highest Stage of Capitalism

(৪) E.J. Hobsbawm — The Age of Empire

(৫) P.T. Moon — Imperialism and world politics

(৬) W.L. Langer — The Diplomacy of Imperialism

২.১.১.২.৭ ঃ সম্ভব্য প্রশ্নাবলী (Probable Questions)

(১) সাম্রাজ্যবাদ বলতে কি বোঝায় ? এই শব্দটির প্রচলন ও ব্যাখ্যা বিভিন্ন সময়ে কিভাবে হয়েছে?

(২) নয়া সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব কোন্ সময় থেকে হয়? এই সাম্রাজ্যবাদকে নয়া সাম্রাজ্যবাদ কোন্ অর্থে আখ্যা দেওয়া হয়?

(৩) নয়া সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের কারণ ও বিভিন্ন তত্ত্বগুলি আলোচনা কর।

(৪) ধনতন্ত্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ ইউরোপীয় শক্তিগুলির সম্পর্কের পরিবর্তন কিভাবে ঘটাল?

(৫) সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবে অর্থনৈতিক উপাদান কতখানি দায়ী ছিল?

(৬) ইউরোপীয় দেশগুলির ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রকৃতি আলোচনা কর।

(৭) ১৮৭০ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পূর্ব পর্যন্ত এশিয়া ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণের ধারাটি আলোচনা কর।

পর্যায় গ্রন্থ - ১

উনিশ শতকের দান

Legacy of the Nineteenth Century

একক - ৩

উদারতন্ত্রবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ ও জাতীয়তাবাদ

(Liberalism, Socialism and Nationalism)

বিন্যাসক্রম ঃ

২.১.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

২.১.২.১ ঃ সূচনা

২.১.২.২ ঃ উদারতন্ত্রবাদের উদ্ভব ও প্রসার

২.১.২.৩ ঃ উদারতন্ত্রবাদের বৈশিষ্ট্য

২.১.২.৪ ঃ উদারতন্ত্রবাদের সীমাবদ্ধতা

২.১.২.৫ ঃ উপসংহার

২.১.২.৬ ঃ সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব

২.১.২.৭ ঃ সমাজতন্ত্রবাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২.১.২.৮ ঃ কার্ল মার্কসের পূর্ববর্তী সমাজতন্ত্রীগণ

২.১.২.৯ ঃ কার্ল মার্কসের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ এবং এর প্রভাব

২.১.২.১০ ঃ ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার

২.১.২.১১ ঃ জাতীয়তাবাদ শব্দের সংজ্ঞা

২.১.২.১২ ঃ জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনীয় উপাদান

২.১.২.১৩ ঃ জাতীয়তাবাদের উদ্ভব

২.১.২.১৪ ঃ জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদ

২.১.২.১৫ ঃ জাতীয়তাবাদী আদর্শের বৈশিষ্ট্য

২.১.২.১৬ ঃ জাতীয়তাবাদের দোষ-ত্রুটি

২.১.২.১৭ ঃ সহায়ক গ্রন্থ

২.১.২.১৮ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্ন

২.১.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) উদারতন্ত্রবাদের উদ্ভব, প্রসার ও বৈশিষ্ট্য

(২) উদারতন্ত্রবাদের সাফল্য ও ব্যর্থতা

(৩) সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব ও লক্ষ্য

(৪) আদি সমাজতন্ত্রীগণ ও তাঁদের লক্ষ্য, আদর্শ

(৫) কার্ল মার্কসের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ এবং বিশ্বে এর প্রভাব

(৬) ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার এবং সাফল্য-ব্যর্থতা নিরূপণ

(৭) জাতীয়তাবাদ শব্দের অর্থ, উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য

(৮) জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মার্কসীয় মতাদর্শ

(৯) জাতীয়তাবাদের অবদান

(১০) জাতীয়তাবাদের দোষ-ত্রুটি

২.১.২.১ ঃ সূচনা

ফরাসী বিপ্লব ফ্রান্স তথা বিশ্বের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিপ্লব নতুন ভাবধারার উন্মেষ ঘটিয়েছিল সমগ্র ইউরোপে। ঊনবিংশ শতকে দুটি পরস্পরবিরোধী প্রবণতার মধ্যে সংঘাত দেখা দিয়েছিল। এই প্রবণতা দুটি হল ঃ (১) পরিবর্তনমুখী প্রবণতা এবং (২) পরিবর্তন-বিরোধী প্রবণতা। পরিবর্তনমুখী প্রবণতার জন্ম দিয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের মুক্ত পন্থার আদর্শ এবং পরিবর্তন বিরোধী প্রবণতা এই আদর্শের বিরুদ্ধতা করে চলেছিল। এই পরিবর্তনমুখী প্রবণতা ইউরোপে তিনটি ভাবধারার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। এগুলি হল (১) উদারতন্ত্রবাদ ও গণতন্ত্রবাদ (২) সমাজতন্ত্রবাদ (৩) জাতীয়তাবাদ।

২.১.২.২ ঃ উদারতন্ত্রবাদের উদ্ভব ও প্রসার

১৮১৫ থেকে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী সময়কে David Thomson তাঁর 'Europe since Napoleon' গ্রন্থে আঞ্চলিক অন্তর্বিপ্লবের যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। ('The generation between 1815 and 1849.....was a time of endemic civil war') ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রক্ষণশীল পুরোনো ব্যবস্থা ইউরোপে পুনরায় ফিরে এলে ফরাসী বিপ্লব প্রসূত নতুন ভাবধারার সঙ্গে এর সংঘাত দেখা দেয়। ইউরোপে দুই পরস্পর বিরোধী শক্তির সংঘাত ইউরোপের ইতিহাসকে নতুন দিকে মোড় দেয় এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে রক্ষণশীলবাদী শক্তিগুলি প্রচন্ড আঘাতের সম্মুখীন হয়েছে এবং ইউরোপের প্রায় সর্বত্র নূতন সমাজের প্রয়োজন অনুসারে নূতন ধরনের সরকার গড়ে উঠতে চলেছে। ১৮১৫ থেকে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ইউরোপের ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল প্রগতিপন্থী ও

প্রগতি বিরোধী শক্তির মধ্যে লড়াই। ফরাসী বিপ্লব উদারতন্ত্র, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রচার করে ইউরোপের দেশগুলির জনগণের মনে আশা-আকাঙ্খার সৃষ্টি করেছিল স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্রগুলিতে গণতন্ত্রের জন্য জোরালো দাবী উঠেছিল; আবার জার্মানী, ইতালির ন্যায় দেশে রাষ্ট্রীয় ঐক্য আন্দোলন প্রসার লাভ করেছিল; আবার বেলজিয়াম, গ্রীস, নরওয়ে, পোল্যান্ড, আয়ারল্যান্ডে জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল। গ্রীস ও বেলজিয়ামে উদারনীতিবাদ ও জাতীয়তাবাদ শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েছিল। এই উভয় দেশ গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করেছিল।

১৮১৫ থেকে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ইউরোপের ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল প্রগতিপন্থী ও প্রগতিবিরোধী শক্তির মধ্যে লড়াই। ফরাসী বিপ্লব উদারতন্ত্র, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রচার করে ইউরোপের দেশগুলির জনগণের মনে আশা-আকাঙ্খার সৃষ্টি করেছিল।

২.১.২.৩ ঃ উদারতন্ত্রবাদের বৈশিষ্ট্য

উদারতন্ত্রবাদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমতঃ উদারতন্ত্র শাসকশ্রেণীর স্বৈরাচারী নিরঙ্কুশ ও অবাধ ক্ষমতার ঘোরতর বিরোধী ছিল। সাংবিধানিক শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শাসকের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করাই ছিল উদারনীতিবাদের লক্ষ্য। দ্বিতীয়তঃ উদারতন্ত্রবাদ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও জনগণের বাক্‌স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিল। তৃতীয়তঃ উদারতন্ত্র আইনের চোখে সকল মানুষই সমান এই আদর্শের প্রতি আস্থাশীল ছিল। চতুর্থত ঃ রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণমুক্ত গণ-উদ্যোগ হল এই মতবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি মানুষের যেমন মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে তেমনি তাদের যে কোন উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রেও কোনরকম রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বা বাধা থাকবে না। সবশেষে বলা যায়, উদারনীতিবাদ আইনসভার সার্বভৌম ক্ষমতা ও অধিকার প্রতিষ্টা করতে চেয়েছিল। এই আইনসভা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে এবং জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হবে। উদারতন্ত্রবাদ নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিল। কারণ এই ধরনের সরকার বা শাসনব্যবস্থা আইনসভার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে স্বৈরাচারী বা সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী হতে পারবে না। এই উদারতন্ত্রী ভাবধারা ও আদর্শ ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলন্ডে গৌরবময় বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে সংবিধান সভা কর্তৃক প্রণীত লিখিত সংবিধানটি উদারতন্ত্রবাদের সাফল্যের পরিচয় প্রদান করে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে জুলাই বিপ্লবের ফলে যে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উদারনীতি তাকে স্বাগত জানিয়েছিল।

উদারতন্ত্রবাদ নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিল। কারণ এই ধরনের সরকার বা শাসনব্যবস্থা আইনসভার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে স্বৈরাচারী বা সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী হতে পারবে না।

কিন্তু উদারতন্ত্রবাদের উগ্র রূপটি প্রকাশ লাভ করেছিল গণতন্ত্রবাদের মধ্য দিয়ে। গণতন্ত্রবাদীরা গণ-সার্বভৌমত্বের তত্ত্বে আস্থাশীল ছিল। এই তত্ত্বের প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়েছিল রুশোর 'General Will' বা জনসাধারণের ইচ্ছা তত্ত্বের মধ্যে । উদারতন্ত্রবাদীরা কিন্তু এই তত্ত্ব প্রচার করেনি। উদারতন্ত্রবাদীরা গণতন্ত্রবাদের সার্বজনীন ভোটাধিকার নীতি প্রয়োগও মেনে নিতে পারেনি। আইনসভার নির্বাচনে সমস্ত জনগণই ভোটে অংশগ্রহণ করবে তা উদারনীতিবাদের সমর্থকদের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। তাই ফ্রান্সে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের উদারনৈতিক সংবিধানে সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদের মধ্যেই ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ থাকবে তা মেনে নেওয়া হয়েছিল।

প্রশ্ন

১। উদারতন্ত্রবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?

২.১.২.৪ ঃ উদারতন্ত্রবাদের সীমাবদ্ধতা

ইউরোপে ১৮১৫ থেকে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে উদারতন্ত্রবাদের সাফল্য ছিল সীমিত। একমাত্র গ্রীস ও বেলজিয়ামে স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া অন্যান্য স্থানে উদারতন্ত্রবাদ পরাক্রমশালী রাজতান্ত্রিক শক্তি ও তার সেনাবাহিনীর কাছে পরাস্ত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত উদারনীতিবাদের সমর্থকগণ কোন বাস্তব আদর্শবাদ জনগণের কাছে স্থাপন করতে পারেনি। রাষ্ট্রের গঠন সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট ধারণার অভাব ছিল এবং জনসাধারণের কাছে তারা কোনরকম কার্যকরী পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য উপস্থাপিত করতে পারেনি। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় জার্মানী ও ইটালীর উদারনৈতিক আন্দোলনে। ইটালীর ক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্র গঠন সম্পর্কে ম্যাৎসিনি ও তাঁর সমর্থকগণ বাস্তবতাবর্জিত রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় রেখেছিল। জার্মান উদারনীতিবিদরা ফ্রাঙ্কফোর্ট পার্লামেন্টে কোন কার্যকরী গঠনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

২.১.২.৫ ঃ উপসংহার

তবে উদারনীতিবাদ, গণতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি- যেমন নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, ভূস্বামী অভিজাতশ্রেণী ও ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে যে পরিবর্তনমুখী চিন্তাধারার বার্তা নিয়ে এসেছিল তা অবশ্যই ইউরোপের রাজনৈতিক পুনর্গঠনের পথ প্রস্তুত করেছিল। ১৮১৫-১৮৭১ ইউরোপের ইতিহাসের এই পর্বে পরিবর্তনমুখী প্রবণতাগুলি পুরোনো প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে আপোস করতে বাধ্য হলেও ইউরোপের পুনর্গঠন ঘটিয়ে সামগ্রিকভাবে যে জয়লাভ করেছিল তা অস্বীকার করা যায় না।

২.১.২.৬ ঃ সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব

ঊনবিংশ শতকের উদারতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ন্যায় সমাজতন্ত্রবাদী আন্দোলনও প্রসারলাভ করে। এই মতবাদ হোল দার্শনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ। ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী মালিকানার পরিবর্তে সমষ্টিগত উৎপাদন ও আয় বন্টনের দ্বারা সমাজে অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠা করাই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য। সমাজব্যবস্থাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করেই সমাজতান্ত্রিক মতবাদের উদ্ভব হয়েছে। এই মতবাদের উদ্ভবের কারণ টানা যায় শিল্পবিপ্লবের সূচনা থেকে। শিল্পবিপ্লবের ফলশ্রুতি হিসেবেই ইউরোপে সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি হয়েছিল। ইংলন্ডে প্রথম এই শিল্পবিপ্লব শুরু হয়েছিল। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কারের ফলে উৎপাদনব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটল। এই শিল্পবিপ্লব ইউরোপের দেশে যেমন ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়াতে ছড়িয়ে পড়ল। এর ফলে ইউরোপের দেশগুলিতে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের জন্য বড় বড় কল-কারখানা গড়ে উঠল। প্রচুর পরিমাণে শিল্পদ্রব্য উৎপাদিত হতে শুরু করল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশগুলিতে। এই নতুন যন্ত্রচালিত উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসারের ফলে পূর্বতন সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার অবসান হল এবং ব্যক্তিনিষ্ঠ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেল। মানুষের মস্তিষ্ক, বিশেষ গুণ ও প্রতিভা মূল্যহীন হয়ে পড়ল। কেবলমাত্র যন্ত্রশক্তির সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থাকে সচল রাখার জন্য কায়িক শ্রমের প্রয়োজন অনুভূত হল। সৃষ্টি হল এক নতুন শ্রেণীর। এই শ্রেণী হল কায়িকশ্রমে নিযুক্ত মজুরিপ্রাপ্ত দরিদ্র শ্রমিকশ্রেণী। অতএব দুটি নতুন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হল যন্ত্রচালিত নব উৎপাদনব্যবস্থায়। এরা (১) পুঁজিপতি

মালিক শ্রেণী এবং (২) শ্রমিক শ্রেণী। এই নতুন ব্যবস্থা সমাজদেহে এক সর্বগ্রাসী ও সুদূরপ্রসারী সমস্যার সৃষ্টি করল। শিল্পবিপ্লব থেকে উদ্ভূত এই সমস্যা জন্ম দিল এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজদর্শনের যা ইতিহাসে সমাজতন্ত্রবাদ নামে পরিচিত। মার্কসবাদ সমাজতন্ত্রবাদেরই পরিশোধিত রূপান্তর।

পুঁজিপতি মালিক শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে নানাকারণে ব্যবধান গড়ে উঠেছিল। এই সব কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—শ্রমিক শোষণ, অত্যাচার, স্বল্প মজুরী, শ্রমিকদের উপর অমানুষিক পরিশ্রমের বোঝা, শ্রমিকদের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস, কর্মের স্থায়িত্বের অভাব, শিশু ও নারী শ্রমিকদের অধিক সময় খাটানো, শ্রমিকদের দৈহিক অবনতি ও মানসিক উদ্বেগ ইত্যাদি। শ্রমিকরা নির্দিষ্ট সময়ের বেশি কাজ করা সত্ত্বেও অতি সামান্য মজুরী পেত। অন্যদিকে মূলধনী পুঁজিপতি সম্প্রদায় দিন দিন তাদের লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি করে চলেছিল। ধনী থেকে অধিকতর ধনী হচ্ছিল। এর ফলে মূলধনী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হল। শুরু হল শ্রমিকশ্রেণীর বিপর্যয় নিয়ে নানা চিন্তাভাবনা। এই চিন্তাভাবনার ফলশ্রুতি হল সমাজতন্ত্রবাদ। অষ্টাদশ শতকে এই সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কিত চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়েছিল। এরপর বহু দার্শনিক তাঁদের চিন্তাধারার মাধ্যমে এই মতবাদকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদের ছায়া অষ্টাদশ শতকের বেশ কিছু আগেই পাওয়া যায়। দার্শনিক প্লেটোর (Plato) 'Republic' গ্রন্থে সমাজতন্ত্রবাদের ছায়া পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকের ইংরেজ চিন্তাবিদ স্যার টমাস মুর তাঁর 'Utopia' ('ইউটোপিয়া') গ্রন্থে সমাজে অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য বিধানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটিয়ে একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন। তবে এসবই ছিল কল্পনাভিত্তিক। আধুনিক সমাজতন্ত্রের সূচনা ফরাসী বিপ্লব থেকে শুরু করা যেতে পারে। রুশোর 'General Will' বা 'সাধারণের ইচ্ছা' এবং ফরাসী বিপ্লবের সুমহান আদর্শ সমাজতান্ত্রিক আদর্শের গতিশীলতা এনেছিল।

শিল্পবিপ্লবের ফলশ্রুতি হিসেবেই ইউরোপে সমাজতন্ত্রবাদের উৎপত্তি হয়েছিল। ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী মালিকানার পরিবর্তে সমষ্টিগত উৎপাদন ও আয় বন্টনের দ্বারা সমাজে অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠা করাই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য।

ম্যাবলি ও মোরেলি এই মতবাদ প্রচার করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের সময় এই আদর্শ হিবার্টপন্থী আন্দোলনে ও জ্যাকোবিনদের কার্যকলাপে দৃষ্ট হয়েছিল। বিপ্লবের বুর্জোয়া নেতৃত্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে পবিত্র 'আখ্যা' দিলেও জনসাধারণের বিপর্যয় এবং বুদ্ধিজীবীদের আবেগ ও চিন্তাধারা মিশ্রিত হয়ে 'ব্যাবেয়ুফ' আদর্শ ও পন্থার সৃষ্টি করেছিল। তাঁর আদর্শের মধ্যে সমাজতন্ত্রবাদী লক্ষণ বজায় ছিল। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় এই কল্পনামিশ্রিত রূপটির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ থেকে। কারণ এই সময়ে শিল্পবিপ্লবের প্রসারের ফলে মালিকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের তিক্ততা বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। নতুন উৎপাদন সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করেই ঊনবিংশ শতকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ক্রমশঃ প্রাথমিক কল্পনাশ্রয়ী রূপটি মুছে ফেলে বিজ্ঞানসম্মত দর্শনের পথে অগ্রসর হল।

২.১.২.৭ ঃ সমাজতন্ত্রবাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সমাজতন্ত্রবাদ পুঁজিবাদের ও অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের ঘোর বিরোধী। ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণীবিশেষের মালিকানার পরিবর্তে সমতার ভিত্তিতে অর্থ বন্টন করা এই মতবাদের প্রধানতম লক্ষ্য। এই মতবাদের প্রবক্তাদের মতে, পুঁজিপতি

মালিকশ্রেণী কর্তৃক শ্রমিকদের শোষণের ফলেই সমাজদেহে নানা সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। ধনী মালিকশ্রেণী ও দরিদ্র শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিরাট অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলেই সামাজিক সংকটের উদ্ভব ঘটেছে। সুতরাং সমাজতন্ত্রীদের দাবী হল জমি, মূলধন, সম্পত্তি ইত্যাদি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সব কিছুই ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সমষ্টিগত বা রাষ্ট্রীয় মালিকানার অধীনে আনয়ন।

তবে সমাজতন্ত্রবাদীদের নীতি ও আদর্শগত মতভেদ লক্ষণীয়। নরমপন্থী সমাজতন্ত্রীগণ যেমন ইংলন্ডের শ্রমিকদল (Labour Party) এবং ফ্রান্স ও জার্মানীর সমাজতন্ত্রীগণ সম্পত্তি ও উৎপাদনব্যবস্থার রাষ্ট্রায়ত্বের উপর জোর দিয়েছেন এবং এই ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা হবে বলেই তাদের ধারণা। অন্যদিকে Syndicalist-রা মনে করে যে, প্রত্যেক শিল্পের মালিকানার অধিকার শ্রমিক-সংঘের হাতে অর্পণ করা উচিত। 'সমষ্টিবাদের' (Collectivism) নীতির প্রবক্তারা রাষ্ট্র কর্তৃক শুধুমাত্র উৎপাদনের উপাদানগুলি নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। বিপ্লবী সাম্যবাদী দেশের সব সম্পত্তি এবং উৎপাদনের ব্যবস্থা একমাত্র জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত করার উপর জোর দিয়েছে। এই ব্যবস্থায় মজুরি প্রথার প্রচলন থাকবে না এবং রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে কাউকেও মজুরি গ্রহণে বাধ্য করবে না।

সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কেবলমাত্র নীতি ও আদর্শের পার্থক্যই ছিল না, কার্যপদ্ধতির দিক থেকেও তাদের মধ্যে নানা মত পার্থক্য বজায় ছিল।

প্রশ্ন

১। সমাজতন্ত্রবাদ বলতে কি বোঝ?

২। সমাজতন্ত্রবাদের প্রধানতম লক্ষ্য কি ছিল?

২.১.২.৮ ঃ কার্ল মার্কস পূর্ববর্তী সমাজতন্ত্রীগণ

কার্ল মার্কস পূর্ববর্তী আদি সমাজতন্ত্রবাদের প্রবক্তারা হলেন ইংলন্ডের রবার্ট ওয়েন (Robert Owen), ফ্রান্সের সেন্ট সাইমন (সাঁ সিমোঁর) (St. Simon), চার্লস ফুরিয়ার (Charles Fourier), লুই ব্লাঙ্ক (Louis Blanc) প্রভৃতি। এই সব আদি সমাজতন্ত্রীগণ মানবতার আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য, দৈন্য, অত্যাচার, অবিচার তাঁদের মনকে নাড়া দিয়েছিল বলে তারা এক সুন্দর সমাজ জীবনের কল্পনা করেছিলেন। এঁরা শিল্পপতি ও শ্রমিকদের পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও সহযোগিতার ভিত্তিতে আদর্শ শিল্পনগরী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আদি সমাজতন্ত্রীদের চিন্তা ও আদর্শ নিঃসন্দেহে মহৎ হলেও তা ছিল কল্পনাশ্রয়ী ও অবাস্তব। তাই এঁদের বলা হয়ে থাকে অবাস্তব সমাজতন্ত্রী (Utopian Sosialists)। মার্কসবাদীরা এদের 'কল্পনাশ্রয়ী আদর্শবাদী' বলে আখ্যা দিয়েছেন। তবে আদি সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে প্রখ্যাত ছিলেন লুই ব্ল্যাঙ্ক। তিনি কল্পনাশ্রয়ী সমাজতন্ত্র ও আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের জনক কার্ল মার্কসের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করেছিলেন। তিনি কল্পনাশ্রয়ী সমাজতন্ত্রকে অনেকটাই বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Organization of Labour'এ প্রতিটি

কার্ল মার্কস-পূর্ববর্তী আদি সমাজতন্ত্রীদের চিন্তা ও আদর্শ মহৎ হলেও তা ছিল কল্পনাশ্রয়ী ও অবাস্তব। কারণ তাঁরা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার চেয়ে শাসক, অভিজাত ও শিল্পপতিদের হৃদয় পরিবর্তনের জন্য তাদের নানাভাবে প্রভাবিত করতে চাইলেও শেষপর্যন্ত তা সফল হয়নি।

মানুষের কাজের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া রাষ্ট্রের আবশ্যিক কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। বিত্তবান ও শিল্পপতিদের পরিবর্তে তিনি সাধারণ শ্রমিকদের কাছে আবেদন রেখেছিলেন মুনাফাভোগীদের তীব্রভাবে আঘাত করার জন্য। তাঁর মতবাদ শ্রমিক শ্রেণীকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছিল এবং ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে তিনি ছিলেন একজন বড় নেতা। ফ্রান্সে তাঁর মতবাদের প্রভাবে জাতীয় কারখানার পত্তনও হয়েছিল, যদিও এই সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি নানা বাধা বিপত্তির ফলে।

তবে লুই ব্ল্যাঙ্ক ছাড়া অন্যান্য আদি সমাজতান্ত্রিকরা অবাস্তব আদর্শবাদী হওয়ায় তাদের মতবাদ শেষ পর্যন্ত অসার প্রমাণিত হয়েছিল। কারণ তাঁরা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার চেয়ে শাসক, অভিজাত ও শিল্পপতিদের হৃদয় পরিবর্তনের জন্য তাদের নানাভাবে প্রভাবিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই অবাস্তব কাজ শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। তবে তাদের অবদান একেবারে অস্বীকার করা যায় না। তাঁদের সমালোচনা ও সমাজতান্ত্রিক কার্যকলাপ ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নানা দোষত্রুটি প্রকট করে দিয়েছিল। তবে আদি সমাজতন্ত্রীদের সমাজতান্ত্রিক না বলে মানবতাবাদী সমাজ সংস্কারক হিসেবে অভিহিত করাই অধিকতর সঙ্গত হবে বলে মনে হয়।

তবে সমাজতান্ত্রিক ও বামপন্থী মতাদর্শ গড়ে তোলার পেছনে শিল্পবিপ্লবের ভূমিকা ছিল। শিল্পবিপ্লব যুগের পরবর্তীকালে ইউরোপে এক নূতন সামাজিক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। সনাতন কুটির ও হস্তশিল্পে নিযুক্ত শ্রমজীবীরা শহুরে শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল এবং এরা এসেছিল শহর ও শহর সংলগ্ন গ্রামাঞ্চল থেকে। শিল্প ও শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক শ্রেণীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল ফ্যাক্টরী (Factory) ব্যবস্থা। ধীরে ধীরে এই শ্রমিকশ্রেণী শহরগুলিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করল।

শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম প্রকাশ ও প্রভাব অনুভূত হয় ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে। ১৮৪৮-৫২ সময়পর্বে নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে এবং শ্রমিক শ্রেণীর অধিকারের দাবী সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৮৪৮-৫২ খ্রীষ্টাব্দের সময়পর্বে শ্রমিকশ্রেণী এবং তাদের নেতারা রাজনৈতিক কারণে উদ্ভূত ফরাসী বিপ্লবকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক চরিত্র দেবার চেষ্টা করেছিল। এই বিপ্লব খুব একটা সফল না হলেও পশ্চিম ইউরোপে যে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর পর থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ইউরোপে এক নতুন দিকে মোড় নেয়।

প্রশ্ন

১। কার্ল মার্কস পূর্ববর্তী দু-জন সমাজতন্ত্রবাদীর নাম লেখ? কেন তাদের 'কল্পনাশ্রয়ী আদর্শবাদী' বলে আখ্যা দেওয়া হয়?

২.১.২.৯ ঃ কার্ল মার্কসের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ এবং এর প্রভাব

ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রবাদ কার্ল মার্কস ও এঙ্গেল্‌সের যুগ্ম রচনা 'The Communist Manifesto' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিণতি লাভ করে। মার্কস ছিলেন আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রবাদের জনক। নিজ মতবাদকে 'বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রবাদ' বা 'সাম্যবাদ' (Communism) নামে অভিহিত করে মার্কস আদি সমাজতন্ত্রবাদের অসারতা এবং সেই মতবাদের সঙ্গে তাঁর মতবাদের সুস্পষ্ট পার্থক্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর অনবদ্য পুস্তক 'Das Capital' ('দাস্ ক্যাপিটাল্') প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে ধনতন্ত্র সমাজকে শোষণের পথে নিয়ে যায়। এই প্রথার নানা শোষণ, অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার দিকগুলো উন্মোচিত করে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের উপর। এমন কি তিনি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য বৈপ্লবিক কর্মপন্থার কথা তুলে

ধরেছিলেন। তত্ত্বগত দিক দিয়ে এখানে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ অন্যান্য সমাজতন্ত্রবাদ থেকে আলাদা হয়ে সাম্যবাদের (Communism) তত্ত্ব সৃষ্টি করেছিল। ১৮৪৮-৫২ খ্রীষ্টাব্দের সময়পর্বে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের ব্যর্থতা এবং এর ফলে তাদের উপর নানাধরনের অত্যাচার, নিষ্পেষণের তিক্ত অভিজ্ঞতা কার্ল মার্কসকে পীড়া দিয়েছিল। ফলে মার্কস্ শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামশীল আন্দোলন ও সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর রচিত 'কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টো'তে তিনি বলেছেন যে "এতাবৎকাল মানবসমাজের ইতিহাস হল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস।" তাঁর মতে, সব যুগেই মানবসমাজ নানা অর্থনৈতিক শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে নিরন্তর শ্রেণীসংঘর্ষ চলেছে। আধুনিককালে এই দ্বন্দ্ব চলেছে বিত্তবান পুঁজিপতিশ্রেণী ও শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে। শোষিতশ্রমিক শ্রেণী তাদের মুক্তির জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রামে লিপ্ত হবে। এই কারণেই তিনি দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধভাবে পুঁজিপতি শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে আহ্বান করেছেন—"দুনিয়ার মজদুর এক হও।" এই সংগ্রামের আশু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রের উপর অধিকার স্থাপন। কারণ মার্কসের মতে, "রাষ্ট্র শ্রেণী শোষণের যন্ত্র"। তাই সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবের মাধ্যমে ধনতন্ত্রী পুঁজিপতিদের হটিয়ে দিয়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সবশেষে রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র অধিকার করবে এবং এই ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হবে 'সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র'। এই 'সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র' এবং শ্রমিক বিপ্লব যখন পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে পারবে তখন সমাজে পুঁজিপতি শ্রেণীর অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটবে এবং শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে উঠবে। এই সঙ্গে শ্রেণীশোষণের যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যাবে এবং তারও সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটবে। এ ভাবেই সমাজতন্ত্রবাদ তার সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছতে পারবে।

আধুনিককালে বিত্তবান পুঁজিপতিশ্রেণী ও শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলছে। শোষিত শ্রমিক শ্রেণী তাদের মুক্তির জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রামে লিপ্ত হবে। এই কারণেই কার্ল মার্কস দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধভাবে পুঁজিপতি শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে আহ্বান করেছেন — "দুনিয়ার মজদুর এক হও।" এই সংগ্রামের আশু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রের উপর অধিকার স্থাপন।

মার্কসবাদের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিকটি ছিল একটি যুক্তি নির্ভর তত্ত্বের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট কর্মপন্থার সমন্বয় সাধন। এ কথা সুবিদিত যে মার্কসীয় চিন্তাধারা এবং কর্মপন্থা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তত্ত্বটিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। এই দার্শনিক তত্ত্বটি গ্রহণে তিনি হেগেলের (Hegel) কাছে যথেষ্ট পরিমাণে ঋণী হলেও তাঁর কৃতিত্ব হোল তিনিই কিন্তু হেগেলের আদর্শবাদী দার্শনিক তত্ত্বকে বস্তুতান্ত্রিক রূপ দিয়েছিলেন। এর ফলে ইতিহাসে বস্তুবাদ তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছিল। মার্কসের মতে, প্রতিটি ঘটনার বিবর্তনের মধ্যে আছে থিসিস্, অ্যান্টিথিসিস্ ও সিন্থেসিসের শক্তি। আধুনিক যুগের শোষক পুঁজিপতি বুর্জোয়ারা হল থিসিস্ অর্থাৎ রক্ষণশীল, পরিবর্তন বিমুখ শক্তি; শোষিত শ্রমিকশ্রেণী হল অ্যান্টি থিসিস অর্থাৎ সংগ্রামশীল পরিবর্তনকামী শক্তি। এই পরস্পরবিরোধী উভয়শ্রেণীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকারী শক্তিটি হল সিন্থেসিস্। এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষের ফলে যে শ্রেণীহীন সমাজের সৃষ্টি হবে তাই হল সিন্থেসিস। এইভাবে মার্কস জগতের অগ্রসরতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের শর্তগুলি যদি গ্রহণ করা যায় তবে ঐতিহাসিক পরিবর্তন যে কোনো সমাজের কাছে অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এই পরিবর্তন হল একটি ঐতিহাসিক অধ্যায় থেকে আরেকটি ঐতিহাসিক অধ্যায়ে রূপান্তর যার সবশেষে পরিণতি হল ধনতন্ত্রের অবসান এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। মার্কস্ বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্য যুক্তি থেকেই পরিবর্তন আসবে। এর ফলে মার্কসবাদীরা তাদের কর্মপন্থার সাফল্যের ওপর গভীর বিশ্বাস আয়ত্ত করেছিলেন। সাম্যবাদীদের মধ্যে অসাধারণ বিশ্বাস জাগরণের ফলে Communist বা সাম্যবাদী কর্মপন্থা অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক তত্ত্ব থেকে পৃথক হয়ে পড়েছিল। এই অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বে কোন কোন সময়ে অনেক বেশি উদারনৈতিক মতের প্রভাব দেখা যায়।

মার্কসীয় তত্ত্বের বিশ্লেষণে সবচেয়ে গুরুত্ব লাভ করেছে অর্থনীতি। তাঁর মতবাদের অন্যতম প্রধান সূত্র হল উদ্বৃত্ত মূল্যের সূত্র। এই সূত্রানুসারে কোন বস্তুর প্রকৃত মূল্য হল এর পশ্চাতে নিয়োজিত শ্রমের ফল। কিন্তু শ্রমের অধিক গুরুত্ব সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিপতি মালিক শ্রেণীর কাছে গুরুত্বহীন এবং অত্যন্ত অসহায়। শ্রমিকশ্রেণী মূলধনী শ্রেণীর কাছে তাদের শ্রম বিক্রি করা সত্ত্বেও তাদের কপালে অতি সামান্য মজুরি জোটে। কিন্তু দিন-রাত্রি খেটে তারা যে সামান্য মজুরি পায় তার তুলনায় তারা তাদের পুঁজিপতি মালিককে অনেক বেশি দেয় অধিকতর উৎপাদনের মধ্য দিয়ে। এইভাবে যে উদ্বৃত্ত মূল্য শ্রমিকরা সৃষ্টি করছে তা কাজে লাগিয়ে বুর্জোয়া পুঁজিপতিশ্রেণী লাগামছাড়া মুনাফা অর্জন করছে। সুতরাং মার্কসীয় তত্ত্বানুসারে একমাত্র শ্রমের মাপকাঠিতেই আয়ের বন্টন হওয়া প্রয়োজন। শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন সামগ্রী থেকে যে অর্থ আসে তার উপর একমাত্র তাদেরই অধিকার থাকা উচিত।

মার্কস তাঁর তত্ত্ব বিশ্লেষণে পশ্চিম ইউরোপের তিনটি প্রধান দেশের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছিলেন। এই দেশগুলি হল—ইংলন্ড, ফ্রান্স এবং জার্মানী। তিনি তাঁর অর্থনৈতিক সূত্র গ্রহণ করেছিলেন ইংলন্ডের ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি অনুধাবন করে। ফ্রান্সের বৈপ্লবিক ইতিহাস ও রাজনীতির আমূল পরিবর্তন তাঁকে শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্বের গ্রহণে ও বিশ্লেষণে সাহায্য করেছিল। আর জার্মানীর দার্শনিক ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে তিনি তাঁর সার্বিক দার্শনিক তত্ত্বটি গ্রহণ করেছিলেন। অতএব মার্কসীয় চিন্তাধারায় ত্রিবিধ উপাদানগুলির সংমিশ্রণতার লক্ষণ বজায় আছে। এগুলি হল—ইংরেজ অর্থনৈতিক তত্ত্ব এবং প্রয়োগ; ফ্রান্সের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং জার্মানীর দার্শনিক তত্ত্ব। মার্কসের দার্শনিক তত্ত্ব যেমনই ছিল সমৃদ্ধশালী, ঠিক তেমনই ছিল বিশ্বে প্রভাবশালী এবং আলোড়ন সৃষ্টিকারী। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ঊনিশ শতকে ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা এবং আন্দোলন মার্কসীয় তত্ত্ব ও ধারণার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

মার্কস আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এবং এঙ্গেলসের সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রথম আন্তর্জাতিক সর্বহারাদের সংগঠন 'Communist League' ('কমিউনিস্ট লীগ') প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে)। এর স্লোগান ছিল 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' ('Workers of the World unite') এই সংস্থার লক্ষ্য ও কর্মসূচী মার্কস ও এঙ্গেলস্ রচনা করেছিলেন। 'বিজ্ঞানসম্মত' 'সমাজতন্ত্রবাদ' বা সাম্যবাদের মূল নীতি, শ্রমিক আন্দোলনের কর্মসূচী, লক্ষ্য ও লক্ষ্যে পৌঁছাবার পন্থা ইত্যাদি কৌশল মার্কস এই সময় নির্দেশিত করেন। তাঁর চেষ্টায়ই সমাজতান্ত্রিক ও শ্রমিক আন্দোলন একটি অভিন্ন ধারায় এই সময় থেকে প্রবাহিত হতে থাকে। মার্কসবাদীয় সমাজতন্ত্রের মূল সোপান ছিল আন্তর্জাতিকতাবাদ (Internationalism)। আন্তর্জাতিকতাবাদের মূল বক্তব্য হল, 'সর্বহারাদের কোন পিতৃভূমি নেই'। তাই পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ সর্বহারা সংগ্রাম গড়ে তোলার আহ্বান তিনি জানিয়েছিলেন। মার্কসের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল লন্ডনে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ শে সেপ্টেম্বর 'প্রথম আন্তর্জাতিক' (First International)। এর ফলে বহু দেশে সমাজতান্ত্রিক দল গঠনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। বিভিন্ন দেশে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলা এবং আন্দোলনে সহায়তা করার ক্ষেত্রেও 'প্রথম আন্তর্জাতিক' সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কার্ল মার্কসের মৃত্যুর পর 'আন্তর্জাতিকে'র কাজকর্মকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন এঙ্গেলস্। তিনিই ছিলেন 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের' প্রাণপুরুষ। কার্ল মার্কস এবং এঙ্গেলস্ ইউরোপের সমাজতন্ত্রকে একটি প্রাণবন্ত গতিময় আন্দোলনে পরিণত করেছিলেন।

প্রশ্ন

১। কার্ল মার্কসের লেখা একটি বইয়ের নাম লেখ?

২। মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বাস্তবাদ তত্ত্বটি কি?

২.১.২.১০ ঃ ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার

ঊনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন প্রসারলাভ করেছিল। প্রাক্ ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলে ইংলন্ড, ফ্রান্স এবং জার্মানীতে ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘটের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলন করেছিল। ইংলন্ডের চার্টিস্ট আন্দোলন (১৮৩৬-৪৮), ফ্রান্সে 'সোস্যাল ডেমোক্রেসি'র আন্দোলন শুধু প্রবল হয়েই উঠেনি, সেইসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের পথও প্রস্তুত করেছিল। ফ্রান্সে এর সূত্র ধরে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ঘটানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই সব আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে উপনীত হওয়া। তবে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বিপ্লব খুব একটা সাফল্য না পাওয়ায় কিছুকালের জন্য সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে ভাঁটা পড়েছিল। তবে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর ইউরোপে আবার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বিশেষভাবে প্রসারলাভ করে।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে প্যারী কমিউনের অভ্যুত্থান সমাজতন্ত্রবাদের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই অভ্যুত্থানের পেছনে সমাজতন্ত্রীদের এক সক্রিয় ভূমিকা আছে বলে ফরাসী সরকার মনে করে। এ কারণে ফ্রান্সে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসার রোধ করার জন্য সরকার সমাজতন্ত্রীদের উপর অকথ্য অত্যাচার নিপীড়ন শুরু করে। এর ফলে বহু সমাজতন্ত্রী দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। এই কারণে বেশ কিছুকাল শ্রমিক আন্দোলন বা সমাজতান্ত্রিক দল গঠনের প্রচেষ্টা নির্বাসিত বা দেশত্যাগী ফরাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে সেডানের যুদ্ধের পরাজয়ের পর ফ্রান্স দ্রুত শিল্পায়নের অগ্রসরতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, শ্রমিকশ্রেণীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিল্পোন্নয়নের হাত ধরে সমাজতন্ত্রবাদও আবার ফ্রান্সে নতুনভাবে প্রসারলাভ করে। ১৮৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে দুই সমাজতন্ত্রী জুলেস গুয়েসেডে (Jules Guesede) এবং পল লাফার্গ (Paul Lafargue) মার্কসীয় ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'ওয়াকার্স পার্টি' গঠন করে। কিন্তু এ সময়ে আরও নানা অ-মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক সংগঠনও ফ্রান্সে গড়ে উঠতে থাকে। এদের মধ্যে নানা প্রশ্নে বিভাজন, দ্বন্দ্ব ও অনৈক্য পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে ফ্রান্সে দুর্বল করে তুলেছিল।

ইংলন্ডে ঊনিশ শতকের শেষদিকে মার্কসীয় সমাজতন্ত্র বিরোধী এবং ব্রিটিশ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের অনুসারী ফেবীয় সমাজতন্ত্র প্রচলিত হয়। এঁরা ইংলন্ডে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। এঁরা বিপ্লব বিরোধী ছিল এবং বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে সমাজতন্ত্রবাদ আনতে চেয়েছিলেন। সে কারণে এই মতবাদ 'সামাজিক ডারউইনবাদ' নামে অভিহিত। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ফেবীয়দের একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয় এবং 'Independent Labour Party' গঠিত হয় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে। ইংলন্ডে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এই সময় শ্রমিকরা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত 'লেবার পার্টি'র সঙ্গে যুক্ত হয় ফেবীয় দল ও 'Independent Labour' দলের সমাজতন্ত্রীরা। পরে 'লেবার পার্টি' লক্ষ্য হিসেবে সমাজতন্ত্রবাদকে গ্রহণ করলেও মার্কসীয় তত্ত্বকে স্বীকৃতি জানায়নি।

রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা প্রসারলাভ করেছিল ঊনিশ শতকের শেষদিকে এবং বিশ শতকের সূচনায়। রাশিয়ায় জারতন্ত্রের স্বৈরাচারে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা প্রসারে নানাভাবে বাধা আসে। তবু শিল্পোন্নয়নের ফলে ঊনিশ শতকের একেবারে শেষদিকে সেখানে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটতে শুরু করে। রুশ মার্কসবাদের জনক প্লেখানভ 'Emancipation of Labour' নামে একটি মার্কসীয় সংগঠন গড়ে তোলেন। এই দলের বহু তরুণ সদস্য

ছিলেন। এই তরুণদের নেতা ভি. আই. লেনিনের নেতৃত্বে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে 'রুশ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি' স্থাপিত হয়। এই দল পরে 'বলশেভিক' ও মেনশেভিক'— এই দুই দলে ভাগ হয়ে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের দুর্বলতা ও ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক দল বিপ্লবের মাধ্যমে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় ক্ষমতা দখল করে। এইভাবে বলশেভিক দলের ক্ষমতায় আসার ফলে রাশিয়ার মত বিশ্বের একটি বিশাল দেশে লেনিনের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

ঊনিশ শতকের শেষদিকে এবং বিশ শতকের সূচনায় জার্মানীতে একটি শক্তিশালী গণভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এর পশ্চাতে কারণ ছিল একদিকে ১৮৭০ এর দশক থেকে জার্মানীতে শিল্পোন্নয়ন ও জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং অন্যদিকে ১৮৯০ সাল নাগাদ সেখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক দল —'German Social Democratic Party'র গঠন। এর ফলে ঊনিশ শতকের শেষের দশকে জার্মানীতে পৃথিবীর বৃহত্তম সমাজতান্ত্রিক দলের উদ্ভব ঘটে। এই দলের ছিল একটি সুসংহত তত্ত্ব; বাস্তব আন্দোলনের ঐতিহ্য, সুদক্ষ নেতৃত্ব এবং ব্যাপক গণ-সমর্থন। এই দলের তত্ত্ব মার্কস্ এবং এঙ্গেলস্‌ের মতবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। ফার্ডিনান্ড লাসালের নেতৃত্বে এই দল অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং তাঁরই চেষ্টায় শুধু এই দল শক্তিশালী হয়ে উঠেনি; আইনসভার বাইরে এবং ভিতরে আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকে। এদিক দিয়ে দেখলে লাসালকেই প্রকৃত বিচারে জার্মানীর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রবর্তক এবং 'Social Democratic Party'-র আন্দোলনের ঐতিহ্যের সৃষ্টিকর্তা বলা যেতে পারে।

তবে লাসাল ও তার সমর্থক গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল জাতীয়তাবাদী। তাঁরা জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। অন্যদিকে কার্ল কট্‌স্কি, লাইবনেক্ট্ ও বেবেল প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিকদের ও তাদের অনুগামীদের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক ছিল। এঁরা আন্তর্জাতিকতায় আস্থাশীল ছিলেন। এর ফলে জার্মানীর সমাজতন্ত্রীরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দল দুটি বহু দ্বন্দ্বের পর গোথাতে মিলিত হয়ে একটি আপসমূলক কর্মসূচীর ভিত্তিতে 'Socialist Workingmen's Party of Germany' ('সোসালিস্ট ওয়ার্কিংমেনস্ পার্টি অফ্ জার্মানী') নামে একটি অভিন্ন সমাজবাদী দল গঠন করে। এই গোথা সম্মেলন মার্কস নির্দেশিত ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্ব ও শ্রেণীসংগ্রামের নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু তাঁদের কর্মসূচী মার্কসের রাষ্ট্রতত্ত্বকে গ্রহণ করেনি। এই নতুন দল পার্লামেন্টীয় পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখলে শক্তি নিয়োজিত করে এবং জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী পরিহার করে।

১৮৭০ এর দশকে জার্মানীতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বেশ শক্তিশালী ও গতিময় হয়ে উঠে। গণসমর্থনও এই সময় বেশ মাত্রায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর পেছনে কারণ হল— সমগ্র জার্মানীতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, শহরে শ্রমজীবীর সংখ্যাবৃদ্ধি এবং দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ। এই দলের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে আশঙ্কিত হয়ে বিসমার্ক এদের প্রভাব হ্রাসের জন্য দমননীতি অনুসরণ করেন এবং সমাজতন্ত্র বিরোধী কতকগুলি আইন প্রবর্তন করেন। তাছাড়া বিসমার্ক শ্রমিকদের অসন্তোষ দূর করার জন্য শ্রমিক কল্যাণমূলক কিছু কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করেন। এগুলি হল-অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, বার্ধক্য ও অক্ষমতার জন্য বীমা আইন প্রণয়ন। এভাবে রাষ্ট্রের উদ্যোগে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী গৃহীত হয়। কিন্তু তাতেও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রগতি রোধ করা গেল না। সোস্যাল ডেমোক্রেটদের অনুগামীদের সংখ্যা স্ফীত হয়ে উঠে।

১৮৯০ সালে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের সিংহাসনে আরোহণের পর উইলিয়াম ও বিসমার্কের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বিরোধী আইন-কানুনের পুনর্নবীকরণের প্রশ্নে মতপার্থক্য দেখা দিলে সমাজতান্ত্রিকগণ এই সুযোগের

সদ্ব্যবহার করে নতুনভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপ প্রকাশ্যে শুরু করেন। সমাজতন্ত্র বিরোধী আইন-কানুন নবীকরণ না হওয়ায় ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে সমাজতান্ত্রিকগণ কার্ল কট্স্কির (Karl Kautsky) নেতৃত্বে আন্দোলনকে জোরদার করে তোলে। এই তাত্ত্বিক নেতা ছিলেন এঙ্গেলস্ এর অনুগামী ও মার্কসীয় তত্ত্বের গোঁড়া প্রবক্তা। তাঁর তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই ১৮৯০ সালের পর 'Social Democratic Party-র কর্মসূচী গড়ে উঠে। এই কর্মসূচী মার্কসীয় তত্ত্বের মূল সূত্রগুলি গ্রহণ করেছিল। এই কর্মসূচী গোথা (Gotha) কর্মসূচী থেকে এ কারণে পৃথক যে, এটি ছিল বহুলাংশে মার্কসীয় দৃষ্টিভাবাপন্ন। এর ফলে জার্মান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে মার্কসীয় তত্ত্বের প্রভাব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে 'Social Democratic Party' একটি সুসংহত দল হিসেবে তাদের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীকে রূপ দেওয়ার কাজে অগ্রসর হয়। শীঘ্রই এই দল অন্যান্য দেশেও সমাজতান্ত্রিক দলগুলির আদর্শ হয়ে উঠে। দ্বিতীয় উইলিয়ামের রাজত্বের শেষদিকে জার্মান সংসদে এই দলের সদস্য সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯১৪ সালে জার্মানীর স্থানীয় প্রতিনিধিসভাগুলিতে এই দলের ১২০ জন সদস্য ছিল। ১৯১২ সালে ১১০ জন সদস্য নিয়ে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক দল জার্মান সংসদে বৃহত্তম দলের মর্যাদা লাভ করে। এই দলের সদস্য সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে পেতে ষাট লক্ষে গিয়ে দাঁড়ায়। সমাজতান্ত্রিক পত্র-পত্রিকা এবং স্বাধীন ট্রেড-ইউনিয়ন সংগঠন সারা জার্মানীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। বস্তুতঃ এই সময় Social Democratic দলের পরিষদ (Council) জার্মানীর 'ছায়া সরকার' (Shadow Government) এ পরিণত হয়েছিল এবং সমাজতন্ত্রী নেতা ব্যাবেল এই সময়ে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হন।

তবে জার্মান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে গোঁড়া মার্কসীয় তত্ত্বের প্রাধান্য দেখা গেলেও ঊনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের সূচনায় জার্মান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি বিরোধী মতবাদ গড়ে উঠতে থাকে যা সংশোধনবাদ (Revision) নামে পরিচিত। এই সংশোধনবাদের কেন্দ্র ছিল দক্ষিণ জার্মানী। সংশোধনবাদের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন এডওয়ার্ড বার্নস্টাইন। শুধু জার্মানীতেই নয়, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশেও মার্কসবাদের ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীগত বিরোধ এবং মতানৈক্য সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে প্রবল হয়। বার্নস্টাইন ধনতন্ত্রবাদের আসন্ন ধ্বংস সম্পর্কে মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণীকে সমালোচনা করেন। তিনি মার্কসের তত্ত্বকে সেকেলে এবং অপ্রাসঙ্গিক বলে অভিহিত করেছেন। নতুন যুগের প্রেক্ষাপটে তিনি মার্কসবাদের শোধন ও পুনর্বিবেচনা-র প্রয়োজন আছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্রের স্থলে কতকগুলি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রস্তাব দেন। সংখ্যার দিক থেকে সর্বহারারা যত বেশি হবে বলে মার্কস মনে করেছিলেন, তা কিন্তু বাস্তবে হয়নি। এর ফলে সর্বহারাদের প্রাধান্য তেমন করে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাছাড়া সর্বহারারা বিভিন্ন গোষ্ঠীতেও বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। বার্নস্টাইন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিকাশের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, কারণ তাঁর মতে, এই শ্রেণী সমাজে স্থিতিশীলতা আনতে পারবে। বার্নস্টাইন মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সমাজের সমন্বয়কারী হিসাবে দেখেছিলেন এবং Social Democrat এর সাফল্যের জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমর্থন লাভের উপর বেশি জোর দিয়েছিলেন। সর্বোপরি, বার্নস্টাইন মনে করতেন যে, গণতান্ত্রিক ও উদারনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সমাজতন্ত্রবাদ আসতে পারে। সশস্ত্র সংগ্রাম সমাজতন্ত্রবাদের প্রকৃত পথ হওয়া উচিত নয়। তিনি মনে করতেন পুঁজিবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির অবসান ঘটিয়ে পুঁজিপতিশ্রেণী অবশেষে নরম মনোভাব গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। এর কারণ তাদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান প্রতিক্রিয়া। দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র কর্তৃক শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন-কানুন প্রবর্তনের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। এই আইনগুলি শ্রমিক স্বার্থের অনুকূল ছিল। বার্নস্টাইন এই ভাবে মার্কস ও এঙ্গেলস্ নির্দেশিত বৈপ্লবিক পথ থেকে সরে এসেছিলেন। তিনি শ্রেণীহীন সমাজের কথা বলেননি; বরং ধীরে ধীরে সমাজ উন্নয়নের কথা বলেছেন। তাঁর মতে,

সশস্ত্র বিপ্লব আশু লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলেও স্থায়ী সাফল্য লাভ করতে পারে না। গণতান্ত্রিক উপায়ে, ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে তিনি সমাজতন্ত্রবাদের উত্তরণে আস্থাশীল ছিলেন। তাঁর সংশোধনবাদী মতবাদ আন্তর্জাতিক গুরুত্ব লাভ করেছিল। সব দেশের সমাজতান্ত্রিক দলগুলি এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। অনেক তরুণ ও সমাজতন্ত্রী লেখকের দ্বারা তাঁর মতবাদ সমর্থিত হয়েছিল। তবে মার্কসীয় সমালোচকদের দৃষ্টিতে এই সংশোধনবাদ ছিল সাম্রাজ্যবাদ বা পুঁজিবাদের বিকাশের একটি নতুন স্তরের ফলমাত্র। বস্তুতঃ দেখা গেছিল যে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিশালী দেশগুলিতেই সংশোধনবাদ শক্তিশালী হয়েছিল।

তবে জার্মানীতে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও এ কথা সত্যি যে জার্মানীতে 'Social Democratic Party' শ্রমিক শ্রেণীর সর্ববৃহৎ সংগঠনরূপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। শ্রমিক এবং সমবায় আন্দোলনের উপর প্রভাব লাভের মধ্যে দিয়ে এই দল শ্রমিক শ্রেণীর উন্নতি ঘটাতেও যথেষ্ট সফল হয়েছিল। আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রসারেও এই দল যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছিল। 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি এই দলের অসামান্য প্রচেষ্টায় সমগ্র জার্মানীতে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

২.১.২.১১ ঃ জাতীয়তাবাদ শব্দের সংজ্ঞা

জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা নির্ধারণের পূর্বে 'জাতি' (Nation) কথাটির সঙ্গে পরিচিতি প্রয়োজন। কারণ জাতি, জাতীয়তাবাদ এবং জাতিরাষ্ট্র-এই সব শব্দগুলি একে অপরের সঙ্গে গভীর সম্পর্কযুক্ত। সারা বিশ্বে রাজনৈতিক সচেতনার যুগে 'Nation' বা 'জাতি' শব্দের গুরুত্ব বৃদ্ধিলাভ করেছে। সাধারণভাবে জাতি বলতে একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডে বসবাসকারী ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠীকে বোঝায়। তবে জাতি শব্দটি এই অর্থে শুধুমাত্র ব্যবহার করলে জাতিত্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট থেকে যাবে। জাতি গঠনে বেশ কিছু উপাদান থাকে যা জাতিত্বের শর্তের ক্ষেত্রে অবশ্যই বিবেচ্য। ধর্ম, ভাষা, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রভৃতি বহু উপাদানই জাতি গঠনে সহায়তা করে। বাংলায় বহু অর্থে 'জাতি' কথাটি ব্যবহৃত হলেও 'জাতি' শব্দটিই 'Nation' এর পারিভাষিক অর্থরূপে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যেমন— জাতিসংঘ, (United Nation), ভারতীয় জাতি, জার্মান জাতি ইত্যাদি। রেনানের মতে, জাতি হল এক আত্মিক ও সাংস্কৃতিক সূত্রে আবদ্ধ জনসম্প্রদায়। রেনান জাতিত্বের দুটি শর্ত আরোপ করেছেন। তিনি রাষ্ট্রীয় জনগোষ্ঠীর সনাতন ঐতিহ্য ও তার পরম্পরা এবং প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীর তুলনায় বেশি শক্তিশালী হয়ে টিকে থাকবার জন্য ঐক্যের অদম্য ইচ্ছার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কতকগুলি মানসিক গুণ একটি জনগোষ্ঠীকে একক জাতিরূপে ঐক্যবদ্ধ থাকতে সক্ষম করে। এইসব গুণগুলি হল— সমমানসিকতা, সহমর্মিতা এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন।

রাজনৈতিকভাবে স্বীকৃত একটি জাতি হল জাতীয়তাবাদের ধারক। নির্দিষ্ট ভূখন্ডে বসবাসকারী কোন জনসমষ্টি যদি তাদের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক হয় এবং ভাষা, ধর্মের দিক থেকে অভিন্ন থাকে এবং নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও মূলগত ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে তবেই তাদের মধ্যে জাতীয় চেতনার সঞ্চার হয়। উক্ত জনসমষ্টির মনে যে জাতিগত চেতনা বর্তমান থাকে তার থেকেই জন্ম নেয় জাতীয়তাবাদ। তবে সর্বক্ষেত্রে পূর্বোক্ত সর্ববিধ শর্ত নাও থাকতে পারে। তবে কিছু কিছু বিষয়ে ঐক্যবোধ থাকা একান্ত আবশ্যক; তা না হলে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠতে পারে না। আধুনিক বিশ্বে জাতিত্বের নিরিখেই রাষ্ট্রের বৈধতা, শক্তি ঠিক করা হয়ে থাকে।

২.১.২.১২ ঃ জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনীয় উপাদান

এই জাতিত্বের (Nationhood) কয়েকটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ অখন্ড ভূখন্ড; ভাষাগত ঐক্য, সাহিত্যগত; প্রথাগত বৈশিষ্ট্য; সাধারণ সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান; রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা, প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি আস্থা; একই রাষ্ট্রের প্রতি জনসাধারণের আনুগত্য; সাধারণ মূল্যবোধ; জাতীয় স্বার্থের স্বপক্ষে কাজ, জাতীয় নীতির সাফল্য কামনা, বিদেশি শত্রুর প্রতি বৈরী মনোভাব ইত্যাদি।

এই উপাদানগুলির সবকটিরই যে থাকার প্রয়োজন আছে তা নয়। আংশিকভাবে থাকলেই জাতিত্বের শর্তগুলি পূরণ করা সম্ভব। বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, ভাষা, ধর্মের ও রাজ্যসীমানার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অনেক দেশের জনগণের মধ্যেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় জাতীয় চেতনা বা জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্রিটিশ শাসনাধীন পরাধীন ভারতের কথা তুলে ধরা যায়। ঔপনিবেশিক শাসনকালে ধর্মীয়, ভাষাগত বৈচিত্র্যের মধ্যে থেকেও ভারতের জনগণের মনে অখন্ড ভারত চেতনা বা জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠে। ভাষাগত, ধর্মগত, কৃষ্টিগত, প্রথাগত বিভিন্নতা ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারেনি। ইউরোপেও বিভিন্ন পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অনেক দেশেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্ভব ঘটেছিল।

২.১.২.১৩ ঃ জাতীয়তাবাদের উদ্ভব

জাতীয়তাবাদের প্রথম উন্মেষ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। তার পূর্বে ইউরোপীয় চিন্তাধারায় 'জাতি' (Nation) শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না। মধ্যযুগের জাতীয়তাবাদ ছিল 'সর্বজনীন' (Universal)। ঐতিহ্যবাদীরা (Traditionals) যেমন অ্যান্থনি স্মিথ এবং গটফ্রিড হারডার প্রমুখেরা জাতিত্বকে আবহকালীন ও সার্বজনীন বলে মনে করেন। কিন্তু এই ধারণা অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। প্রকৃত রাজনৈতিক গুরুত্বসহ জাতীয়তাবাদী ধারার উদ্ভব ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে ধরা যেতে পারে। ম্যাকিয়াভেলি বা জাঁ বোঁদা-র রচনায় 'জাতি' কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। তিরিশ বছরের যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ডাচ পন্ডিত হুগো গ্রোটিয়াসও জাতিরাষ্ট্রের কথা বলেননি। এমন কি এই যুদ্ধ শেষে যে 'ওয়েস্টফ্যালীয় চুক্তি' সম্পাদিত হয়েছিল তাতেও জাতিরাষ্ট্রের কোন আভাস পাওয়া যায় না। রেনেসাঁসের পর জাতীয়তাবাদের কিছুটা আভাস পাওয়া গেলেও নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের ধারণা এই জাতীয়তাবোধকে খর্ব করতে থাকে। ধর্মসংস্কার আন্দোলন (Reformation Movement) এর মুক্ত জাতীয়তাবাদী ধারণাগুলি 'Counter Reformation' এর সামাজিক দ্বন্দ্বের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

আধুনিকতাবাদীরা (Modernist) যেমন এন্টনি গিডেন্স (Anthony Giddens), এরিক হবস্‌বম্‌ (Eric Hobsbawm), বেনেদিক্ট অ্যান্ডারসন (Benedict Anderson) প্রমুখরা সকলেই সহমত পোষণ করেন যে, পাশ্চাত্যের ধণতন্ত্রবাদ, অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লব এবং ফরাসী বিপ্লব ইত্যাদি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলী জাতীয় চেতনার উন্মেষে ও জাতিরাষ্ট্রের গঠনে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল। কোথাও ধর্ম, কোথাও ভাষা, আবার কোথাও এক অখন্ড ভূখন্ডের অধিকার থেকে ঐক্যবোধ সাহিত্যগত, সংস্কৃতিগত ও ঐতিহাসিক স্মৃতির ঐতিহ্য এই জাতিরাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, ধর্মসংস্কার আন্দোলন থেকে শুরু করে জ্ঞানদীপ্তির (Enlightenment) যুগ পর্যন্ত, অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লবের পূর্ববর্তী ইউরোপে রাষ্ট্রীয় চেতনা ও জাতীয়তাবোধ সঞ্চারে ধর্মের ভূমিকাই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল। ঐ সময়কার বিভিন্ন ধর্মীয় আন্দোলনগুলি এ ক্ষেত্রে উল্লেখের দাবী রাখে। এগুলি হল বোহেমিয়ার হাসীয়

(Hussite) আন্দোলন, জার্মানীর লুথারীয় সংস্কার আন্দোলন, ইংল্যান্ডের হেনরীয় ধর্মসংস্কার আন্দোলন এবং ফ্রান্সের ক্যালভিনবাদের ধর্মীয় আন্দোলন। এইসব ধর্মীয় আন্দোলন আঠারো ঊনিশ শতকের জাতীয়তাভিত্তিক রাষ্ট্রকাঠামোর ভিত্তি প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছিল। আবার অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে জাতীয় চেতনার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় দেশগুলিতে ভাষা বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। সতেরো শতকের পূর্বেই ফরাসী রাজা চতুর্থ হেনরি লিয়ঁ-র তাঁর অভিজাতদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আপনারা ফরাসী বলেন, সুতরাং আপনারা আমার সঙ্গে থাকবেন। স্প্যানিশভাষীরা স্পেনে থাকবে, জার্মানরা জার্মানীতে।" অষ্টাদশ শতকে ফরাসী বিপ্লবের সময় প্যারিসের স্বীকৃত সাহিত্য ভাষাকেই ফরাসীদের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল, ফ্রান্সের বিভিন্ন উপভাষা তাদের কাছে 'সামন্ত সমাজের উচ্ছিষ্ট' বলে বর্জিত হয়েছিল।

মধ্যযুগের জাতীয়তাবাদ ছিল 'সর্বজনীন' ঐতিহ্যবাদীরা যেমন অ্যান্থনি স্মিথ এবং গটফ্রিড হারডার প্রমুখেরা জাতিত্বকে আবহকালীন ও সর্বজনীন বলে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক গুরুত্বসহ জাতীয়তাবাদী ধারার উদ্ভব ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে ধরা যেতে পারে।

প্রশ্ন

১। জাতীয়তাবাদের উদ্ভব কি ভাবে ঘটেছিল?

২.১.২.১৪ ঃ জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদ

জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে ভাষার গুরুত্বে র কথা বলতে ভোলেননি ইতালীর যুব নেতা ম্যাৎসিনি। তাঁর কাছে, "নেশন হলো সমভাষাভাষী নাগরিকদের জগৎ"।

কার্ল মার্কস এবং এঙ্গেলস্ প্রাথমিক পর্যায়ে সাধারণ অর্থে জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁরা শ্রেণীসংগ্রামের উপরই জোর দিয়েছিলেন। জাতিত্ব বা জাতিতত্ত্ব তাঁদের কাছে গুরুত্ব পায়নি। তবে একথাও সত্যি যে, তাঁরা এটা অবশ্যই উপলব্ধি করেছিলেন যে জাতীয় পরিবেশ ও ঐতিহ্য শ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠবার এবং শ্রেণী সংঘর্ষের এক অনস্বীকার্য অঙ্গ। মার্কস এবং এঙ্গেলস্ অনেক সময় 'জাতি' (Nation) ও 'সমাজ' (Society) এই শব্দদুটি 'সিভিল সোসাইটি' (Civil Society) অর্থে ব্যবহার করেছেন। মার্কসের মতে, ধণতন্ত্রবাদের স্বার্থসাধন নিয়ে শ্রেণীসংঘর্ষের সূচনা হয় সিভিল সোসাইটিতে। রাষ্ট্র সে ক্ষেত্রে প্রভাবশালী শ্রেণীটিরই রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে কাজ করে থাকে এবং তার পররাষ্ট্রনীতিও ঐ প্রভাবশালী শ্রেণীর স্বার্থের অনুকূলে পরিচালিত হয়। জাতীয় চরিত্র প্রসঙ্গ মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনায় অনেক সময়েই এসে গেলেও তাঁরা 'জাতীয়তাবাদ' অপেক্ষা সামাজিক শ্রেণীসম্পর্ক বিষয়েই অধিক আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের মতে, অনেক জাতিই ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে যায়। দ্রুত শিল্পায়নের পরিণতি হিসেবেই তা ঘটে থাকে। কিন্তু সব সভ্য দেশগুলিকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ঐক্যবদ্ধ ও একীভূত করা হল মার্কসীয় সর্বহারা আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য।

'শ্রমজীবি মানুষের কোন দেশ নেই, শ্রমজীবি মানুষের কোন জাতি নেই, তারা সমগ্র শ্রমজীবি শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত — এই তাদের মূল পরিচয়।' 'Workers of the world unite' এই ছিল তাঁদের শ্লোগান। গোড়ার দিকে মার্কসীয় চিন্তাবিদরা জাতীয়তাবাদের ধারণার বিরোধী ছিলেন। তাঁরা সর্বহারা একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।

তাঁরা উভয়েই একথাও মনে করতেন যে, বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্ন স্বার্থ থাকতে পারে, কিন্তু শ্রমজীবী শ্রেণীর সম্পূর্ণভাবে জাতীয়তাবোধ পরিহার করে চলা কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে 'The Communist Manifesto' এর বিখ্যাত উক্তিটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। 'শ্রমজীবী মানুষের কোন দেশ নেই, শ্রমজীবী মানুষের কোন জাতি নেই, তারা সমগ্র শ্রমজীবী শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত-এই তাদের মূল পরিচয়।' 'Workers of the world unite' এই ছিল তাঁদের স্লোগান। গোড়ার দিকের মার্কসীয় চিন্তাবিদরা জাতীয়তাবাদের ধারণার বিরোধী ছিলেন। তাঁরা সর্বহারা একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু মার্কসীয় চিন্তাবিদদের অনেকেই পরবর্তী সময়ে জাতিরাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন ঘটান, দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অধিকাংশ অষ্ট্রো মার্কসীয় চিন্তাবিদগণ ও লেখকগণ মনে করতেন যে সর্বহারাশ্রেণীর বিকাশের স্বার্থেই জাতি, জাতিত্বের ও জাতীয়তাবাদের একটা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। লেনিন সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী হলেও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি তাঁর সহানুভূতিশীল মনোভাব বজায় ছিল। তিনি রাশিয়ার জাতীয় সমস্যা এবং অক্টোবর বিপ্লবের মধ্যে এক দৃঢ় সংযোগ স্থাপনের ব্যাপারে বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। প্যোল্যান্ডের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে লেনিনের অভিমত ছিল যে পোল্যান্ডের স্বাধীনতার অধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে না নেওয়া হলে সমস্যার সমাধান হওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। লেনিনের মতে, সমাজতন্ত্রের লক্ষণ হল সব জাতি ও ব্যক্তিকে একই পরিবারের ঐক্যে আবদ্ধ করা। কিন্তু এটি বাস্তবায়িত করতে হলে প্রত্যেককে তার নিজস্ব মত ও পথ অনুযায়ী চলতে দিতে হবে। তাই লেনিন এশিয়ার মুক্তিকামী আন্দোলনকেও স্বাগত জানিয়েছিলেন।

প্রশ্ন

১। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদ কি ছিল?

২.১.২.১৫ ঃ জাতীয়তাবাদী আদর্শের বৈশিষ্ট্য

ফরাসী বিপ্লবের বড় অবদান হল জাতীয়তাবাদের উন্মেষ। এই বিপ্লবের স্বাধীনতার বাণী জাতীয়তাবাদের মধ্যে পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিল। বিপ্লবের সময় থেকে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের উন্মেষ ও জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় ইউরোপের ইতিহাসের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। ইউরোপের জাতীয়তাবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রও প্রসারলাভ করেছিল। নেপোলিয়নের কার্যকলাপেও ভিয়েনা কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল নীতিসমূহ জাতীয়তাবাদ ও ইউরোপের দেশগুলির স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপন্থী ছিল স্পেন ও জার্মানীতে তাঁর প্রবর্তিত প্রশাসন অত্যন্ত ঘৃণার সঞ্চার করেছিল। তবে নেপোলিয়ন জার্মানীকে ৩৯টি রাষ্ট্রে ভাগ করার ফলে জার্মানীর জাতীয়তাবাদের পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। একইভাবে ইতালীতেও নানা সংস্কার কার্যের মাধ্যমে তিনি সেখানকার জাতীয়তাবাদের ভিত্তি প্রস্তুত করেছিলেন।

ভিয়েনা কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি ইতালি, জার্মানীতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে প্রসারিত করে। জার্মানী ও ইতালীতে জাতীয়তাবাদ অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। জার্মানী ও ইতালিতে শুল্কব্যবস্থার নতুন রূপায়ন এবং বোহেমিয়ায় বোহেমিয় শ্রমিকশ্রেণী ও জার্মান পুঁজিপতিশ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে পুষ্ট করেছিল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ঐক্যবদ্ধ জার্মান ও ইতালি রাষ্ট্রের উত্থান ঘটেছিল।

২.১.২.১৬ ঃ জাতীয়তাবাদের দোষ-ত্রুটি

জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ জনগণ যতক্ষণ পর্যন্ত স্বদেশ ও স্বজাতির হিতসাধনে নিয়োজিত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই জাতীয়তাবাদী আদর্শ দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে সক্ষম। তবে জাতীয়তাবাদ যখন সংকীর্ণ জাতিপ্রেমে পরিণত হয় তখন তার রূপ ভীষণ হয়ে উঠে। উগ্র জাতীয়তাবাদ বহুক্ষেত্রেই আক্রমণাত্মক রূপ ধারণ করে। তা পররাজ্য গ্রাস বা সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়। এটি জাতীয়তাবাদের বড় দোষ। এখানে জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক লালসা বড় হয়ে দেখা দেয়। এই দুই উদ্দেশ্য সফল করার অদম্য বাসনা থেকেই পররাজ্য গ্রাসনীতি বা উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রসারলাভ করে। ঊনিশ শতকের শেষে এবং কুড়ি শতকে হিটলারের সময়ে জার্মান জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ উগ্র জাতীয়তাবাদের এবং পররাজ্য গ্রাসনীতির মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এর পরিণতিও হয়েছিল ভয়ংকর। ফ্রান্স বরাবরই জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক স্বার্থে 'স্বাভাবিক সীমান্তের' প্রসারণের চেষ্টা করে গেছে।

'জাতীয়তাবাদ যখন সংকীর্ণ জাতিপ্রেমে পরিণত হয় তখন তা উগ্র জাতীয়তাবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ বলা হয়। আবার একটি সার্বভোম রাষ্ট্রে যদি আঞ্চলিক জাতিসত্তাগুলো বার বার আঘাতপ্রাপ্ত হতে থাকে তবে সেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সংকট দেখা দেয়।

জাতীয়তাবাদের আরো একটি বড় সমস্যা হল, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা জাতিসত্তাকে ব্যবহার করে গড়ে উঠলেও, আবার জাতিসত্তার লড়াই আন্তর্জাতিক সংকট ডেকে আনে। একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে যদি আঞ্চলিক জাতিসত্তাগুলো বার বার আঘাতপ্রাপ্ত হতে থাকে তবে সেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সংকট দেখা দেয়। এই সংকট বড় হয়ে দেখা দেওয়ার কারণ হল সেই রাষ্ট্রে এক রূপত্বের উপর অধিক জোর দেওয়া। এর ফলে সেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সমস্যা অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করে দেয় এবং আন্তর্জাতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে। এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হোল ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ঐক্যবদ্ধ জার্মানী ও ইতালি। জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হলেও উত্তর ও দক্ষিণ জার্মানীর জাতিসত্তা বিরোধের কিন্তু নিষ্পত্তি হয়নি। এর বড় কারণ জোর করে চাপিয়ে দেওয়া জার্মান একরূপত্বের ধারণা। ঠিক একইভাবে পাইডমন্টের নেতা কাভুরের নেতৃত্বে যেভাবে ইতালি একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিরাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল তা উত্তর ও দক্ষিণ ইতালির মধ্যে যে অর্থনৈতিক ব্যবধান ছিল তাকে টিকিয়ে রেখেছিল।

প্রশ্ন

১। জাতীয়তাবাদের ত্রুটিগুলি কি কি?

কারণ উত্তর ইতালিতে ছিল শিল্পে উন্নত ধনী অধিবাসীদের বসবাস, আর দক্ষিণ ইতালিতে ছিল কৃষিজীবী, স্বল্প উন্নত দরিদ্র অধিবাসীদের বসবাস। ইতালির রাষ্ট্রীয় ঐক্য ছিল আসলে শিল্পোন্নত উত্তর ইতালির হাতে অনুন্নত দক্ষিণ ইতালির রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ। এর ফলে জাতীয় ঐক্য বলতে প্রকৃত অর্থে যা বোঝায় তার অভাব ছিল।

তবে জাতীয়তাবাদ যদি সংকীর্ণ গন্ডি অতিক্রম করে বৃহত্তর হিতসাধনের জন্য আন্তর্জাতিকতাবাদে পরিণত হয় তবেই তার সার্থকতা। আন্তর্জাতিকতাবাদের গুরুত্ব জাতীয়তাবাদের চেয়েও অধিকতর। প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ হ্যারল্ড ল্যাস্কি (Harold Laski) মন্তব্য করেছেন, "হয় আমরা আন্তর্জাতিকভাবে চিন্তা করতে শিখব, না হলে ধ্বংস হয়ে যাব, এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।"

২.১.২.১৭ ঃ সহায়ক গ্রন্থ

(১) E.J. Hobsbawm– Nations and Nationalism Since 1870

(২) E.J. Hobsbawm – The Age of Empire

(৩) Hugh Seton – Watson–Nationalism and Communism

(৪) William L. Langer– The Diplomacy of Imperialism

(৫) Anthony Giddens–Nation State and Violence

(৬) অলক কুমার ঘোষ – আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব (১৮৭০–২০০৪)

(৭) নীহারেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় – আধুনিক ইউরোপ সমীক্ষা

(৮) প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় – আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস

(৯) David Thomson– Europe Since Napolean
(বঙ্গানুবাদ – দীপক মুখোপাধ্যায়)

২.১.২.১৮ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্ন

(১) ইউরোপে উদারতন্ত্রবাদের উদ্ভব, বৈশিষ্ট্য ও প্রসার আলোচনা কর।

(২) উদারতন্ত্রবাদের সঙ্গে গণতন্ত্রের সংযোগের ভাল-মন্দ বিচার কর। উদারতন্ত্রবাদের সীমাবদ্ধতা কি?

(৩) 'সমাজতন্ত্রবাদ' বলতে কি বোঝ? এর উদ্ভব আলোচনা কর।

(৪) সমাজতন্ত্রবাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি কি?

(৫) আদি সমাজতন্ত্রী কারা? তাদের সমাজতন্ত্র সম্পর্কে মতাদর্শ ব্যাখ্যা কর।

(৬) কার্ল মার্কসের সমাজতান্ত্রিক মতবাদ এবং এর প্রভাব আলোচনা কর।

(৭) ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা ও প্রসার আলোচনা কর।

(৮) জার্মানীতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ আলোচনা কর।

(৯) জাতীয়তাবাদ কথাটির অর্থ কি? জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনীয় উপাদান ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

(১০) জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট আলোচনা কর।

(১১) জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মার্কসীয় মতাদর্শ আলোচনা কর।

(১২) জাতীয়তাবাদের অবদান ও সীমাবদ্ধতা কি কি?

———————

পর্যায় গ্রন্থ - ২

একক - ১

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী শান্তি সম্মেলন

বিন্যাস ক্রম ঃ

২.২.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

২.২.১.১ ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উদ্ভব

২.২.১.২ ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি

২.২.১.৩ ঃ শান্তি চুক্তি এবং এর সুদূর প্রসারী ফলাফল

২.২.১.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

২.২.১.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

২.২.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট

(২) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি

(৩) প্যারিসের শান্তি সম্মেলন

(৪) ভার্সাই শান্তিচুক্তির শর্তাবলী ও জার্মানীর প্রতিক্রিয়া

(৫) ভার্সাই শান্তিচুক্তির সুদূর প্রসারী ফলাফল

(৬) ঐতিহাসিক তর্ক- বিতর্ক

২.২.১.১ ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উদ্ভব

১৯১৪ খ্রীঃ ২৮শে জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয় এবং ১৯১৮ খ্রীঃ ১১ই নভেম্বর জার্মানী যুদ্ধ বিরতি করা পর্যন্ত যুদ্ধের ধারা অব্যাহত ছিল। ভৌগোলিক ব্যাপ্তির দিক থেকে এই যুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিধা লাভ করেছে। এত ব্যাপক, ভয়াবহ ও সর্বাত্মক যুদ্ধ আগে হয় নি। পরিণতির দিক থেকেও এই যুদ্ধের সর্বব্যাপী চরিত্র পরিস্ফুট হয়েছিল।

১৯১৪ খ্রীঃ ২৮শে জুলাই আনুষ্ঠানিক ভাবে যে যুদ্ধের সূচনা হয়, ভৌগোলিক ব্যাপ্তির দিক থেকে তাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বলা হয়।

প্রশ্ন

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তি কত সালে হয়েছিল?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপট বুঝতে হলে প্রয়োজন বিগত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে সারা ইউরোপ জুড়ে যে প্রবল সংঘাত ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, তার উৎস অনুসন্ধান ও স্বরূপ বিশ্লেষণ। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও কূটনীতির নিয়ন্ত্রক ও নিয়ামক ছিল ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি। বলা যেতে পারে, ইউরোপের সংকটজনক ঘটনাগুলি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল।

১৮৭১ খ্রীঃ এর পর থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ইউরোপে যে সংঘাত ও উত্তেজনা ছিল, তাকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা যেতে পারে, যেমন ইউরোপে জাতীয়তাবাদের প্রসার ও আন্তর্জাতিক স্তরে সাম্রাজ্যবাদের বিকাশ। ইউরোপে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও পরিণতি বা পরিপূর্ণতা ঘটেছিল ১৮১৫ খ্রীঃ থেকে ১৮৭১ খ্রীঃ-এর মধ্যে। ১৮৭১ খ্রীঃ ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল ইটালী ও জার্মানী। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত জাতীয়তাবাদ সফল হয়নি। জাতীয়তাবাদ তখনও ছিল একটি আদর্শ ও অনুপ্রেরণা, যা ইউরোপের বহু মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। জাতীয়তাবাদের চরম বিকাশ ইউরোপের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ করেছিল। দেশভেদে ও অঞ্চলভেদে জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন এবং সংঘাত ও উত্তেজনার বীজ এখানেই নিহিত ছিল। ইউরোপে এই সময় কিছু দেশ ছিল যারা তাদের জাতীয়তাবাদের পরিপূর্ণতায় পরিতৃপ্ত ছিল এবং তারা স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে উদগ্রীব ছিল। ইংল্যান্ড ও বিসমার্কের জার্মানী ছিল এই দলভুক্ত। জাতীয় রাষ্ট্ররূপে ইংল্যান্ডের আবির্ভাব ঘটেছিল অনেক আগে এবং ইউরোপীয় ভূখন্ডে কোন অংশের প্রতি তার দাবী ছিল না। ঐক্যবদ্ধ করার পর বিসমার্ক জার্মানীকে একটি 'তৃপ্ত দেশ' বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ ছিল, যারা ছিল ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট। তাদের জাতীয়তাবাদ ছিল অপূর্ণ। তবে দেশভেদে এই অতৃপ্তির প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। ইউরোপের কোন অংশের প্রতি ফ্রান্সের লোভ ছিল না কিন্তু প্রাশিয়ার কাছে আলসেস্-লোরেন হারানোর ব্যথা সে ভুলতে পারে নি। এই দুই অঞ্চল পুনরাধিকার করতে সে বদ্ধপরিকর ছিল। তার এই মনোভাব ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে তীব্র বিরোধ ও তিক্ততার সৃষ্টি করেছিল। আবার ১৮৭১ খ্রীঃ ইটালী একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করলেও সম্পূর্ণভাবে সে খুশী বা তৃপ্ত হয়নি। তার মনে হয়েছিল আড্রিয়াটিক সাগর তীরবর্ত্তী অঞ্চল ন্যায্যত তার প্রাপ্য। অপর একটি অতৃপ্ত রাজ্য ছিল সার্বিয়া। তার লক্ষ্য ছিল বোসনিয়া ও হার্জিগোবিনা। ১৮৭৮ খ্রীঃ বার্লিন চুক্তিতে ঐ দুই অঞ্চলের উপর অষ্ট্রিয়া শাসনের অধিকার পেলেও কার্যতঃ অঞ্চল দুটি অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত হয়। অন্যদিকে আড্রিয়াটিক সাগর দিয়ে সার্বিয়ার বর্হিগমনের পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে সার্বিয়ার বিরোধ ও সংঘাত ছিল অনিবার্য। বুলগেরিয়া, রুমানিয়া ও গ্রীস ছিল অসন্তুষ্ট ও অতৃপ্ত। ১৮৭৮ খ্রীঃ বুলগেরিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। বুলগার জাতীয়তাবাদীরা পূর্ব রুমেলিয়ার বিচ্ছিন্নতা অন্তর থেকে মেনে নেয় নি। সিলিষ্ট্রিয়া (Silistria) না পাওয়ায় রুমানিয়া ক্ষুব্ধ ছিল। রুমানিয়ার ক্ষোভের অপর কারণ হল রাশিয়া কর্তৃক বেসারাবিয়া অধিকার। ম্যাসিডোনিয়াকে কেন্দ্র করে বুলগেরিয়া, সার্বিয়া ও গ্রীসের মধ্যে বিরোধ ছিল। বুলগেরিয়া ম্যসিডোনিয়ার স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে ছিল। তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল স্বায়ত্তশাসনের সূত্র ধরে ম্যাসিডোনিয়া গ্রাস। অন্যদিকে গ্রীস ও সার্বিয়া উভয়েই ম্যাসিডোনিয়ার স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী ছিল। তারা ম্যাসিডোনিয়ার ব্যবচ্ছেদ চেয়েছিল। গ্রীসের ক্ষুব্ধ হওয়ার আরও একটি কারণ ছিল। ১৮৮১ খ্রীঃ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তুরস্ক গ্রীসকে থেসালী ও এরিরাসের একটি অংশ দিয়েছিল। কিন্তু ১৮৯৬ খ্রীঃ গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধে গ্রীস পরাজিত হয় এবং গ্রীসের অর্ন্তভুক্ত থেসালী অংশটি সে তুরস্ককে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। থেসালী পুনরধিকার ও ক্রীট পাওয়ার জন্য গ্রীস

ইউরোপে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও পরিণতি বা পরিপূর্ণতা ঘটেছিল ১৮১৫ খ্রীঃ থেকে ১৮১৭ খ্রীঃ এর মধ্যে। ১৮৭১ খ্রীঃ ঐক্যবদ্ধ রাষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল ইতালী ও জার্মানী। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত জাতীয়তাবাদ সফল হয়নি।

ব্যাকুল ছিল। বলকান অঞ্চলে অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদ বা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ ও স্বার্থের সংঘাত এবং সেই সঙ্গে অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই অঞ্চলে এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। উনিশ শতকের শেষার্দ্ধে অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অধীন তিনটি জাতি -- পোল, চেক ও সার্বোক্রোট -- সম্পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতার জন্য উদগ্রীব ছিল। ইটালীর জনগন যেমন পিডমন্টকে কেন্দ্র করে তাদের জাতীয় ঐক্যের জন্য সংগ্রাম করেছিল, সার্বরাও তেমনই সার্বিয়াকে কেন্দ্র করে সার্বিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে চেয়েছিল। একইভাবে বহুরাষ্ট্রিক রাজ্য রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতি, যেমন লিথুয়ানিয়ান, ইউক্রেনিয়ান, রুথেনিয়ান প্রভৃতি জাতীয় সংগ্রাম ও ঐক্যের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

প্রশ্ন

১। বার্লিন চুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়?

২। ১৯ শতকের শেষার্ধে ইউরোপীয় রাজনীতির প্রকৃতি বর্ণনা কর।

অতৃপ্ত জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে এক ধরনের উগ্র জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছিল। উগ্র জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রগুলি ছিল সম্প্রসারণশীল। এক অর্থে তারাও ছিল অতৃপ্ত কিন্তু তাদের অতৃপ্ততার প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। তাদের জাতীয়তাবাদ ছিল অসহিষ্ণু। তারা নিজেদের প্রাপ্যটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল না। তারা অন্যদের উপর আধিপত্য স্থাপন করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে উৎসুক ছিল। অন্যদের তারা ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতো। জার্মানী ছিল এই ধরনের উগ্র ও অসহিষ্ণু জাতীয়তাবাদের বড় উদাহরণ। জার্মান লেখক ও দার্শনিকগণ তাদের রচনার মাধ্যমে জার্মান জাতীয়তাবাদের জয়গান ঘোষণা করেন এবং টিউটনিক জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে সচেষ্ট হন। নিকট প্রাচ্য ও মধ্য প্রাচ্যে জার্মানী তার প্রাধান্য স্থাপনে উদ্যোগী হয়। তুরস্ক সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা সম্পর্কে ইংরেজরা যখন নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল, তখন জার্মানী তার রক্ষক হিসেবে অবতীর্ণ হলো। দ্বিতীয় উইলিয়াম ইসলামের সামরিক শক্তিকে ব্যবহার করে প্রাচ্যে জার্মান কর্তৃত্ব স্থাপন করার পরিকল্পনা করেন। শুধুমাত্র মধ্যপ্রাচ্য বা নিকট প্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ায় নয়, জার্মানী এই সময় পৃথিবীর সর্বত্র নিজের শক্তি বিস্তারে উদগ্রীব ছিল। জার্মানী ছাড়া অপর একটি সম্প্রসারণশীল দেশ ছিল রাশিয়া। রাশিয়ার মূল লক্ষ্য ছিল ১৮৭৮ খ্রীঃ বার্লিন সমাবেশে গৃহীত শর্তগুলি অস্বীকার করা। তাছাড়া দূর প্রাচ্যে মাঞ্চু রিয়ার দিকেও রাশিয়ার নজর ছিল। তবে দূর প্রাচ্যে রাশিয়ার এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাধা পেয়েছিল জাপানের উত্থানের ফলে।

সামরিকবাদ বলতে এমন এক ভয়ংকর ও মারাত্মক নীতি বা ব্যবস্থা যা রাষ্ট্র নায়ক ও প্রশাসকদের উপরও আধিপত্য বিস্তার করতে এবং সম্পূর্ণভাবে নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপনে সক্ষম।

উগ্র ও অসহিষ্ণু জাতীয়তাবাদ থেকে জন্ম নিয়েছিল সামরিকবাদ-এর। সামরিকবাদ বলতে বোঝায় এমন এক ভয়ংকর ও মারাত্মক নীতি বা ব্যবস্থা, যার প্রধান লক্ষ্য হলো এক বিশাল ও শক্তিশালী উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী গোষ্ঠী, যারা বিশেষভাবে কোন এক গভীর রাজনৈতিক সংকটের সময়, রাষ্ট্রনায়ক ও প্রশাসকদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে এবং সম্পূর্ণভাবে নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপনে সক্ষম। বাহুবলের মাধ্যমে পৃথিবীকে দমন করার স্পর্ধা ও ঔদ্ধত্য প্রতিফলিত হয়েছে এই মতাদর্শের মধ্যে। আপাতদৃষ্টিতে এর মধ্যে একটা আত্মরক্ষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। অস্ত্রসজ্জার মূল উদ্দেশ্য যেন শান্তি রক্ষা, সামরিক খাতে অর্থবরাদ্ধ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিরাপত্তার যুক্তি দেখানো হত। ১৮৭১ খ্রীঃ ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধের পরই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, বিশেষভাবে জার্মানী, এইভাবে সামরিকবাদ নীতি হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু এই নীতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিপন্থী এক অশুভ অস্ত্র

প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই প্রবণতার তীব্রতা বৃদ্ধি পায় বিশেষভাবে ১৯১২-১৩ খ্রীঃ এর পর, যখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ক্রমশঃ জটিল হয়ে ওঠে। সামরিকবাদ নীতি অনুসরণ করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্তন করে। এ বিষয়ে উদ্যোগী ভূমিকা ছিল জার্মানী, ফ্রান্স এবং রাশিয়ার। সামরিক শক্তি বিস্তারে এই রেষারেষি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক উত্তেজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এই সময়ে আন্তর্জাতিক স্তরে এমন কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ছিল না, যা এই অস্ত্র প্রতিযোগিতা প্রতিহত করতে বা নিরস্ত্রীকরণ কার্যকরী করতে সক্ষম।

প্রশ্ন

১। কিভাবে সামারিকবাদের উদ্ভব ঘটেছিল?

উগ্র ও অসহিষ্ণু জাতীয়তাবাদের প্রসার এবং সামরিকবাদের উদ্ভবের ফলে ইউরোপের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্র নিরাপত্তার অভাব বোধ করে এবং এই অবস্থায় জোট বাঁধার কূটনীতির সূত্রপাত হয়। এই বিষয়ে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন জার্মানীর চ্যান্সেলার বিসমার্ক। যুদ্ধের জন্য নয়, বরং ইউরোপে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্যই অষ্ট্রিয়া ও ইটালীকে নিয়ে ত্রিশক্তি মৈত্রী গড়ে তুলেছিলেন।

কিন্তু তাঁর অনুসৃত কূটনীতির জটিলতা এবং গোপন শর্তের অস্তিত্ব ইউরোপ জুড়ে এক সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। এই পরিস্থিতিতে গড়ে ওঠে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে ত্রিশক্তি আঁতাত, এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ইউরোপ দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তিজোটে বিভক্ত হয়ে যায়। বলা যেতে পারে, উভয় জোটের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও পারস্পরিক সন্দেহ ইউরোপে দীর্ঘস্থায়ী শান্তির পরিপন্থী ছিল। মনে হতে পারে, এই পরস্পর বিরোধী রাষ্ট্রজোট শান্তিরক্ষার সহায়ক ছিল, কারণ অনাবশ্যক যুদ্ধে জড়িত হওয়ার ভয়ে জোটভুক্ত একটি দেশ তার মিত্র বা চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ অপর দেশকে প্রতিপক্ষ জোটের কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ না হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করত। কিন্তু বিপরীত আশঙ্কাও ছিল। অর্থাৎ কোনভাবে একবার যুদ্ধ শুরু হলে, ইউরোপের প্রতিটি প্রধান রাষ্ট্রই অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হত। কোন রাজ্যের স্বার্থ সেই যুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না হলেও বন্ধু রাষ্ট্রের সাহায্যার্থে অনিচ্ছুক হলেও তাকে সেই যুদ্ধে অংশ নিতে হত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন এইভাবেই সেই যুদ্ধ দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯১৪ খ্রীঃ ২৮শে জুলাই অষ্ট্রিয়া সার্বিয়া আক্রমণ করে। ১লা আগষ্ট জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, ৩রা আগষ্ট ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইংল্যাণ্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ৪ঠা আগষ্ট। অর্থাৎ ১৯১৪ খ্রীঃ জুলাই মাসে যখন বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, তখন তা শুধুমাত্র অষ্ট্রিয়া, সার্বিয়া ও বলকান অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের সংকীর্ণ লক্ষ্যে আবদ্ধ ছিল না, এর সঙ্গে উভয় রাষ্ট্রজোটের সম্মান, সংহতি ও অস্তিত্বের প্রশ্নও জড়িত ছিল।

সামরিকবাদের উদ্ভবের ফলে সমগ্র ইউরোপ দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তি শিবিরে আত্মপ্রকাশ করে, যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিণতিকে অনিবার্য করে তুলেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য পরস্পর বিরোধী দুই রাষ্ট্রজোটের অস্তিত্ব কতখানি দায়ী ছিল, তা নিয়ে ঐতিহাসিকরা একমত নন। Fay-র মতে, পরস্পরবিরোধী দুই জোটের অস্তিত্ব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এ.জে.পি. টেলার (A.J.P. Taylor) বলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয়, তখন কোন পক্ষই চুক্তির শর্তগুলি পালন করে নি। জেমস্ জোল (James Joll) ফে-র বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর যুক্তি হলো ১৯১৪ খ্রীঃ আগে পর্যন্ত মৈত্রী ব্যবস্থার তখনই একটি কার্যকরী ভূমিকা ছিল, যখন মৈত্রীবদ্ধ দুটি দেশের রাজনৈতিক স্বার্থ এক ছিল;

কিন্তু যখন তা ছিল না, তখন তা দুটি দেশের নীতিকে প্রভাবিত করতে পারে নি। উদাহরণস্বরূপ, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রীচুক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে। ইউরোপীয় ভূখন্ডে ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে যতক্ষণ জার্মানীর বৈরী সম্পর্ক ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে মৈত্রী সম্পর্কের একটা বাস্তব ভিত্তি ছিল, কিন্তু ইউরোপের বাইরে আফ্রিকায় যখন ফ্রান্স ফ্যাসোডা সংকটে জড়িয়ে পড়েছিল তখন রাশিয়া সে ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখায় নি। একইভাবে দূর প্রাচ্যে সংকটের সময় ফ্রান্সও রাশিয়ার পাশে এসে দাঁড়ায় নি। ইংল্যান্ড ও রাশিয়ার সম্পর্ক কখনই খুব ঘনিষ্ঠ ছিল না। অন্যদিকে একই জোটের শরিক হলেও চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ যদি একই কেন্দ্রভূমিতে মিলিত না হত, তাহলে যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হত না। ইটালীর সঙ্গে জার্মানী ও অষ্ট্রিয়া ত্রিশক্তি মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হলেও সে ফ্রান্সের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতি করতে সচেষ্ট হয়েছিল। রাশিয়ার জারের সঙ্গেও সে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিল। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করতে পরস্পরবিরোধী চুক্তিগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলেছেন ডেভিড টমসন (David Thomson)। তাঁর মতে, একদিকে পূর্ব ইউরোপে বলকান সমস্যা ও অন্যদিকে পশ্চিম ইউরোপের রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব এক অসুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল এবং জোটের কূটনীতি তাতে ইন্ধন জুগিয়েছিল। তিনি আরও বলেছেন যে, ১৯১২ খ্রীঃ থেকে ১৯১৪ খ্রীঃ মধ্যে পরস্পরবিরোধী দুই রাষ্ট্রজোট পরস্পরবিরোধী দুটি সশস্ত্র শিবিরে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং তারা যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

মার্কসবাদীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী সংঘাত ও প্রতিযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। লেনিনের সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব তত্ত্বের উপর নির্ভর করে তাঁরা দেখাতে চেয়েছেন যে, শিল্প বিপ্লবের চরম বিকাশের ফলে উনিশ শতকের শেষ পর্বে ও বিংশ শতকের গোড়ায় ইউরোপের পুঁজিবাদী রাজ্যগুলি একদিকে যেমন শিল্প উৎপাদনের জন্য কাঁচামালের অভাব বোধ করেছিল, অন্যদিকে তেমনই উদ্বৃত্ত পণ্যের বিপননের জন্য বাজার অনুসন্ধান করছিল। এই উভয়বিধ সমস্যা সমাধানের জন্য তারা উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এশিয়া ও বিশেষভাবে আফ্রিকা মহাদেশের উপর নজর দেয়। উনিশ শতকের শেষ পর্বে ও বিংশ শতকের গোড়ায় উপনিবেশ স্থাপন নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। মিশর ও সুদানকে কেন্দ্র করে ইঙ্গ ফরাসী বিরোধ এবং কেপ থেকে কায়রো পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ পরিকল্পনার সূত্র ধরে ইঙ্গ ফরাসী মন কষাকষি ছিল, তেমনই দক্ষিণ আফ্রিকায় ইঙ্গ-জার্মান দ্বন্দ্ব, টিউনিসিয়ায় ফ্রান্সের সঙ্গে ইটালীর দ্বন্দ্ব বা মরোক্কোয় ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। মার্কসবাদীরা উপনিবেশ নিয়ে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উৎস অনুসন্ধান করেছেন।

প্রশ্ন

১। বিসমার্ক কে ছিলেন?

২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কিভাবে গড়ে উঠেছিল?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা সমালোচনার উর্দ্ধে নয়। ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে প্রায়শই সংঘর্ষের সৃষ্টি করলেও ঔপনিবেশিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল সেরাজিভো হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে, যার সঙ্গে ঔপনিবেশিক সমস্যা জড়িত ছিল না। অর্থাৎ আফ্রিকা বা এশিয়ার কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে নয়, ইউরোপের সমস্যাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। এছাড়া ঔপনিবেশিক প্রশ্ন ও সমস্যাকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে যেসব বিরোধ দেখা দিয়েছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই সেগুলির নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। কঙ্গোকে

কেন্দ্র করে যে বিরোধে বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানী ও পর্তুগাল জড়িয়ে পড়েছিল, ১৮৮৪-৮৫ খ্রীঃ অনুষ্ঠিত বার্লিন সমাবেশে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তার একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হয়েছিল। ১৯০৮ খ্রীঃ কঙ্গোর উপর বেলজিয়ামের আধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৯৫ খ্রীঃ ভেনেজুয়েলাকে কেন্দ্র করে ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে মিটে গিয়েছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংল্যান্ড ও জার্মানীর মধ্যে বুয়ার যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিরোধ, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ফ্যাসোডার ঘটনা, ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে মরক্কোকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ ইত্যাদি ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব তীব্র তিক্ততা ও উত্তেজনার সৃষ্টি করলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই তা মিটে গিয়েছিল। ডেভিড টমসনের সুচিন্তিত মন্তব্য হল -- 'Diplomatically, colonial collisions were always disturbing, but they were certainly not decisive in making the situation that precipitated war between the rival alliances in 1914. There is strong evidence that all the most important colonial disputes had been settled before 1914'.

তবে ইউরোপে রাষ্ট্রজোট গঠনের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৯০৪ খ্রীঃ ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে আঁতাত ও ১৯০৭ খ্রীঃ ইংল্যান্ড ও রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রী স্থাপন তখনই সম্ভব হয়েছিল, যখন তাদের মধ্যে ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব ও বিরোধের নিষ্পত্তি হয়েছিল। আবার এও ঠিক যে, ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব মৈত্রী স্থাপনের পূর্ব শর্ত হলে সে ক্ষেত্রে রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে মৈত্রীর পরিবর্ত্তে ইংল্যান্ডের সঙ্গে জার্মানীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠত। আবার সাম্রাজ্যবাদকে মূলধন করে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে তিক্ততার সম্পর্ক কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে। ফ্রান্স যাতে আলসেস-লোরেন হারানোর ব্যথা কিছুটা ভুলতে পারে, তার জন্য বিসমার্ক ফ্রান্সকে উপনিবেশ স্থাপনে উৎসাহিত করেছিলেন। তাই ইউরোপের কূটনৈতিক পুনর্বিন্যাসে সাম্রাজ্যবাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে প্রায়শই সংঘাত সৃষ্টি করলেও ঔপনিবেশিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়নি।

১৯১৪ খ্রীঃ সেরাজিভো হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হলেও বিগত প্রায় দশ বছর ধরেই আর্ন্তজাতিক পরিস্থিতি জটিল ও উত্তেজক ছিল এবং একের পর এক সংকট শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছিল। উল্লেখ্য যে, পরস্পরবিরোধী দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ শুরু হলেও তৃতীয় পক্ষ বা গোষ্ঠী এই সব সংকটের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল এবং ইউরোপ ক্রমশঃ পরস্পরবিরোধী দুই শক্তি শিবিরে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। এইসব সংকটের উৎসভূমি ছিল বলকান অঞ্চল ও আফ্রিকা। বলকান সমস্যার সঙ্গে ইউরোপের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রই কোনো না কোনোভাবে জড়িত থাকলেও আফ্রিকা মহাদেশে ইউরোপের তিনটি প্রধান রাষ্ট্র-ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানী বিভিন্ন সংকটের সঙ্গে জড়িত ছিল। সেরাজিভো হত্যাকান্ডের আগে যে সব সংকট দেখা দিয়েছিল তার প্রত্যেকটি শেষ পর্যন্ত মিটে গিয়েছিল কিন্তু সেই সব সংকট কাটাতে গিয়ে ইউরোপের কোন না কোন বৃহৎ দেশের মর্যাদায় আঘাত পড়েছিল।

১৯০৫-০৬ খ্রীঃ ফ্রান্স ও জার্মানীর মধ্যে মরক্কোকে কেন্দ্র করে বিরোধের মধ্যে দিয়ে সংকটের সূচনা হয়। ১৯০৬ খ্রীঃ আলজেসিকার্সে আয়োজিত এক সমাবেশে ইংল্যান্ড ফ্রান্সকে সমর্থন করায় কাইজার দ্বিতীয় ইউলিয়াম মরক্কোর উপর ফ্রান্সের আধিপত্য মেনে নিতে বাধ্য হন। ১৯১১ খ্রীঃ মরক্কো সংকট আবার জটিলাকার ধারণ করে। ঐ বছর জার্মানী মরক্কোর আগাদির বন্দরে প্যান্থার নামে এক রণতরী প্রেরণ করে, যার আপাত উদ্দেশ্য ছিল মরক্কোর অভ্যন্তরীণ গন্ডগোলের হাত থেকে জার্মানবাসীকে রক্ষা করা; কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল মরক্কোয় ফ্রান্সের অধিকার স্বীকৃতির বিনিময়ে তার কাছ থেকে আফ্রিকার অন্য কোন অঞ্চল অধিকার করা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে

যুদ্ধ পরিস্থিতির উদ্ভব হলেও ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সহযোগিতার ফলে জার্মানী পিছু হঠতে বাধ্য হয়। মরক্কোকে কেন্দ্র করে পরপর দুবার যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলেও, তা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। তবে উভয় ক্ষেত্রেই জার্মানীর পরাজয় হয়েছিল এবং ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রশ্ন

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ কি ছিল?

২। বিসমার্ক ফ্রান্সকে উপনিবেশ স্থাপনে উৎসাহিত করেছিলেন কেন?

১৯০৮ খ্রীঃ তরুন তুর্কীরা তুরস্কে ক্ষমতা দখল করার পর বলকান অঞ্চলে সংকট সূচিত হয়। তারা তুরস্ক সাম্রাজ্যের গৌরব ও ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হলে অষ্ট্রিয়া, বোসনিয়া ও হার্জিগোবিনা অধিকার করে নেয়। অষ্ট্রিয়ার এই আগ্রাসী নীতি বার্লিন সমাবেশে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরোধী হলেও রাশিয়া প্রথম তার বিরোধিতা করেনি, কারণ সে আশা করেছিল যে, এর বিনিময়ে অষ্ট্রিয়া দার্দানেলিস্ ও বসফোরাস প্রণালী দিয়ে রুশ রণতরী চলাচলের অধিকার সমর্থন করবে। কিন্তু বাস্তবে তা না ঘটায় রাশিয়া অসন্তুষ্ট হয় এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি আন্তর্জাতিক সমাবেশ আহ্বান করার জন্য তৎপর হয়। কিন্তু জার্মানী অষ্ট্রিয়াকে সমর্থন করায় রাশিয়া পিছু হঠতে বাধ্য হয়। এর ফলে রাশিয়ার মর্যাদা হ্রাস পায়, উল্লেখ্য যে, ১৯০৮-০৯ সালে বোসনিয়া সংকটে একথা স্পষ্ট হয় যে, বলকান অঞ্চলে রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে যে কোন সময় বিরোধ এক আন্তর্জাতিক সংকটের সূত্রপাত করতে পারে। এছাড়া অষ্ট্রিয়ার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, দক্ষিণ-পূর্ব-ইউরোপে যে কোন সংকটে সে জার্মানীর সাহায্য লাভ করবে। কিন্তু এই ঘটনার একটি বিপজ্জনক দিক ছিল। স্লাভ সম্প্রদায়ের মানুষ অষ্ট্রিয়ার মত একটি বহুরাষ্ট্রিক সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব মেনে নিতে অনিচ্ছুক ছিল। ফলে বোসনিয়ার অভ্যন্তরে বসবাসকারী তরুণ ও উগ্র বৈপ্লবিক মতাদর্শে বিশ্বাসী স্লাভরা-'ইয়ং বোসনিয়া' আন্দোলন গড়ে তুললে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শুরু হয়। তাদের এই কার্যকলাপে সার্বিয়ার মদত ছিল। বলা যেতে পারে, যেভাবে অষ্ট্রিয়া বোসনিয়া ও হার্জিগোবিনা দখল করে নেয়, তা সার্বিয়ার মনঃপূত ছিল না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানীর উগ্রজাতীয়তাবাদের ফলে মরোক্কোকে কেন্দ্র করে পর পর দুবার যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলেও তা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল।

সেরাজিভো হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী যুবরাজ ফার্ডিন্যান্ড ও তাঁর স্ত্রী যখন বোসনিয়ার রাজধানী সেরাজিভো ভ্রমণ করছিলেন, তখন প্রিন্সিপ নামক জনৈক বোসনিয়ান সার্ব তাদের হত্যা করেন। এই হত্যাকান্ডের জন্য অষ্ট্রিয়া সার্বিয়াকে দায়ী করে এবং সার্বিয়াকে এক চরমপত্র পাঠায়, যার উত্তরের মেয়াদ ছিল মাত্র ৪৮ ঘন্টা, সার্বিয়া এই চরমপত্রের অধিকাংশ শর্ত স্বীকার করে। কিন্তু তাতেও অষ্ট্রিয়া সন্তুষ্ট না হওয়ায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।

প্রশ্ন

১। প্যান্থার কি?

২। বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্ভুদ্ধ স্লাভরা কোন আন্দোলন গড়ে তুলেছিল?

উল্লেখ্য যে, অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে সার্বিয়ার দ্বন্দ্ব ছিল অনিবার্য এবং অষ্ট্রিয়া সার্বিয়াকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল অষ্ট্রিয়া সার্বিয়াকে যে চরমপত্র দিয়েছিল, তাতে সার্বিয়ার স্বাধীনতা বিপন্ন হয়েছিল। অষ্ট্রিয়ার মত একটি বহুজাতিক ও

বহুভাষী রাষ্ট্রের পক্ষে সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়েছিল, জাতীয়তাবাদের দ্রুত প্রসার অষ্ট্রিয়ার অস্তিত্বের পক্ষে কাম্য ছিল না। বিগত শতকে ইটালী ও জার্মানীর ঐক্যের ফলে অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল। এই অবস্থায় সার্বিয়ার নেতৃত্বে সর্বসার্ববাদ অষ্ট্রিয়ার উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। তার আশঙ্কা হয়েছিল সার্ডিনিয়া-পিডমন্টের নেতৃত্বে যেমন ইটালীর এবং প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মানীর ঐক্য আন্দোলন সফল হয়েছিল, তেমনই একইভাবে সার্বিয়ার নেতৃত্বে সার্বদের ঐক্য সম্ভব হতে পারে। বলা যেতে পারে, অষ্ট্রিয়ার জেদেই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। প্রশ্ন করা যেতে পারে, এই যুদ্ধ অষ্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে কেন বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছিল। কারণ বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে একের পর এক সংকট যুদ্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেও তা বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়নি বা উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট না হলেও বিরোধ মিটে গিয়েছিল।

অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ ও তার স্ত্রী সেরিজোভা ভ্রমণকালে নিহত হন। এই হত্যাকান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে অষ্ট্রিয়া সার্বিয়াকে এক চরম পত্র দেয়। মূলতঃ অষ্ট্রিয়ার জেদের ফলেই যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল।

সেরাজিভো সংকটের সময়ও আশা করা গিয়েছিল যে, কোন আন্তর্জাতিক সমাবেশের মাধ্যমে সার্বিয়া-অষ্ট্রিয়ার বিরোধের নিষ্পত্তি হবে। কিন্তু বাস্তবে তা না হয়ে ইউরোপের সমস্ত বড় রাষ্ট্রই এই সংকটের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে অষ্ট্রিয়া জার্মানীর সাহায্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। ৫ই জুলাই জার্মানী অষ্ট্রিয়াকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। জার্মানীর নিকট থেকে সাহায্যের আশ্বাস পেয়ে অষ্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই অবস্থায় রাশিয়ার পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব ছিল না কারণ বলকান অঞ্চল, প্রণালী এলাকা ও কন্সট্যান্টিনোপোলের উপর অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীর আধিপত্য তার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। রাশিয়া ৩০শে জুলাই সৈন্য সমাবেশ শুরু করে। জার্মানী রাশিয়াকে সৈন্য সমাবেশ করতে নিষেধ করলেও রাশিয়া তাতে রাজী হয়নি। ফলে ১লা আগষ্ট জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। একইভাবে ফ্রান্স নিরপেক্ষ থাকতে না চাইলে ৩রা জানুয়ারী জার্মানী ফ্রান্সের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফ্রান্সকে আক্রমণের প্রস্তুতি হিসেবে জার্মানী বেলজিয়াম আক্রমণ করলে ইংল্যান্ডও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। বেলজিয়ামের উপর জার্মানীর আক্রমণ ছিল ১৮৩৯ খ্রীঃ স্বাক্ষরিত লন্ডন চুক্তির পরিপন্থী। ইউরোপের পাঁচটি প্রধান রাষ্ট্র বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, পশ্চিম ইউরোপে শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করা ছিল ব্রিটিস বিদেশনীতির প্রধান লক্ষ্য। তাই তার পক্ষে বেলজিয়ামের ওপর জার্মান আক্রমণ মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। এই অবস্থায় ৪ঠা আগষ্ট ইংল্যান্ড জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৬ই আগষ্ট অষ্ট্রিয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে এবং ১২ই আগষ্ট ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে বিশ্বযুদ্ধ পুরোদমে শুরু হয়।

প্রশ্ন

১। অষ্ট্রিয়ার যুবরাজের নাম কি?
২। লন্ডন চুক্তি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়েছিল?
৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া কেন যোগ দিয়েছিল?

২.২.১.২ ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি

বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে আন্তর্জাতিক নৈরাজ্য, অস্ত্র প্রতিযোগিতা, জোট বাঁধার নীতি ও গোপন কূটনৈতিক তৎপরতা ও ঊনিশ শতকের গোড়ায় ইউরোপের প্রধান রাষ্ট্রগুলির দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তি শিবিরে বিভক্ত হওয়ার ঘটনা আন্তর্জাতিক স্তরে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টিতে জার্মানীর দায়িত্বের প্রশ্নটি অবশ্যই স্পর্শকাতর,

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীকে এই যুদ্ধের জন্য দায়ী করা হলেও কয়েকজন ঐতিহাসিক যেমন - বার্নেস (E.H. Barnes), ফে (F.B. Fay) ও গুচ (G.P. Gooch) এর বিরোধিতা করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ডেভিড টমসন বলেছেন, 'The most important thing about the First World War is that it was the unsought, unintended and product of a long sequences of events which began in 1871". তিনি এর জন্য কোন ব্যক্তি বিশেষ বা জাতিকে দায়ী করেন নি। অষ্ট্রিয়া ও জার্মানী যুদ্ধের জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী হলেও একতরফাভাবে তাদের উপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব চাপানো সমীচীন নয়। ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইংল্যান্ড, আংশিকভাবে হলেও এর জন্য দায়ী ছিল। ইউরোপের প্রধান দেশগুলির মধ্যে স্বার্থের তীব্র সংঘাত ছিল। তাদের মধ্যে যেমন পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল, তেমনি ছিল ভীতি ও আতঙ্ক। নিজের উপর পুরো ভরসা বা আস্থা না থাকায় তারা জোটের রাজনীতিকে আশ্রয় করেছিল। সবক্ষেত্রে আগ্রাসী মনোভাব নয়, বরং আত্মরক্ষা ও অস্তিত্ব বজায় রাখাই তাদের কাছে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল অনেকাংশে আত্মরক্ষামূলক। এই যুদ্ধের সঙ্গে কোন নীতির প্রশ্ন বা মতাদর্শ জড়িয়ে ছিল না। সর্বজাতীয়তাবাদকে সমর্থন করেছিল রাশিয়ার মত একটি স্বৈরাচারী ও প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র। গণতন্ত্র রক্ষার জন্যও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়নি। গণতন্ত্র রক্ষা যুদ্ধের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলে ইংল্যান্ড ও রাশিয়ার পক্ষে এক শিবিরে অবস্থান করা সম্ভব হত না। বলা যেতে পারে, রাজনীতিবিদরা দায়িত্বহীনের মত আচরণ করেছিলেন। সমকালীন রাজনীতিবিদরা অভিজ্ঞ ও দক্ষ হলেও জটিল ও সংকটজনক পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ক্ষমতা ছিল না। এদের সম্পর্কে লয়েড জর্জের মন্তব্য হল -- 'they were all handy man in a well behaved sea, but helpless in a typhoon.' নিঃসন্দেহে এই যুদ্ধ ছিল একটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষের কাছে এই যুদ্ধ ছিল অভিশাপ।

গণতন্ত্র রক্ষার জন্যও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়নি। গণতন্ত্র রক্ষা যুদ্ধের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলে ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়ার পক্ষে এক শিবিরে অবস্থান করা সম্ভব হত না।

প্রশ্ন

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রকৃতি উল্লেখ কর।

২.২.১.৩ ঃ শান্তি চুক্তি এবং এর সুদূর প্রসারী ফলাফল

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে শান্তি সম্পাদনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হওয়ার আগেই এর ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছিল। যুদ্ধ চলাকালীন বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্ণধাররা মাঝে মাঝে যুদ্ধের লক্ষ্য ও নীতি সম্বন্ধে কয়েকটি সুস্পষ্ট ঘোষণা উপস্থাপিত করেন। যুদ্ধের শেষ পর্বে যখন মিত্র পক্ষের জয় সুনিশ্চিত তখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ ব্রিটেনের যুদ্ধ নীতি ঘোষণা করে জার্মানীকে যুদ্ধের জন্য দায়ী সাব্যস্ত করেন এবং জার্মানীকে এর জন্য শাস্তিদানের কথা ব্যক্ত করেন। এই প্রতিশোধমূলক ধারনার বিপরীত মেরুতে ছিল মার্কিন রাষ্ট্রপতি উইলসনের মানবতাবাদী বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী। ১৯১৮ খ্রীঃ ৮ই জানুয়ারী মার্কিন কংগ্রেসের নিকট প্রদত্ত এক ঘোষণায় তিনি বিখ্যাত চৌদ্দ দফা শর্ত ব্যাখ্য করে বলেন যে, যুদ্ধোত্তর বিশ্ব রাজনীতির ভাগ্য বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গের ইচ্ছানুসারে নির্দ্ধারিত হবে না। ন্যায় নীতি ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার

ন্যায়নীতি ও জনগণের আশা আকাঙ্খার উপরই নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, রাষ্ট্রপতি উইলসনের আদর্শবাদী ঘোষণায় জার্মান প্রতিনিধিরা ১৯১৮ খ্রীঃ ১১ই নভেম্বর যুদ্ধ বিরতি সম্পাদন করেন।

উপরই নূতন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠবে, রাষ্ট্রপতি উইলসনের আদর্শবাদী ঘোষণায় জার্মান প্রতিনিধিরা ১৯১৮ খ্রীঃ ১১ই নভেম্বর যুদ্ধবিরতি সম্পাদন করেন এবং যুদ্ধের সময় রাশিয়া, রুমানিয়া, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও তুরস্ক থেকে সৈন্যাপসারণ ও ব্রেস্ট লিটোভস্ক ও বুখারেস্ট সন্ধি দুটি প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত জানায়। জার্মানীর যুদ্ধবিরতি অনুমোদিত হওয়ায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটল। এরপর ১৯১৯ খ্রীঃ ১২ই জানুয়ারী ২৭টি দেশের প্রতিনিধিরা প্যারিস নগরে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের জন্য সমবেত হন। ১৯১৯ খ্রীঃ ২৮শে জুন জার্মান প্রতিনিধি ভার্সাই-এ ইচ্ছের বিরুদ্ধে একতরফা সন্ধিপত্র গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

প্রশ্ন

১। প্রাথমিক ভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য কাকে দায়ী করা হয়?

২। ভার্সাই শান্তিচুক্তি কোথায় হয়েছিল?

ভার্সাই সন্ধি ঃ

জার্মানীর সঙ্গে সম্পাদিত ভার্সাই সন্ধি বিশ্বের কূটনৈতিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভার্সাই সম্মেলন ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সমাবেশ। তবে এই সম্মেলন ছিল মূলতঃ বিজয়ী দেশগুলির সম্মেলন। জার্মানী প্রমুখ বিজিত দেশগুলির প্রতিনিধিদের এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। এদিক দিয়ে ভার্সাই সম্মেলন ছিল একপেশে, একতরফা সম্মেলন, আবার এই সম্মেলনে ছোট বড় বিভিন্ন মাপের দেশগুলির প্রতিনিধিরা যোগদান করলেও সম্মেলনের নীতি নির্দ্ধারণে ও কর্মকান্ড পরিচালনায় প্রধানত চারটি বৃহৎ শক্তি ও তাদের নেতারা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। চার নেতা হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড লয়েড জর্জ, ফরাসী প্রধানমন্ত্রী জর্জ ক্লিমেনশো ও ইটালীর প্রধানমন্ত্রী ভিটোরিও অর্লান্ডো। ক্লিমেনশো এই সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। বলা যেতে পারে, ভার্সাই সম্মেলনের কার্যকলাপে দুটি ভিন্ন ধ্যান ধারনার প্রতিফলন ঘটেছিল। একদিকে ছিল উইলসনের ঘোষিত আদর্শবাদী, উদারনৈতিক ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী; এর বিপরীতে ছিল ফরাসী ও ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের বাস্তববাদী স্বার্থান্বেষী দৃষ্টিভঙ্গী। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মূল লক্ষ্য ছিল জার্মানীকে সম্পূর্ণভাবে দুর্বল করা, এবং জার্মানীর স্বার্থ ক্ষুন্ন করে নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধ করা। স্বাভাবিকভাবে সম্মেলনের কার্যকলাপ খোলা মনে পরিচালিত হয়নি, পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস প্রকট হয়ে ওঠে এবং চরম গোপনীয়তার মাধ্যমে সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়।

ইতিবাচক বিষয়ের মধ্যে দুধরনের লক্ষ্য ছিল যেমন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধজনিত ধ্বংসস্তুপের ভেতর থেকে নতুন রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা; এবং ভবিষ্যত যুদ্ধের হাত থেকে মানবজাতিকে রক্ষার জন্য স্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা করা।

শান্তি সম্মেলনের সামনে বিচার্য বিষয়গুলি ছিল দুই ধরনের -- যেমন নেতিবাচক ও ইতিবাচক। নেতিবাচক দিকটি হল জার্মানীকে শাস্তিদান করা এবং ভবিষ্যতে জার্মানী যাতে আর যুদ্ধের পথে অগ্রসর না হয় সে জন্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা। ইতিবাচক বিষয়ের মধ্যে দু'ধরনের লক্ষ্য ছিল -- যেমন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধজনিত যে ব্যাপক ধ্বংসলীলা ঘটেছে, সেই ধ্বংসস্তুপের ভেতর থেকে নূতন রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রতিষ্টা করা, এছাড়া ভবিষ্যতে যুদ্ধের হাত থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্য স্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা করা। জার্মানীকে চুক্তি অনুমোদনের জন্য তিন সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়। চুক্তিটিতে সম্মতিদান ছাড়া জার্মানীর আর কোন বিকল্প ছিল না। জার্মানী পরিস্থিতির চাপে অনিচ্ছুকভাবে চুক্তিতে স্বাক্ষরদান করে। তাই প্রথম থেকেই চুক্তি সম্পর্কে জার্মানীর গভীর মানসিক ক্ষোভ ছিল।

প্রশ্ন

১। শান্তি সম্মেলনের সভাপতি কে ছিলেন?

২। ভার্সাই চুক্তির ওপর জার্মানীর ক্ষোভ ছিল কেন?

ভার্সাই সন্ধির ভৌগোলিক শর্ত অনুসারে আলসাস ও লোরেরন ফ্রান্সকে দেওয়া হল, বেলজিয়াম ও লাক্সেমবুর্গের নিরপেক্ষতার অবসান ঘোষিত হল এবং তাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লীগ অব নেশনস্ কর্তৃক পুনর্বিবেচিত হওয়ার কথাও ঘোষিত হল। জার্মানী কর্তৃক আক্রমণের ক্ষতিপূরণস্বরূপ বেলজিয়ামকে মরসনেট, ইউপেন ও মেমেডি দেওয়া হল। ফ্রান্সের খনিজ অঞ্চলের ধ্বংসসাধনের ক্ষতিপূরণস্বরূপ জার্মানীর সার অঞ্চল ফ্রান্সকে দেওয়া হল। বলা হল যে, সার উপত্যকা পনের বছরের জন্য এক আন্তর্জাতিক পরিষদের অধীনে থাকবে এবং এই পনের বছর ফ্রান্স সার-এর কয়লাখনির উপর কর্তৃত্ব করবে এবং এই মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে সার উপত্যকার অধিবাসীরা গণভোটের মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যৎ স্থির করবে।

গণভোটের মাধ্যমে উত্তর-শ্লেজউইগ ডেনমার্কের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তা কার্যকর করা হয়। এই গণভোট সম্পর্কে জার্মানীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী মন্তব্য করেন-- ৪০,০০০ জার্মান মনোভাবাপন্ন অধিবাসীকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জার্মানী থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। জার্মানীর পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত পোজেন ও পশ্চিম প্রাশিয়া পোলান্ডকে দেওয়া হয়। এর ফলে জার্মানীর ভেতরে একটি প্রবেশপথ সৃষ্টি করে জার্মানীকে দ্বিখন্ডিত করা হল, জার্মান অধ্যুষিত ডানজিগকে উন্মুক্ত শহর বলে ঘোষণা করা হল এবং এর শাসনভার লীগ অব নেশনস্-এর ওপর ন্যস্ত করা হল। মেমেল শহরটি প্রথমে মিত্রপক্ষকে ও পরে লিথুয়ানিয়াকে দেওয়া হল। লীগ অব নেশনস্-এর সর্বসম্মতি ছাড়া অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীর সংযুক্তি সাধন করা হবে না বলে স্থির হয়। জার্মানীকে তার সকল উপনিবেশ ত্যাগ করতে হল। এইভাবে প্রায় ২৫০০০ বর্গমাইল অঞ্চল জার্মানীকে পরিত্যাগ করতে হল এবং প্রায় ২০০০,০০০ জার্মান নাগরিককে স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হল। জার্মানীর সমস্ত উপনিবেশ মিত্রপক্ষীয় রাষ্ট্রবর্গের রক্ষাধীনে রাখা হল।

শান্তি চুক্তিতে জার্মানীর ভৌগোলিক ব্যবচ্ছেদও করা হয়। জার্মানীর খনিজ সমৃদ্ধসার অঞ্চল ফ্রান্সে দেওয়া হয়। তাছাড়া জার্মানীর ওপর প্রচুর পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিপূরণ চাপানো হয়েছিল।

ভার্সাই সন্ধির অর্থনৈতিক শর্তের মূল লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক দিক দিয়ে জার্মানীকে দুর্বল করে রাখা। সন্ধিপত্রে ২৩১ নং ধারায় বলা হয় 'জার্মানী ও মিত্র রাষ্ট্রবর্গের আক্রমণের ফলে মিত্রপক্ষভুক্ত সরকারগুলির ও তাদের নাগরিকদের যে ক্ষতি হয়েছিল জার্মানী তা পূরণ করতে বাধ্য থাকবে'। জার্মানীর বৃহদাকার বাণিজ্য পোতগুলি ফ্রান্স এবং যুদ্ধজাহাজগুলি ইংল্যান্ডকে দেওয়া হল। জার্মানী নিজ ব্যয়ে জাহাজ নির্মাণ করে ঘাটতি পুরণের জন্য বাধ্য রইল এবং শ্যাম, মরক্কো, সাইবেরিয়া, মিশর, তুরস্ক, বুলগেরিয়া প্রভৃতি স্থানে সকল সম্পত্তি ও 'বিশেষ অধিকার' পরিত্যাগ করতে বাধ্য হল। জার্মানীর বাইরে জার্মান নাগরিকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার মিত্রপক্ষের রইল। দশ বছরের জন্য ফ্রান্স, ইটালী, বেলজিয়ামকে প্রচুর পরিমাণ কয়লা সরবরাহ করতে জার্মানী বাধ্য থাকল। পাঁচ বছরের জন্য জার্মানীর এলব ও ওনিডার নদীগুলি আন্তর্জাতিক শাসনাধীনে রেখে তা সকল দেশের বাণিজ্যপোতগুলির নিকট উন্মুক্ত রাখা হল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে জার্মানী কি পরিমাণ অর্থ মিত্রপক্ষকে প্রদান করবে তা স্থির করা সম্ভব না হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী ও জাপানের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি ক্ষতিপূরণ কমিশন নিয়োগ করা হল।

প্রশ্ন

১। জার্মানীর একটি খনিজ সম্পদসমৃদ্ধ অঞ্চলের নাম লেখ?

২। কোন শহরকে উন্মুক্ত শহর বলে ঘোষণা করা হয়?

জার্মানীকে সামরিক শক্তির দিক দিয়েও পঙ্গু করে রাখার ব্যবস্থা হল। বাধ্যতামূলক সৈন্য সংগ্রহের রীতি বন্ধ করে বারো বছরের জন্য জার্মানীকে এক লক্ষ স্বেচ্ছাবাহিনী রাখবার অধিকার দেওয়া হল ও তা কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার কার্যে ব্যবহার করতে হবে বলা হল। রাইন নদীর পূর্বতীর থেকে জার্মান সৈন্য অপসারিত হল। তার কামান ও যুদ্ধ জাহাজের আকার ক্ষুদ্রতর করা হল, হ্যালিগোল্যান্ডের দুর্গগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হল। জার্মানীর নৌবহরের সংখ্যা হ্রাস করা হল, সামরিক বিমানবহর রাখা নিষিদ্ধ হল। জার্মানীকে এ সকল শর্তাদি পালন করতে বাধ্য করার জন্য রাইন নদীর বাম তীরবর্ত্তী অঞ্চল পনের বছরের জন্য মিত্র শক্তির অধীনে রাখা হল।

সন্ধির ২৩১ নং ধারায় জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা ছিল। সন্ধির শর্তাদি ও আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লঙঘন করার অপরাধে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামকে প্রধান যুদ্ধাপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। যুদ্ধের আইন-কানুন ভাঙ্গার জন্য সামরিক বিচারালয়ে একশত জার্মানকে অভিযুক্ত করা হল। জার্মানীকে নিজ পূর্ব সীমান্তে সৈন্য সরিয়ে আনতে হল এবং বেলজিয়াম, পোলান্ড, যুগোশ্লাভিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হল। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান লীগ অফ নেশনস্‌এর শর্তাদিও ভার্সাই সন্ধির অন্তর্ভুক্ত করা হল।

বাধ্যতামূলক সৈন্যসংগ্রহের রীতিবন্ধ করে—জার্মানীকে বারো বছরের জন্য একলক্ষ্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী রাখার অধিকার দেওয়া হল। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করায় কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামকে প্রধান যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা করা হয়।

প্রশ্ন

১। যুদ্ধের জন্য কাকে সর্বাধিকভাবে দায়ী করা হয়?

২। সেভরের সন্ধি কত সালে সংগঠিত হয়?

ভার্সাই সন্ধির মূলনীতির অনুকরণে অপরাপর সন্ধি দ্বারা ইউরোপের রাষ্ট্রীয় পুর্নবিন্যাস করা হয়। এগুলি হল (ক) সেন্ট জার্মেইনের সন্ধি (১৯১৯ খ্রীঃ), (খ) ট্রিয়াননের সন্ধি (১৯২০ খ্রীঃ), (গ) নিউলির সন্ধি (১৯১৯ খ্রীঃ) এবং (ঘ) সেভরের সন্ধি (১৯২০ খ্রীঃ)।

ভার্সাই সন্ধির নীতি ও কার্যকলাপ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী অভিমত লক্ষ্য করা যায়। প্রচলিত অভিমত অনুযায়ী এই সম্মেলনে ন্যায়, নীতি ও সততা বিসর্জন দিয়ে জার্মানীর প্রতি অবিচার করা হয়েছিল। বিজয়ীরা পরাজিত জার্মানীর প্রতি এত কঠোর না হলে হয়ত জার্মানী তার পরিবর্ত্তিত অবস্থা মেনে নিত। অধ্যাপক ই.এইচ. কার বলেছেন -- The element of dictation was more apparent than in any previous peace treaty of modern times. বিজিত ও বিজয়ীর মধ্যে আলাপ আলোচনার দ্বারা এই চুক্তির শর্ত নির্দ্ধারিত হয়নি। বিজয়ী পক্ষ প্রতিশোধ গ্রহণের নেশায় উন্মুত্ত হয়ে এই চুক্তি জার্মানীর ওপর আরোপ করেছিল। জার্মান প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোনো আলোচনা করা হয়নি, তাদেরকে একাসনে বসতে পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। প্যারিসে তাদের সঙ্গে সাধারণ অপরাধীদের ন্যায় ব্যবহার করা হয়েছিল। মিত্রপক্ষীয়দের এই দুর্ব্যবহার ও অসম্মান জার্মানবাসীদের মনে এই ধারনাই সৃষ্টি করেছিল যে তারা এই আরোপিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। এছাড়া ভার্সাই চুক্তি সম্পর্কে অভিযোগ হল এই সন্ধির শর্তাবলী ছিল জার্মানীর পক্ষে কঠোর ও নির্মম, জার্মানীকে রাজনৈতিক,সামরিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন দিক দিয়ে দুর্বল করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানীকে একতরফাভাবে

ভার্সাই চুক্তি সম্পর্কে অভিযোগ হল এই সন্ধির শর্তাবলী ছিল, জার্মানীর পক্ষে কঠোর ও নির্মম। জার্মানীকে রাজনৈতিক, সামারিক, অর্থনৈতিক বিভিন্ন দিক দিয়ে দুর্বল করা হয়। অর্থাৎ উইলসনের চৌদ্দদফা শর্ত লঙ্ঘন করা হয়।

দায়ী করে তার কাছে সাধ্যাতীত ক্ষতিপূরণ আদায়ের চেষ্টা করা হয় ও জার্মানীকে আর্থিক ও সামরিক দিক দিয়ে হীনবল করার হীনচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এই সন্ধির পেছনে ন্যায় নীতি ও পারস্পরিক সুবিধা নীতি আদপেই ছিল না। অন্যান্য শক্তিগুলি এই যুদ্ধের জন্য কম দায়ী ছিল না। ভার্সাই সন্ধির দ্বারা জার্মানীর অস্ত্র হ্রাস করা হলেও বিজয়ী শক্তিগুলি তাদের নিজস্ব সম্ভার অক্ষুন্ন রাখে। জার্মানীর ন্যায় একটি বৃহৎ দেশকে ভার্সাই সন্ধির দ্বারা যেরূপভাবে অসামরিকীকরণ, উপনিবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, ইতিহাসে তার তুলনা বিরল।

উইলসনের চতুর্দশ দফা ছিল মিত্রশক্তিরই প্রস্তাব। চর্তুদশ দফা শর্ত মেনে অস্ত্র সমর্পন করলে, এর ভিত্তিতে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হবে বলা হলেও ভার্সাই চুক্তিতে তা অগ্রাহ্য করা হয়। চোদ্দ দফা শর্তের ধারাগুলি হল (১) গোপন কূটনীতি পরিত্যাগ করে খোলাখুলিভাবে ও সমতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনা করা। (২) শান্তি বা যুদ্ধের সময়, উপকূলবর্ত্তী অঞ্চল ছাড়া সমুদ্র মুক্ত রাখা, (৩) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নতির জন্য অর্থনৈতিক বাধাবিঘ্ন হ্রাস করা, (৪) অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রয়োজন ব্যতীত অস্ত্রশস্ত্রের হ্রাস করা। (৫) উপনিবেশবাসীর স্বার্থের কথা স্মরণ রেখে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপনিবেশ পুনর্বিবেচনা করা, (৬) রাশিয়ার হৃত রাজ্যাংশ ফিরিয়ে দিয়ে তাকে স্বাধীন দেশ রূপে গড়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া, (৭) স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বেলজিয়ামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, (৮) ফ্রান্সের সমস্ত অঞ্চল মুক্ত করা, (৯) ইটালীর সীমান্ত পুনর্বিন্যাস, (১০) অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীয় জনগণের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করা, (১১) বল্কান রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা করা (১২) তুরস্কের অঞ্চলগুলির সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নটি সুনিশ্চিত করা (১৩) পোলান্ডের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা এবং (১৪) ছোট বড় সকল রাষ্ট্রে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য পারস্পরিক দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট চুক্তির ভিত্তিতে জাতিগুলির একটি সাধারণ সমিতি স্থাপন।

উল্লেখ্য, চর্তুদশ দফায় ১-৪ ধারায় শর্তগুলি ভার্সাই সন্ধিতে প্রয়োগ করা হয়নি। চর্তুদশ দফায় সচল শক্তির নিরস্ত্রীকরণের কথা বলা হলেও ভার্সাই সন্ধির দ্বারা কেবলমাত্র জার্মানীকে নিরস্ত্রীকৃত করা হয়। এছাড়া 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' নীত ঘোষিত হলেও জার্মানীর কোন কোন অংশকে জার্মান অধিবাসীসহ জার্মানী থেকে ব্যবচ্ছেদ করা হয়।

প্রশ্ন

১। উইলসনের চৌদ্দ দফা নীতিটি কি ছিল?

২। কোন কোন ক্ষেত্রে চৌদ্দদফা শর্তের লঙ্ঘন করা হয়?

ভার্সাই সন্ধি প্রকৃতপক্ষে কঠোর অবিচারমূলক ছিল কিনা, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। পৃথিবীর কূটনৈতিক ইতিহাসে যুদ্ধাবসানে সমস্ত শান্তিচুক্তিই বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে সম্পাদিত হয় এবং সর্বক্ষেত্রেই বিজয়ী শক্তিবর্গ বিজিতদের উপর একতরফাভাবে শর্তাবলী আরোপ করেন। এদিক থেকে ভার্সাই চুক্তি নজিরবিহীন ও আশ্চর্যজনক ছিল না। এছাড়া, জার্মানীর আচার-আচরণও সন্দেহের উর্দ্ধে নয়। ১৮৭১ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কফুটের সন্ধিতে ফ্রান্সের প্রতি সে যে নির্মম আচরণ করেছিল তার কোন তুলনা নেই। আবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বলশেভিক রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানীর যে ব্রেস্ট লিটোভস্ক-এর চুক্তি সম্পাদিত হয়, রুমানিয়ার সঙ্গে যে বুখারেষ্টের সন্ধি সম্পাদন হয়েছিল তাতেও জার্মানী কঠোর ও স্বার্থপর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয়। ডেভিড টমসন উল্লেখ করেছেন, প্যারিসের শান্তিচুক্তি রচয়িতাদের সামনে ইউরোপে নূতন শক্তির ভারসাম্য স্থাপনের প্রয়োজন ছিল। তাদের এমনভাবে নূতন

শক্তির ভারসাম্য স্থাপন করতে হবে যার ফলে জার্মানীর সামরিক অভ্যুত্থান সম্ভব না হয় ও তার বিরুদ্ধে শক্তি সমতা দৃঢ় ও চিরস্থায়ী হয়। তা ছাড়া জাতীয় স্বাধিকার নীতির ভিত্তিতে মধ্য পূর্ব ইউরোপকে নবরূপে সাজানো প্যারিস শান্তি স্থাপকদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তাই তাঁরা জার্মানীর বিজিত অঞ্চলগুলি বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন। বস্তুতপক্ষে জার্মানীকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করা হয়নি ও তার বিজিত রাজ্যগুলিকে জাতীয়তার ভিত্তিতে তাদের ন্যায্য অধিকারীদের পুনরায় ফেরৎ দেওয়া হয়েছিল। ভার্সাই শান্তিচুক্তিতে জার্মানী প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তার মূল শিল্পাঞ্চলগুলি বহাল ছিল। এ.জে.পি টেলর মনে করেন, জার্মানীর অন্তর্নিহিত শক্তি অব্যাহত ছিল ও ভার্সাই চুক্তির স্থপতিরা জার্মান সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি। ভার্সাই চুক্তি সঠিকভাবে রূপায়িত হয়নি। এই চুক্তি ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী। এক দশকের মধ্যে এই চুক্তি অকেজো ও অর্থহীন হয়ে পড়ে। অধ্যাপক টেলর মন্তব্য করেন -- 'The Treaty proved to be failure less because of the inherent defects it contained than it was never put into effect.'

বস্তুতপক্ষে জার্মানীকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করা হয়নি ও তার বিজিত রাজ্যগুলিকে জাতীয়তার ভিত্তিতে তাদের ন্যায্য অধিকারীদের ফেরৎ দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া জার্মানীর মূল শিল্পাঞ্চল গুলি বহাল ছিল।

এ সত্বেও ভার্সাই চুক্তির তথাকথিত কঠোরতা ঐতিহাসিক মহলে ও জার্মানীর জনমানসে বিরূপতার সৃষ্টি করেছিল। অধ্যাপক ই. এইচ. কার, জি. হার্ডি প্রমুখ ঐতিহাসিকরা মনে করেন, ভার্সাই চুক্তির কঠোরতার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ারূপেই জার্মানীতে প্রতিশোধস্পৃহা জাগ্রত হয় ও হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানী বলপূর্বক ভার্সাই সন্ধি সংশোধনের চেষ্টা করে ও এর থেকেই যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। অপরদিকে এ.জে.পি টেলর প্রমুখ মনে করেন, ভার্সাই চুক্তির কঠোরতাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তি বলা যায় না, কারণ ভার্সাই চুক্তির তথাকথিত কঠোরতা যখন ধূসর স্মৃতিমান তখন জার্মানী ভার্সাই-এর অবিচারকে অপপ্রচারের বিষয়বস্তুতে পরিণতি করে। তবে ভার্সাই চুক্তি পরোক্ষভাবে জার্মানীর পক্ষে ক্ষতিকারক ছিল। ভার্সাই চুক্তিতে সাক্ষ্যদানকারী ওয়েমার গণতান্ত্রিক সরকার জার্মানীর জনগণের কাছে পরাজয় ও আত্মসমর্পনের নামান্তর বলে পরিগণিত হয়। স্বভাবতই ভার্সাই বিরোধী মনোভাবে সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীর জনমানসে শান্তি ও গণতন্ত্রবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী সুদৃঢ় হয়। এই অবস্থায় জার্মানীতে গণতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তি দুর্বল হয় ও জার্মান রাজনীতিতে গণতন্ত্র বিরোধী শক্তির আগমনের পথ প্রশস্ত হয়।

প্রশ্ন

১। ভার্সাই সন্ধি কি কঠোর ছিল?

২। জার্মানীতে কিভাবে গণতন্ত্রবিরোধী শক্তির পথ প্রশস্ত হয়?

২.২.১.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) Thomson David – *Europe Since Napoleon.*

(২) Seaman L.C.B. – *From Vienna to Versailles.*

(৩) Roberts J.M. – *Europe 1870-1945.*

(৪) Lipson – *Europe in the 19th and 20th Centuries.*

(৫) Joll James – *Europe since 1870.*

(৬) Hobsbawm Eric – *Age of Capital 1848-1875.*

(৭) Grant and Temperly – *Europe in the 19th and 20th Centuries*

(৮) Taylor A.J.P. – *Europe : Grandeur and Decline.*

(৯) Taylor A.J.P. *Struggle for Mastery in Europe.*

(১০) Taylor A.J.P. – *First World War.*

(১১) Fay – *Origins of the First World War*

২.২.১.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উদ্ভবের কারণ ব্যাখ্যা কর। এই যুদ্ধ এড়ানো সম্ভবপর ছিল কিনা?

(২) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানীর দায়িত্ব বিশ্লেষণ করো।

(৩) ভার্সাই চুক্তি সম্পর্কে জার্মানীর অভিযোগসমূহের কি কোন দৃঢ় ভিত্তি ছিল?

(৪) ভার্সাই চুক্তি কি কঠোর ছিল?

(৫) ভার্সাই সন্ধির মধ্যে কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল?

———————

পর্যায় গ্রন্থ - ৪
Second World War and the New Political Order

একক - ১
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তি, প্রকৃতি এবং ফলাফল
Origin, Nature and Results of the Second World War

বিন্যাস ক্রম ঃ

২.৪.১.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

২.৪.১.১ ঃ উৎপত্তি (Origin)

২.৪.১.১.১ ঃ সাম্রাজ্যবাদই যুদ্ধের মূল কারণ (Imperialism as the Root Cause of the War)

২.৪.১.১.২ ঃ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের এর শান্তিচুক্তি ব্যবস্থার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া (Long-term Reactions of the Peace Settlement of 1919)

২.৪.১.১.৩ ঃ ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব (Anglo-French Conflict)

২.৪.১.১.৪ ঃ সোভিয়েত বিরোধিতা ও তোষণনীতি (Anti-Sovietism and Appeasement Policy)

২.৪.১.১.৫ ঃ ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের উত্থান (The Rise of Fascism and Nazism)

২.৪.১.২ ঃ যুদ্ধকালীন রাজনীতি (Politics During War-time)

২.৪.১.৩ ঃ যুদ্ধের ফলাফল (Results of the War)

২.৪.১.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Suggested Readings)

২.৪.১.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Probable Questions)

২.৪.১.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

এই পর্যায়গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তির প্রেক্ষাপট

(২) যুদ্ধের প্রকৃতি ও মিত্রপক্ষীয় রাজনীতি

(৩) যুদ্ধের ফলাফল

(৪) জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও অব-উপনিবেশায়ন

২.৪.১.১ ঃ উৎপত্তি (Origin)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ন্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনাও দৃশ্যত পূর্ব ইউরোপে জার্মান জাতীয়সংখ্যালঘুদের (German National Minorities) সমস্যা ও বিবাদকে কেন্দ্র করে হয়েছিল। কিন্তু জাতীয়সংখ্যালঘুদের সমস্যা কখনই যুদ্ধের মূল কারণ ছিল না। ডেভিড থমসন সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন যে, এক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের ব্যবহার করা হয়েছিল, ঠিক যেরূপ একটি শিকারকে আক্রমণের জন্য ঢিলাঢালা করে তার ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত করার ন্যায় বিদেশি নাৎসীদলগুলিকে লিভার হিসাবে যন্ত্রবৎ ব্যবহার করা হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ন্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও উপনিবেশগুলির ও প্রভাবাধীন বৃত্তগুলির (Spheres of influence) পুনর্বিভাজনের জন্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যস্থ দ্বন্দ্ব ও সংঘাত-এর চূড়ান্ত ফলাফলস্বরূপ হয়েছিল বলা যায়। উক্ত মূল কারণ ছাড়াও অন্যান্য অনেকগুলি ক্ষেত্রসমূহ এমন একটি প্রক্রিয়াকে উৎপাদন ও ত্বরান্বিত করার কাজে ব্যবহৃত করেছিল, যার পরিণতিক্রমে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল বলা যায়।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের ন্যায় দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধও উপনিবেশগুলির ও প্রভাবাধীন বৃত্তগুলির পুনর্বিভাজনের জন্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যস্থ দ্বন্দ্ব ও সংঘাত-এর চূড়ান্ত ফলাফলস্বরূপ হয়েছিল।

২.৪.১.১.১ ঃ সাম্রাজ্যবাদই যুদ্ধের মূল কারণ (Imperialism as the Root Cause of the War)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎসের কারণ বিত্তবান ও বিত্তহীনদের (Haves & Have-nots) দ্বন্দ্বের মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল বলে বলা যায়। ১৯১৯-এর ভার্সাই শান্তিচুক্তি ব্যবস্থা জার্মানীকে তার সকল ঔপনিবেশিক অধিকারসমূহ থেকে বঞ্চিত করে, যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী শক্তিসমূহ যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্যের ন্যায় নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেয়। ১৯২০ সালের মধ্যে সমগ্র ঔপনিবেশিক জগৎকে গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পর্তুগাল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইটালী ও জাপানের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে দেওয়া হয়। উক্ত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্সকেই উপনিবেশসমূহের বৃহত্তম মালিকানা দেওয়া হয়। সুতরাং এর দরুন এটা স্বাভাবিক ছিল যে একদিকে যখন বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক স্থিতাবস্থা (Political & territorial status quo) বজায় রাখতে চাইবে, তখন জার্মান সাম্রাজ্যবাদীগণ উক্ত স্থিতাবস্থার একটি পরিবর্তন কামনা করবে। যেহেতু শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ঔপনিবেশিক জগতের পুনর্বিভাজন সম্ভবপর ছিল না, সুতরাং জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা তদানীন্তন ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের নিকট হতে লড়াই করে উপনিবেশ ও প্রভাবাধীন বৃত্তসমূহ ছিনিয়ে নেবার আশা করেছিল। তার অর্থ ছিল প্রথম অবস্থায় তাদের (ঔপনিবেশিক শক্তিদের) ধ্বংস করা। এক্ষেত্রে ইটালী ও জাপান এইজন্যই জার্মানীর পাশে দাঁড়িয়েছিল কারণ তাদের খুব কমই ঔপনিবেশিক অধিকৃত অঞ্চল ছিল। সাম্রাজ্যবাদের যুক্তিবিদ্যা ছিল বিজয়

১৯১৯ এর ভার্সাই শান্তি চুক্তির পর সর্বস্বহৃত জার্মানী লড়াই করে বিজয়ীশক্তির কাছ থেকে উপনিবেশ ও প্রভাবাধীন বৃত্তসমূহ ছিনিয়ে নেবার আশা করেছিল। এক্ষেত্রে ইটালী ও জাপান জার্মানীর পাশে দাঁড়ায়।

প্রশ্ন

১। ভার্সাই শান্তি চুক্তি কবে স্থাপিত হয়?

২। ভার্সাই শান্তি চুক্তিতে জার্মানীর উপনিবেশগুলি কাদের মধ্যে মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়?

অভিযানের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী আধিপত্যবাদ যার অর্থ ছিল যুদ্ধ। অক্ষশক্তির (Axis Power) রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা ও সমরযন্ত্র উক্ত লক্ষ্যেই ধাবিত হয়েছিল।

২.৪.১.১.২ ঃ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের শান্তিচুক্তি ব্যবস্থার সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া (Long-term Reactions of the Peace Settlement of 1919)

ভার্সাইচুক্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ রূপে বর্ণিত হয়েছে। যুদ্ধের দোষজনিত ধারা ও কঠোর ও শাস্তিমূলক অর্থনৈতিক ধারাসমূহ জার্মান জাতির জাতীয় গর্ব ও অনুভূতিকে আঘাত করেছিল, যাকে হিটলার জার্মান সাম্রাজ্যবাদের লুণ্ঠনমূলক লক্ষ্যসমূহকে অনুসরণ করার কাজে ব্যবহার করেছিলেন। অপরদিকে উক্ত চুক্তি জার্মানীর কাছ থেকে নিরাপত্তার যথোপযুক্ত সামরিক গ্যারান্টি আদায় করতে ব্যর্থ হয়। ফ্রান্স সঠিকভাবেই ফরাসী নিরাপত্তার সামরিক গ্যারান্টিস্বরূপ রাইণল্যান্ডের উপর একটি অনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ জারি করবার দাবি জানায়, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেটব্রিটেন তাতে সম্মতি জানাতে অস্বীকার করে, কারণ তারা ইউরোপে ফরাসী আধিপত্যের প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে আশঙ্কিত ছিল এবং তাদের মনে সোভিয়েট কমিউনিজম্-এর বিরুদ্ধে জার্মানীকে নিজেদের নিরাপত্তার বা আত্মরক্ষার সম্ভাব্য মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করার ধারণা বিদ্যমান ছিল। উক্ত চুক্তি জার্মান সাম্রাজ্যবাদী ও সমরবাদীদের তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সামরিক শক্তির পুনরুত্থান ঘটানোর সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় সময়কাল প্রদান করেছিল। এতৎসত্ত্বেও ভার্সাই চুক্তিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ বলা যায় না। ইহা ছিল গৌণ কারণ। এর কারণ শান্তি বন্দোবস্তের শর্তসমূহ প্রয়োজনের সময় বলবৎ করা হয়নি।

১৯১৯ খ্রীঃ ভার্সাই সন্ধি জার্মান জাতির জাতীয় গর্ব ও অনুভূতিকে আঘাত করেছিল। অপরদিকে এই চুক্তি জার্মানীর কাছ থেকে সামরিক গ্যারান্টি আদায়ে ব্যর্থ হয়।

প্রশ্ন

১। ভার্সাই সন্ধির প্রতিক্রিয়া কি ছিল?

ভার্সাই শান্তিচুক্তির পর ফ্রান্স ও ব্রিটেন কূটনৈতিক দিক থেকে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যা শান্তি ভঙ্গ কারীর বিরুদ্ধে যৌথ নিরাপত্তার একটি মাধ্যম হিসেবে জাতিপুঞ্জকে ধ্বংস করে দেয়।

২.৪.১.১.৩ ঃ ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব (Anglo-French Conflict)

ভার্সাই শান্তি চুক্তির বলবৎকরণের বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল ছিল। ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বর্বরতম যুদ্ধ অনুষ্ঠিত করবার ক্ষেত্রে যে অন্যতম প্রধান একক ক্ষেত্রটি হিটলারের জার্মানী ব্যবহার করেছিল তা হচ্ছে শান্তিচুক্তি বলবৎকরণের বিষয়ে ব্রিটেন ও ফ্রান্স একে অপরের বিপরীতমুখী অবস্থান গ্রহণ করেছিল। এক্ষেত্রে উভয়পক্ষই পৃথক পথ অনুসরণ করে নিজেদেরই সাহায্যে গড়ে তোলা স্থিতাবস্থাকে বজায় রাখবার চেষ্টা করেছিল। এরপর ব্রিটেন ও ফ্রান্স কূটনৈতিক দিক থেকে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে, জার্মানীর পক্ষে একটির পর একটি ভার্সাইর চুক্তিসমূহ লঙ্ঘন করা শাস্তির ভয় ছাড়া অনায়াস হয়ে ওঠে। ল্যাংসাম মন্তব্য করেছেন যে এইরূপে বহু নিকৃষ্ট প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ফরাসী-জার্মান বিবাদসমূহ ফরাসী-ব্রিটিশ বিবাদসমূহে পরিণত হয়, যা স্বভাবতই জার্মানীর পক্ষে আসে।

ফরাসী ও ব্রিটিশ নীতিসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব শান্তিভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে যৌথনিরাপত্তার একটি মাধ্যম হিসাবে জাতিপুঞ্জকে

(League of Nations) ধ্বংস করে দেয়। ফ্রান্স এবং তার পূর্বদিকের মিত্ররাষ্ট্রগুলির নিকট আঞ্চলিক স্থিতাবস্থা এবং ইউরোপে ফরাসী আধিপত্য বজায় রাখাই লীগের কভেনান্ট বা চুক্তিপত্রের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং ফ্রান্সের নিকট যুদ্ধ করবার ক্ষেত্রে জার্মানীর চিরস্থায়ী অক্ষমতাই স্থিতাবস্থার ভিত্তি। অপরদিকে গ্রেট ব্রিটেনের নিকট একটি

প্রশ্ন

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তিরক্ষার জন্য কি গঠন করা হয়?

২। ১৯১৯-এর পর ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেঁধে ছিল কেন?

অত্যাবশ্যক, যেখানে গ্রেটব্রিটেন তার ধারক ও বাহকরূপে কাজ করবে। উক্ত দ্বন্দ্বই লীগের হামাগুড়ি দেওয়া পঙ্গুত্বকে সূচিত করে যা আন্তর্জাতিক শান্তি-শৃংখলা বিঘ্নিত করার ক্ষেত্রে তার অক্ষমতাকে প্রকাশ করে।

২.৪.১.১.৪ ঃ সোভিয়েত বিরোধিতা ও তোষণনীতি (Anti-Sovietism and Appeasement Policy)

গ্রেটবিট্রেন ও ফ্রান্সের সরকারদ্বয় সোভিয়েত কমিউনিজম্-এর বিপদ সম্পর্কে এতটাই আশঙ্কিত ছিল যে, তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য হিটলার তোষণনীতি গ্রহণ করে।

রাশিয়া তথা সোভিয়েট ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতিবিদদের মনে জার্মান সমরতন্ত্রবাদের ভীতির পরিবর্তে সোভিয়েট কমিউনিজম্-এর অপচ্ছায়াকে উপস্থাপিত করে। গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্সের সরকারদ্বয় কমিউনিজম্-এর বিপদ সম্পর্কে এতটাই আশঙ্কিত ছিল যে তারা মনে করত সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তার মাধ্যম (bulwark) রূপে জার্মানীকে ব্যবহার করা যাবে, যা ডেভিড থমসন সঠিকভাবেই চিহ্নিত করেছেন। অপরদিকে নাৎসী জার্মানী বৃহৎ শক্তিদের কমিউনিজম্-এর আশঙ্কা দ্বারা পীড়িত থাকার বিষয়টিকে সাফল্যের সহিত নিজের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে ও লীগকে পঙ্গু করতে ব্যবহার করেছিল।

যখন নাৎসী জার্মানী একতরফাভাবে ভার্সাই চুক্তির অনুজ্ঞাসমূহকে বাতিল করে তার লুণ্ঠনকারী লক্ষ্যসমূহকে পরিস্ফুট করে তুলছিল, তখন ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকারদ্বয় হিটলারকে তোষণ করবার নীতি গ্রহণ করে, যার ফলে তারা সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তাঁকে (হিটলারকে) নিক্ষেপ করতে পারবে। উক্ত তোষণনীতি মিউনিক বন্দোবস্ত দ্বারা এর চূড়ান্ত পরিণতিতে উপনীত হয়। নাৎসীবাদের বিপদের আত্মপ্রকাশকাল থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন শান্তিকামী শক্তিগুলির একটি হিটলার বিরোধী জোট গঠনের জন্য আবেদন জানাতে থাকে। কিন্তু ব্রিটেন ও ফ্রান্স তা গঠনের জন্য ইচ্ছুক ছিল না। জার্মানীর পোল্যান্ড আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত তারা নিজেদের দিক থেকে জার্মানীর সম্প্রসারণকে কেবলমাত্র পূর্বদিকে

প্রশ্ন

১। হিটলার কে ছিলেন?

২। ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের অর্থ কি?

ধাবিত করার দিকে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার লক্ষ্যেই ব্যস্ত ছিল। এইরূপে যে প্রস্তাবিত গ্র্যান্ড অ্যালায়েন্স বা বৃহৎ মৈত্রীজোট হিটলারের উচ্চাকাঙ্ক্ষাসমূহকে রুখে দিতে পারত, তা গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়নি।

২.৪.১.১.৫ ঃ ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের উত্থান (The Rise of Fascism and Nazism)

এছাড়া ইটালী, জাপান ও জার্মানীতে ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের রাজনৈতিক দর্শনের অতিরিক্ত ক্ষেত্রসমূহ বিদ্যমান ছিল — যা বিশ্বে নিজ নিজ 'প্রভু-জাতির' (master race) আধিপত্যবাদকে নির্দেশায়িত করে। ফ্যাসীবাদ ও নাৎসীবাদের অর্থই হচ্ছে যুদ্ধ।

২.৪.১.২ ঃ যুদ্ধকালীন রাজনীতি (Politics During War-time)

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানীর পোল্যাণ্ড আক্রমণের পরিণতিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধশুরু হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত এটিও ছিল "mass war" বা হবস্‌বমের কথানুযায়ী "Total War"

রুশ জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি (আগস্ট ২৩, ১৯৩৯) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কূটনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরির ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক অধ্যায়। সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির এই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নাৎসীবাদ ও ফ্যাসীবাদকে উৎসাহিত ও শক্তিশালী করে তুলল। হিটলার এই চুক্তিতে উৎসাহিত হয়ে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর পোল্যান্ড আক্রমণ করেন যার পরিণতি হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত এটিও ছিল 'mass war' বা হবস্‌বমের কথানুযায়ী 'Total War'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অভাবনীয় ও নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে যায়। যুদ্ধের সূচনায় যে সোভিয়েট রাশিয়া ছিল ব্রিটেন-ফ্রান্সের ঘোরতর শত্রু, সেই রাশিয়াই যুদ্ধের গতিবিধির ঘূর্ণিঝড়ে তার কূটনৈতিক অবস্থানের বিপরীত দিকে চলে আসতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ যে জার্মানী ছিল যুদ্ধের সূচনায় সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্র, সেই রুশ-জার্মান সম্পর্কে যুদ্ধের দু-বছরের মধ্যেই ফাটল ধরল এবং সম্পর্কের ঘোরতর অবনতি ঘটল। হিটলার রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হল কতকগুলি কারণে। সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানীর সঙ্গে সম্পর্ক পরিহার করে ইংলন্ড এবং ফ্রান্সের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর পার্ল হারবারে বোমা বর্ষণকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে অক্ষশক্তির (জার্মানী, ইতালি ও জাপান) বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হল। এইভাবে যুদ্ধের নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহ মিত্রপক্ষীয় রণকৌশল ও কূটনৈতিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে এক মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে এল। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স তাদের নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে বৃহৎ রাষ্ট্রদ্বয় — সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একই সূত্রে বেঁধে ফেলতে পারল। গঠিত হল চমক লাগানো মহাজোট (The Grand Alliance)। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের সূচনা থেকে যুদ্ধ ও কূটনীতি এই দুই পন্থার মাধ্যমে গ্র্যান্ড এ্যালায়েন্স (Grand Alliance) তাদের কার্যকলাপ পরিচালিত করল। দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার প্রশ্নে রাশিয়ার সঙ্গে ব্রিটেন বা আমেরিকার ভুল বোঝাবুঝি ও মনকষাকষি চললেও অবশেষে সেই রণাঙ্গন খোলা হয় ১৯৪৪ সালের জুন মাসে। এর ফলে জার্মানীর পরাজয়ের সম্ভাবনা অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে যায়।

যুদ্ধকালীন সময়ে মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে তিনটি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এগুলি হল — তেহেরান, ইয়াল্টা ও পটসডাম। যুদ্ধকালীন তিন রাষ্ট্র প্রধানের তিনটি শীর্ষ সম্মেলন পূর্ব-ইউরোপে সোভিয়েত প্রভাব বিস্তারের

প্রশ্ন

১। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি কত সালে স্থাপিত হয়?
২। সোভিয়েত রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল কেন?
৩। কত সালে পার্ল হারবারে বোমা বর্ষণ হয়?

অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক হয়ে উঠে। তবে পটসডাম সম্মেলনে নানা প্রশ্নে সোভিয়েত পক্ষের সঙ্গে ব্রিটিশ-মার্কিন পক্ষের তীব্র বাদানুবাদ ও মতানৈক্য দেখা দেয় যা পরের তিন দশকের ঠান্ডা-লড়াই এর ইঙ্গিত দিয়েছিল। অবশ্য আশার কথা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মত (U.N.O) একটি আন্তর্জাতিক শান্তি সংস্থা যুদ্ধাবসানে গড়ে উঠতে পেরেছিল।

২.৪.১.৩ ঃ যুদ্ধের ফলাফল (Results of the War)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান ফলাফল ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের Super Power বা অতিশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ। উক্ত দুটি দেশ বিশ্ব মানচিত্রে তাদের সকল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতাবলী নিয়ে আবির্ভূত হয়ে বিশ্বকে তাদের নিজস্ব চিন্তাধারার আলোকে সংগঠিত করতে চেয়েছিল। তারা অন্য কোন শক্তি অথবা সম্ভাব্য অপর শক্তিজোট অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী দেশ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল এবং তাদের অধিকতর প্রভাবসম্পন্ন অবস্থানের জন্য তারা তাদের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিসাম্য (Balance of Power) নির্ধারণ করতে পেরেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান ফলাফল ছিল একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের "Super Power" বা অতিশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ এবং অন্যদিকে তিনটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র যথা — জার্মানী, ইতালী ও জাপানের বিলুপ্তিসাধন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন উভয় পক্ষকেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা (isolation) থেকে বার করে আনবার উপলক্ষ্য প্রদান করেছিল, যে বিচ্ছিন্নতার নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বয়ং বেছে নিয়েছিল এবং যাকে মূলত বলপূর্বক সোভিয়েট ইউনিয়নের আত্মপ্রকাশের পর তার উপর চাপানো হয়। এ কথা সত্য যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে উক্ত দুটি দেশ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ও কার্যাবলীর ক্ষেত্রে জড়িত ছিল। কিন্তু তারা কখনই দুটি বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে ইউরোপীয় ও এশীয় দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও কার্যাবলীর ক্ষেত্রে মুখ্য অভিনেতারূপে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেয়নি।

উক্ত যুদ্ধ স্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে তিনটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র যথা জার্মানী, ইটালী এবং জাপানের বিলুপ্তি সাধন করেছিল। এর মধ্যে জার্মানীর এমনকি বিভাজন করা হয়েছিল। ব্রিটেন এবং ফ্রান্স সহ অন্যান্য ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাদের সামাজ্যগুলি সংকটে পড়ে, তাদের অর্থনৈতিক শক্তি দারুণভাবে হ্রাস পায় এবং তাদের সামরিক শক্তিরও ব্যাপক অবনতি ঘটে।

প্রশ্ন

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান ফলাফল কি ছিল?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ন্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শেষতম পক্ষ হিসেবে হস্তক্ষেপ করে বিশ্বের প্রধান শিল্পোন্নত শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

যুদ্ধে ইউরোপীয় শক্তিগুলি একে অপরকে রক্তাক্ত করার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র প্রধান শিল্পোন্নত শক্তিরূপে কোনরূপ ধ্বংসসাধন ব্যতীত আত্মপ্রকাশ ঘটে, যার জনসংখ্যা প্রায় ক্ষয়ক্ষতিহীন ও অটুট ছিল, যার অর্থনীতি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উৎপাদনশীল হয় এবং যার সামরিক শক্তির দুটি বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী যুগ অপেক্ষা বহুল পরিমাণে বিস্তার ঘটে। প্রথম

বিশ্বযুদ্ধের ন্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পুনরায় বিবাদমান দেশসমূহের মধ্যে শেষতম পক্ষ হিসাবে হস্তক্ষেপ করে যখন ন্যূনতম বোঝা নিয়ে সর্বাধিকতম লাভ করে, তখন অন্যান্য দেশগুলি ব্যাপকভাবে ক্ষতিপ্রাপ্ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বিমান আক্রমণ দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছিল। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন অক্ষত ছিল। মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে ব্যাপক মাত্রায় লাভ করেছিল যার সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী সামগ্রিক পরিমাণ ছিল কর প্রদানের পর ৫২ বিলিয়ন ডলার অথবা ১৩,০০০ মিলিয়ন পাউণ্ড। তারা তাদের কলকারখানা-গুলির উৎপাদনশক্তির অর্ধাংশ বৃদ্ধি করেছিল এবং ৮৫ বিলিয়ন ডলার অথবা ২১,২৫০ মিলিয়ন পাউণ্ড মূলধনী তহবিল সংরক্ষিত করেছিল।

প্রকৃতপক্ষে উক্ত যুদ্ধ মার্কিন অর্থনীতির রূপান্তর সাধনে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। এর উৎপাদনশীলতা তিননম্বর শিল্পোন্নত দেশের (তখন গ্রেটব্রিটেন) তুলনায় পাঁচগুণ বেশি ছিল। (যদিও সোভিয়েট অর্থনীতি ব্যাপকভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় তা দুর্বলতর হয়েছিল, তথাপি তখন সে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থাৎ গ্রেটব্রিটেন এর ন্যায় একইরকম শক্তিশালী ছিল। বৃহত্তম শক্তিদ্বয়ের সহিত পরবর্তী পর্যায়ভুক্ত শক্তিদের মধ্যস্থ

প্রশ্ন

১। জাপানের শিল্পোন্নত উপনিবেশগুলি কি কি ছিল?
২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোন শক্তি শিল্পোন্নত দেশরূপে আত্মপ্রকাশ করে?
৩। সোভিয়েত রাশিয়ার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কে ছিল?

ক্রমবর্ধমান ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পায় যখন ইউরোপের প্রধান উপনিবেশগুলির সবগুলি স্বাধীনতা লাভ করে। জাপান শিল্পোন্নত মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া ও তাইওয়ান এবং অন্যান্য মূল্যবান ঔপনিবেশিক অধিকারগুলিকে হারায়। অপরদিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন যুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপের ব্যাপক অঞ্চলের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং সেখানে এমন কতকগুলি সরকার প্রতিষ্ঠা করে যা তার রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থের অনুকূল ছিল।

এছাড়া ঠিক যেরূপ সোভিয়েট সামরিক শক্তি পুরাতন সীমান্তসমূহকে অতিক্রম করে প্রবাহিত হয়েছিল, মার্কিন সামরিক শক্তিও পুরাতন সীমাকে অতিক্রম করে সোভিয়েট ইউনিয়ন অপেক্ষা ব্যাপকতর ভিত্তিতে ইউরোপ, এশিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে প্রবাহিত হয়েছিল।

১৯৪৫ খ্রীঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আণবিক বোমা বিস্ফোরণের দ্বারা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তারকারী ক্ষমতা লাভ করে। ১৯৪৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক বোমা এবং ১৯৫৩ সালে থার্মোনিউক্লিয়ার বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়।

একটি প্রধান ক্ষেত্র যা দুটি ইউরোপীয় শক্তি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ঔদ্ধত্যপূর্ণ অবস্থানের জন্য দায়ী ছিল তা হচ্ছে আণবিক শক্তি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৫ সালে আণবিক বোমা বিস্ফোরণ দ্বারা আণবিক শক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে একটি প্রধান সাফল্য লাভ করে যার দরুন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এমন আধিপত্য বিস্তারকারী ক্ষমতা লাভ করে যা সম্ভবত পূর্বে অন্য কোন দেশ পারেনি। সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদনমূলক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার ফলে মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র একটি প্রাধান্যমূলক অবস্থান লাভ করে। কিন্তু ১৯৫০ সালের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন উক্ত প্রাথমিক ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলে। ১৯৪৯ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের সফল পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার পর পারমাণবিক অস্ত্রের মার্কিন একচেটিয়া প্রাধান্য ভেঙ্গে যায়। এরপর সোভিয়েট ইউনিয়ন ১৯৫৩ সালে একটি থার্মোনিউক্লিয়ার বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় যা মার্কিনদের অনুরূপ বিস্ফোরণের একবছর সময়কাল পূর্ণ হবার পূর্বেই ঘটেছিল। এছাড়া ১৯৫৭ সালে মহাকাশে প্রথম মহাকাশযান প্রেরণ করার ক্ষেত্রে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন পাশ্চাত্য জগৎকে চমৎকৃত করে দেয়। এটা ছিল এমন একটি সাফল্য যা তার পারমাণবিক অস্ত্র বহু দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করার ক্ষমতাকেও প্রমাণ করেছিল।

এইরূপে দেখা যায় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন অবশিষ্ট জগতের

প্রশ্ন

১। সর্বপ্রথম কোন দেশ মহাকাশ যান প্রেরণ করে?

২। আণবিক বোমার প্রথম বিস্ফোরণ কত সালে কোন দেশ ঘটিয়েছিল?

উপর সুস্পষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ন্যায় ওইরূপ শক্তিশালী দেশও মার্কিন অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্যের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিও সোভিয়েট অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এর ফলে বিশ্বব্যাপী ক্ষমতা ও শক্তির বণ্টন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের হাতে সংরক্ষিত হতে থাকে।

২.৪.১.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী (Suggested Readings)

1. ডেভিড টমসন— বিশ্ব ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ইউরোপ (অনুবাদ— দীপক মুখোপাধ্যায়)
2. Boyce, Robert — The Origins of World War Two.
3. Churchhill Winston, S. — The Second World War, Vol. VI.
4. Carr, E. H. — International Relations Between Two World Wars.
5. Horowitz, David — From Yalta to Vietnam.
6. Feis, Herbert — Churchill, Roosevelt and Stalin.
7. Feis, Herbert — Between War and Peace — The Potsdam Conference.
8. Deborin, G–Secrets of the Second World War.
9. মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস — প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড।
10. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়—আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস।

২.৪.১.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Probable Questions)

1. How did the Second World War originate ? What were its results ?
   (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিভাবে উদ্ভব ঘটল? এর ফলাফল কি কি?)
2. Explain the diplomatic background of World War II. What were its root causes ?
   (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কূটনৈতিক প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা কর। এর মূল কারণগুলি কি?)
3. Analyse the origin, nature and the results of the Second World War.
   (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তি, প্রকৃতি এবং ফলাফল বিশ্লেষণ কর।)
4. Give a brief history of the road to the Second World War.
   (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথে যাত্রার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা কর।)
5. Explain the events leading to the drift towards World War II.
   (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে প্রবাহিত ঘটনাবলী ব্যাখ্যা কর।)

পর্যায় গ্রন্থ - ২

একক - ২

রুশ বিপ্লব (১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ)

বিন্যাস ক্রম ঃ

২.২.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

২.২.২.১ ঃ রুশ বিপ্লবের প্রেক্ষাপট (১৯১৭ খ্রীঃ)

২.২.২.২ ঃ রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

২.২.২.৩ ঃ রুশ বিপ্লবে লেনিনের ভূমিকা

২.২.২.৪ ঃ পশ্চিম ইউরোপে রুশ বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া

২.২.২.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

২.২.২.৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

২.২.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) রুশ বিপ্লব প্রেক্ষাপট

(২) রাশিয়ায় কিভাবে জারতন্ত্রের অবসানে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটল।

(৩) রুশ বিপ্লবে লেনিনের অবদান

(৪) লেনিনের নয়া অর্থনৈতিক নীতি ও কার্যক্রম

(৫) পশ্চিম ইউরোপে রুশ বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া

২.২.২.১ ঃ রুশ বিপ্লবের প্রেক্ষাপট (১৯১৭ খ্রীঃ)

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্য ও বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা যেমন রাশিয়ার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করে, তেমনি বিশ্ব-বিপ্লবের ইতিহাসে তথা আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রেও নূতন মাত্রা সংযোজন করেছিল। রুশ বিপ্লব ছিল মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিংশ শতকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই বিপ্লব নির্যাতিত ও শোষিত মানুষের কাছে নিয়ে এসেছিল মুক্তির আশ্বাস, ধনতন্ত্র ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রথম বলিষ্ঠ ও সফল প্রতিবাদ। রুশ বিপ্লবের সাফল্য পশ্চিমী পুঁজিবাদী ও ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব নির্যাতিত ও শোষিত মানুষের কাছে নিয়ে এসেছিল মুক্তির আশ্বাস, এবং ধনতন্ত্র ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রথম বলিষ্ঠ ও সফল প্রতিবাদ।

আতঙ্কিত করেছিল। এই বিপ্লবের প্রভাব রাশিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের সাফল্য সারা বিশ্ব জুড়ে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে।

প্রশ্ন ১। বলশেভিক বিপ্লবের সময়কাল নির্ধারণ কর।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশ বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এই বিপ্লবের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। রাশিয়ার জারের স্বৈরতন্ত্রের অবলুপ্তি না ঘটলেও একটি সাংবিধানিক শাসন চালু হয়েছিল। তাছাড়া, এই বিপ্লব সর্বহারা শ্রেণীর বৈপ্লবিক চেতনা ও উদ্যমের একটি বলিষ্ঠ উদাহরণ। তারা এ থেকে রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করেছিল যে, জারতন্ত্রের কাছ থেকে কিছু পাবার নেই, তারা বুঝেছিল যে, পরবর্ত্তী বিপ্লবে তাদেরই নেতৃত্ব দিতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী অপরিহার্য। স্বয়ং লেনিন এই বিপ্লব থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব হচ্ছে পরবর্ত্তী এক বৃহত্তর বিপ্লবের মহড়া মাত্র। এই বিপ্লব না হলে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব সফল হত না।

জারের স্বৈরতন্ত্রের ও পরিবর্তন বিমুখ মানসিকতা, সামাজিক অস্থিরতা, শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর ক্ষোভ রাশিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে চলছিল। তা সত্ত্বেও বিপ্লব বিলম্বিত হয়েছিল কারণ রাশিয়ায় বুর্জোয়া শ্রেণীর কার্যত কোন অস্তিত্ব ছিল না।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রাশিয়ায় পরপর দুটি বিপ্লব একই সঙ্গে সংগঠিত হয়েছিল। মার্চ মাসের বিপ্লবে জারতন্ত্রের অবসান ঘটলো। রাশিয়ায় প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হলো। এই প্রজাতন্ত্রের আয়ু ছিল স্বল্প। ঐ বছরের নভেম্বরে প্রজাতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে লেনিন বলশেভিক দলের নেতৃত্বে পৃথিবীতে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সূচনা করলেন। মার্কসের তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ ও উত্তরণ ঘটলো লেনিনের হাতে।

বিপ্লবের উৎস নিহিত রয়েছে রাশিয়ার ঊনিশ শতকের ইতিহাসের মধ্যে। জারের স্বৈরতন্ত্র ও পরিবর্ত্তনবিমুখ মানসিকতা, সামাজিক অস্থিরতা, শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর ক্ষোভ, বিপ্লবমনস্কতা অর্থাৎ একটি বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য যা যা আবশ্যকীয় শর্ত, সব কিছুই রাশিয়ায় দীর্ঘদিন ধরেই ছিল, তা সত্বেও রাশিয়ার বিপ্লব বিলম্বিত হয়েছিল কারণ রাশিয়ায় বুর্জোয়া শ্রেণীর কার্যত কোন অস্তিত্ব ছিল না। ঊনিশ শতকের শেষ পর্বে রাশিয়ায় যে শিল্প প্রয়াস দেখা দিয়েছিল, বা রাশিয়ায় যে পুঁজির বিকাশ ঘটেছিল, তার পিছনে ছিল সরকারী উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতা। পুঁজি এসেছিল বিদেশ থেকে। পশ্চিমী ভাবধারার অনুপ্রবেশের ফলে বা পশ্চিমী শিক্ষার সংস্পর্শে এসে রাশিয়ায় যে বিত্তশালী সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল, তার সঙ্গে রাশিয়ার সাধারণ মানুষ, বিশেষত কৃষকদের কোন আত্মিক যোগ ছিল না, কৃষকরা তাদের আপনজন বলে মনে করতে পারে নি। আন্তরিকতা সত্বেও তাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

উনিশ শতকের শেষ তিন দশকে রাশিয়ায় শিল্পবিপ্লব ঘটেছিল এবং এর ফলে বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছিল। কিন্তু বিদেশী পুঁজি ও প্রযুক্তিবিদদের উপর নির্ভরশীল এই পুঁজিপতি শ্রেণী জারতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল ছিল। জারতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার কোন মানসিকতা তাদের ছিল না। বিংশ শতকের গোড়ায় অবশ্য জারতন্ত্রের অপদার্থতা ও দুর্নীতি এবং শান্তিশৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে ব্যর্থতা তাদের বিরোধী করেছিল। শিল্প বিপ্লবের কুফলস্বরূপ তারা যে নারকীয় জীবন যাপন করতো, তা তাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছিল। দুটি

প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাদের চেতনার সঞ্চার হয়েছিল। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব ও ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের প্যারী কমিউনের ঘটনার সঙ্গে তারা পরিচিত ছিল। এছাড়া কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস্ এর তত্ত্ব সম্পর্কে তারা অবহিত ছিল। অন্যদিকে তারা লক্ষ্য করেছিল যে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীর যে উদারনৈতিক ঐতিহ্য ও সরকারের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর দাবী পূরণের সুযোগ ছিল, রাশিয়ায় তা ছিল না। অর্থাৎ সংসদীয় আইনের মাধ্যমে তাদের ক্ষোভ ও অসন্তোষের প্রতিবিধান করা সম্ভব ছিল না। তারা উপলব্ধি করেছিল একমাত্র বৈপ্লবিক পথেই বা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তা করতে হবে।

প্রশ্ন

১। রুশ বিপ্লব সংগঠনে বিলম্ব হয়েছিল কেন?

২। ১৯ শতকের শেষার্ধে পুঁজিপতিশ্রেণী জারতন্ত্রের বিরোধীতা করেনি কেন?

রুশ বিপ্লবের প্রধান কর্তব্য ছিল জারের স্বৈরতন্ত্রের অচলায়তন ভাঙা। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব তাকে পর্যুদস্ত করতে পারেনি। কিন্তু উনিশ শতকের শেষে যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অসাধারণ উন্নতি মানুষের জীবনযাত্রার ধারা ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করছিল, তখন স্বৈরতন্ত্র ক্রমশঃ তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলছিল। বলা যেতে পারে, আধুনিক যুগের দাবী মেটাতে না পারার জন্যই রুশ বিপ্লব একপ্রকার অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। রাশিয়ার জনগন দুর্নীতিপরায়ন জারতন্ত্রের উপর বিরক্ত হয়ে এ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হিসেবে বিপ্লবকে বেছে নিল।

জার নিকোলাস ছিলেন অযোগ্য। তিনি স্ত্রীর বশীভূত ছিলেন এবং তার কথাতেই চলতেন। অন্য দিকে রাণী চলতেন রাসপুটিন নামে এক ভণ্ড সন্যাসীর কথায়।

তবে সামগ্রিকভাবে জারতন্ত্রে দুর্বলতা, অপদার্থতা, দুর্নীতি ও সর্বোপরি স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেও ব্যক্তিগতভাবে শেষ জার দ্বিতীয় নিকোলাস রুশ বিপ্লবের জন্য দায়ী ছিলেন বলে Christopher Hill মন্তব্য করেছেন। জার নিকোলাস ছিলেন অযোগ্য। তিনি স্ত্রীর বশীভূত ছিলেন এবং তাঁর কথাতেই চলতেন। অন্যদিকে রাণী চলতেন রাসপুটিন নামে এক ভন্ড সন্ন্যাসীর কথায়। রাসপুটিন ছিলেন দুর্নীতিপরায়ণ। রাসপুটিনের কথায় মন্ত্রীরা নিযুক্ত অথবা পদচ্যুত হতেন। মন্ত্রীদের এত ঘন ঘন পরিবর্তন করা হতো যে তাতে প্রশাসনের উন্নতির পরিবর্তে অবনতি হত। যুদ্ধ ও অভ্যন্তরীণ সংকটের সময় ঘন ঘন এই পরিবর্তন কাম্য ছিল না। এই অবস্থায় জারতন্ত্রের পতন অস্বাভাবিক ছিল না। ১৯০৫ খ্রীঃ বিপ্লবীদের মধ্যে অনৈক্য ও বিদেশী সাহায্য তাঁকে বাঁচিয়ে রাখলেও ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবে তাঁর পতন হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার অংশগ্রহণ ও জার্মানীর হাতে পরাজয় রুশ বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল। পূর্ণ প্রস্তুতি ছাড়া রাশিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। যোগ্য সেনানায়কের অভাব, সীমান্তে যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদপ্তরের কোন বোঝাপড়া না থাকা, রাণী আলেকজান্দ্রা ও রাসপুটিন কর্তৃক ঘনঘন মন্ত্রী পরিবর্তন করা, ডুমাকে অগ্রাহ্য করা এবং যুদ্ধের চাপে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। যুদ্ধ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য যখন ইংল্যান্ড ও জার্মানী অর্থনীতিতে ব্যাপকহারে সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করে, তখন রুশ সরকার আধা সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও আধা ব্যক্তিগত উদ্যোগ নীতি অনুসরণ করে। দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় ও সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয়। বিশেষত খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের ক্ষেত্রে। এই অর্থনৈতিক সংকট গভীর ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি করে, যা বিপ্লবের পথে ইন্ধন যোগায়। অর্থনৈতিক সংকটের ফলে দেশে ব্যাপকহারে দাঙ্গা হাঙ্গামা,

বিক্ষোভ, সমাবেশ, ধর্মঘট ইত্যাদি দেখা দেয়। আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। সব মিলিয়ে জারতন্ত্র জনগণের কাছে এত হেয় প্রতিপন্ন হয় যে, ডুমার পক্ষে বিপ্লবে নেতৃত্ব দান করা বা জারকে ক্ষমতাচ্যুত করা কোন অসম্ভব ব্যাপার ছিল না।

প্রশ্ন

১। রাশিয়ার শেষ জার কে ছিলেন ?

২। রাশিয়ার জনগণ জারতন্ত্রের উপর ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন কেন?

১৯১৬ খ্রীঃ এর শেষে ও ১৯১৭ খ্রীঃ এর গোড়ায় পরিস্থিতি ছিল অগ্নিগর্ভ। প্রতিটি মানুষ এমনকি রুশ সেনাবাহিনীর সৈনিকরাও মনে করেছিল যে, বিপ্লব আসন্ন। যুদ্ধে বিপর্যয়ের ফলে সরকারের প্রতি জনগনের আস্থা চলে গিয়েছিল। ভয়াবহ খাদ্য সংকটের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, শ্রমিক অসন্তোষ ছিল তীব্র। ১৯০৫ খ্রীঃ রক্তাক্ত রবিবারের দ্বাদশ বার্ষিকীর স্মরণে দেড় লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করে। ১১ই মার্চ শহরের পথে পথে খণ্ডযুদ্ধ হয়। সেনাবাহিনীও ১২ই মার্চ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। জেলখানা ভেঙ্গে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করা হয়। মন্ত্রীদের আটক করা হয়। জার ডুমাকে বরখাস্ত করেন। ১২ই মার্চ বিপ্লবী জনতা পেট্রোগ্রাড শহর দখল করে। এইভাবে ১৯১৭ খ্রীঃ মার্চ মাসে রুশ বিপ্লব শুরু হয়। জার ডুমাকে বরখাস্ত করলেও এর সদস্যরা তা মানতে অস্বীকার করে এবং এদের দশজন সদস্য ১৫ই মার্চ একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে। জার তাঁর ভাই গ্রান্ড ডিউক মিখাইলের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন, কিন্তু তাঁর ভাই জারপদের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করলে জারতন্ত্রের পতন হয় এবং এর সঙ্গে সঙ্গে রুশ বিপ্লবের প্রথম পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

১৯০৫ খ্রীঃ রক্তাক্ত রবিবারের দ্বাদশ বার্ষিকীর স্মরণে দেড় লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করে। ১১ই মার্চ শহরের পথে পথে খণ্ডযুদ্ধ হয়। ১২ই মার্চ সেনা বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

প্রশ্ন

১। ডুমা কে ছিলেন?

২। রুশ বিপ্লব কালে জার কার অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন?

২.২.২.২ ঃ রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

জারতন্ত্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই রুশ বিপ্লবের পরিসমাপ্তি ঘটেনি। রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক চেতনা ও কৃষকদের উৎসাহ ছিল দুর্দমনীয়। অন্তবর্তী সরকারের ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হয়নি। এই ফাঁক পূর্ণ করেছিল সোভিয়েট। সোভিয়েট বলতে বোঝায় কাউন্সিল বা পরিষদ, যার সদস্যদের নির্বাচিত করত শ্রমিক শ্রেণী বা সেনা বা কৃষকরা। প্রথমদিকে অন্তবর্ত্তী সরকার ও সোভিয়েটের মধ্যে বোঝাপড়া ছিল। নূতন সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের ক্ষমা, বৈষম্যমূলক আইনের বিলোপ, আট ঘন্টা কাজের সময়, সংবিধান সভার নির্বাচন প্রভৃতি কয়েকটি প্রগতিশীল সংস্কার কার্যকরী করেছিল। সোভিয়েট এই সব সংস্কার সমর্থন করলেও উভয়ের মধ্যে ঐক্য ও সহাবস্থান সম্ভব ছিল না। বুর্জোয়া শ্রেণীর লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক বিপ্লব। তারা চেয়েছিল জারের ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়ে তাদের হাতে আসুক এবং ফ্রান্স বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত রাশিয়া একটি সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্রে উন্নীত হোক বা ইংল্যান্ডের মত

রাশিয়াতেও একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক, কিন্তু সাধারণ মানুষ তথা শ্রমিক শ্রেণীর লক্ষ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। তারা জারের স্বৈরতন্ত্রের পরিবর্তে বুর্জোয়া স্বৈরতন্ত্র চায় নি।

১৯১৭ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে লেনিন দেশে ফিরে আসেন এবং সেই সঙ্গে শুরু হয় রুশ বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্ব। লেনিন তাঁর বিখ্যাত 'এপ্রিল থিসিস' পেশ করেন। এতে বলা হয় যে, বিপ্লবের প্রথম পর্বে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে বুর্জোয়াদের কাছে। দ্বিতীয় পর্বে সেই ক্ষমতা দখল করবে দরিদ্র শ্রমজীবী ও কৃষক সম্প্রদায়। অন্তবর্ত্তী সরকার ও সোভিয়েট পরস্পর পরস্পরের মিত্র নয় কারণ উভয়ের শ্রেণীগত চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি মন্তব্য করেন, অন্তবর্ত্তী সরকারকে সমর্থন করার প্রয়োজন নেই। সংসদীয় প্রজাতন্ত্রের অবলুপ্তি কাম্য। সোভিয়েটের হাত শক্ত করা এবং সোভিয়েট বলশেভিকদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। জমি ও ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ করতে হবে। উৎপাদন ব্যবস্থা ও বন্টনের দায়িত্ব থাকবে সোভিয়েটের হাতে।

১৯১৭ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে লেনিন দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে রুশ বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। তাঁর নেতৃত্বে নভেম্বর মাসে বিপ্লবী ফৌজ ও লাল রক্ষী বাহিনী প্রায় বিনা রক্তপাতে অন্তর্বর্ত্তী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে।

বলশেভিকরা এই আন্দোলন সম্পর্কে প্রথমে নিস্পৃহ থাকলেও পরে নেতৃত্ব দেয়। ১৯১৭ খ্রীঃ নভেম্বরে বিপ্লবী ফৌজ ও লাল রক্ষী বাহিনী প্রায় বিনা রক্তপাতে অন্তবর্ত্তী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে। কেরেনেস্কি পালিয়ে যান। উল্লেখ্য, 'এপ্রিল তত্ত্বে' লেনিন তাঁর দীর্ঘকালীন লক্ষ্য হিসেবে চেয়েছিলেন বুর্জোয়া বিপ্লবকে সর্বহারা বিপ্লবে রুপান্তরিত করতে। অন্তবর্ত্তী সরকারের পতন ঘটিয়ে এই লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হতে হবে বলে তিনি মনে করতেন।

প্রশ্ন

১। 'এপ্রিল তত্ত্ব' কি?

২। সোভিয়েত বলতে কি বোঝায়?

ক্ষমতা দখল ছিল বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ, বিপ্লবের কাজ সম্পূর্ণ করে রাশিয়াকে একটি সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে উত্তীর্ণ করতে হলে একদিকে প্রয়োজন ছিল জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ মিটিয়ে নেওয়া, অন্যদিকে তেমনি গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে মার্কসবাদকে কার্যে রূপায়িত করে সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট একটি সমাজতান্ত্রিক আদর্শ তুলে ধরাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। এই গুরুদায়িত্ব পালন করার মত বলিষ্ঠ নেতৃত্ব লেনিনের ছিল, ক্ষমতা দখল করার পর তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলিকে ধ্বংস করে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রী বিপ্লব সফল করতে। এরজন্য প্রয়োজন ছিল শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। এই নীতি অনুসরণ করে তিনি ১৯১৮ খ্রীঃ জার্মানীর সঙ্গে অত্যন্ত কঠোর শর্তে অপমানজনক ব্রেষ্ট লিটোভস্কের চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই সঙ্গে তিনি নজর দেন ভূমি সংস্কারের কাজে। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদার ও চার্চের সমস্ত জমি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির জাতীয়করণ করা হয়। এরপর স্থানীয় সোভিয়েটের মাধ্যমে এইসব জমি কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হয়। জমিতে বেগার খাটানো ও জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ হয়। বিনা ক্ষতিপূরণে কলকারখানা ও রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। বলাবাহুল্য, বিনা বাধায় বিপ্লবের কাজ সফল হয়নি। জমিদার, যাজক শ্রেণী ও অন্যান্য বিত্তশালী মানুষের পৃষ্ঠপোষক প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলি সক্রিয় ছিল। লেনিন এই সব সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রুশ জনগন পেয়েছিল মুক্তির আস্বাদ। কিন্তু এরপরও বিপ্লবের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। কারণ দেশ তখন ছিল এক চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে। যুদ্ধ

লেনিন কেবল রাজনৈতিক নেতাই ছিলেন না; মূলত মার্কসবাদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ ও চিন্তাধারা ছিল।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। কৃষি, শিল্প এর হাত থেকে রেহাই পায়নি। মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ভয়াবহ, মজুরি বাড়ানো হলেও জিনিসপত্রের দাম যে হারে বাড়ছিল, তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই অবস্থায় স্বল্পকালীন মেয়াদে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতিতে অর্থনীতির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ কঠোর করা হয়। ব্যক্তিগত বাণিজ্য নিষিদ্ধ হয়। লেনিন উপলব্ধি করেছিলেন যে, বিপ্লবকে সফল করতে হলে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হবে এবং শ্রমিক কৃষকের আনুগত্য ও সমর্থন নিশ্চিত করতে হবে। এই অবস্থায় লেনিন তাঁর নূতন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এই পরিকল্পনা হল নূতন অর্থনৈতিক নীতি or New Economic Policy এই নীতি অনুসারে ছোট ছোট জমির মালিক ও ব্যবসায়ীদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয়, কৃষকরা তাদের ক্ষেতের ফসল বাজার দরে বিক্রয় করার সুযোগ পায়, গ্রামে সমবায় প্রথা উৎসাহিত হয়। ছোট শিল্প মালিকদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বিদেশ থেকে মূলধন এনে শিল্প প্রসারের নীতি গ্রহণ করা হয়। শিল্পে কঠোর সরকারী গতি পরিত্যক্ত হয়। এই নীতির ফলে রাশিয়ার কৃষি ও শিল্পের দ্রুত উন্নতি হয়। উল্লেখ্য যে, এই নীতি মার্কসবাদের পরিপন্থী বা মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতি হলেও পরিস্থিতির বাস্তবতা বিবেচনা করে লেনিন এই বিচ্যুতি মেনে নিয়েছিলেন। লেনিন কেবল রাজনৈতিক নেতাই ছিলেন না; মূলত মার্কসবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ ও চিন্তাধারা ছিল। ১৯০২ খ্রীঃ প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত 'What is to be Done?' গ্রন্থে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের পক্ষে সামগ্রিক সমাজচেতনা ও সংকীর্ণতামুক্ত গণভিত্তির প্রয়োজন সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল। এছাড়া তাঁর State and Revolutions, April Thesis, Imperialism – the Highest stage of Capitalism প্রভৃতি অসংখ্য লেখার মধ্যে তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ ও চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে। বিপ্লবের ফলে কি পরিবর্ত্তন হয়েছে, তা বোঝাতে গিয়ে লেনিন উল্লেখ করেছেন, 'রাষ্ট্র ক্ষমতা ব্যবহৃত হয় সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার জন্য, জারের আমলে তা ব্যবহার করা হত তাদের বিরুদ্ধে'। লেনিনের মৃত্যুর পর আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল (৩০ শে জানুয়ারী, ১৯২৪ খ্রীঃ) -- "আজ রাশিয়ার বন্ধনমুক্ত প্রজাগণ আর নিজভূমে পরবাসী' হইয়া নাই, তাহাদের সংসারে শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে, আজ তাহারা 'মানুষ' হইবার সমস্ত সুযোগ পাইয়াছে।"

প্রশ্ন

১। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য লেনিন কোন পন্থা অবলম্বন করেছিলেন?
২। লেনিনের একটি বইয়ের নাম লেখ।
৩। ব্রেষ্ট লিটোভস্কের সন্ধি কত সালে সাক্ষরিত হয়?

১৯১৮ খ্রীঃ যে অস্থায়ী সংবিধান দ্বারা রুশদেশ শাসনের ব্যবস্থা করা হয়, তা ১৯২৪ খ্রীঃ বাতিল করা হয়। ১৯২৪ খ্রীঃ রাশিয়ায় একটি অস্থায়ী সংবিধান গৃহীত হয়। এই সংবিধানে রাশিয়াকে সংযুক্ত সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র (United Soviet Socialist Republic or U.S.S.R) বলে ঘোষণা করা হয়। এই সংযুক্ত প্রজাতন্ত্রে অঙ্গরাজ্যগুলি হল ইউক্রেইন, শ্বেত রাশিয়া, ট্রান্স ককেশিয়া, তুর্কমেন, উজবেগ, তাজিক। ১৯৩৬ খ্রীঃ এই অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা হয় এগারটি। দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা ৪টি সংস্থার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। এগুলি হল (ক) সোভিয়েতগুলি, (খ) C.P.S.U. অথবা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি, (গ) গুপ্ত পুলিশ এবং (ঘ) সেনাদল। দেশের শাসন ক্ষমতা সোভিয়েতগুলির হাতে রাখা হয়। জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে সোভিয়েতগুলি কাজ করে।

সোভিয়েত গঠনের জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। প্রতি গ্রামে একটি করে গ্রাম সভা বা গ্রামবাসীদের দ্বারা সোভিয়েত নির্বাচিত হবে। গ্রাম সোভিয়েতগুলির সদস্যরা আঞ্চলিক সোভিয়েতের সদস্যদের নির্বাচন করবে। আঞ্চলিক সোভিয়েতগুলি প্রাদেশিক সোভিয়েতের সদস্যদের নির্বাচন করবে। প্রাদেশিক সোভিয়েতগুলি প্রজাতন্ত্রের সোভিয়েত সদস্যদের নির্বাচন করবে। প্রজাতন্ত্রের সদস্যরা কেন্দ্রীয় সোভিয়েত বা ইউনিয়ন সোভিয়েতের সদস্যদের নির্বাচন করবে। ইউনিয়ন সোভিয়েত বা কেন্দ্রীয় সোভিয়েতের সদস্য সংখ্যা হবে দুই হাজার এবং দুই বছর অন্তর এর অধিবেশন বসবে। ইউনিয়ন সোভিয়েত কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকর্ত্তাদের বা সুপ্রিম সোভিয়েতের সদস্যদের নির্বাচন করবে। সুপ্রিম সোভিয়েতের তরফে একটি মন্ত্রীসভা দেশের শাসনকার্য চালাবে, স্বয়ং লেনিন হলেন এই মন্ত্রীসভার প্রধান।

রুশ সংবিধানে সোভিয়েতগুলিই শাসনব্যবস্থার 'বৈধ সংস্থা হলেও কার্যতঃ C.P.S.U. বা রাশিয়ার কমিউনিস্ট দলই ক্ষমতার আসল অধিকারী ছিল। C.P.S.U. বা রুশ কমিউনিস্ট দল ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিল না। সোভিয়েত গঠনের অনুসরণে রুশ কমিউনিস্ট দলকে গঠন করা হয়, গ্রাম থেকে জেলা, প্রদেশ স্তর থেকে কেন্দ্রীয় স্তর পর্যন্ত গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় পার্টি কংগ্রেসের তিন হাজার সদস্য দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের নির্বাচন করত। কেন্দ্রীয় কমিটির অন্তর্ভুক্ত ছিল পলিটব্যুরো। এই পলিটব্যুরোর সদস্যরাই ছিলেন আসল ক্ষমতার মালিক, এরা যে নীতি নির্দ্ধারণ করতেন তা সরকার কার্যকরী করত। পলিটব্যুরোর সম্পাদক ছিলেন খুবই ক্ষমতাশালী।

প্রশ্ন

১। সোভিয়েত গঠনের জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

২.২.২.৩ ঃ রুশ বিপ্লবে লেনিনের ভূমিকা

রুশ বিপ্লবে লেনিনের ভূমিকার মূল্যায়ণ প্রসঙ্গে খ্রিস্টোফার হিল মন্তব্য করেন 'The Russian Revolution was Lenin's revolution'. একথা ঠিক, লেনিন এক সংকটজনক মুহূর্তে স্টালিন ও ট্রটস্কির মত অত্যন্ত যোগ্য ও দক্ষ শিষ্যকে নিয়ে নিজের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে বিপ্লবকে সফল করেছিলেন। বাস্তবিকই রুশ বিপ্লবের প্রাণপুরুষ ছিলেন লেনিন। অবশ্য লেনিনের উত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল রাশিয়ার বিগত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস। বলশেভিক বিপ্লব ছিল আগেকার বিভিন্ন আন্দোলন ও রাশিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পরিণতি। তিনি নিজেই বলেছেন, ১৯০৫ খ্রীঃ বিপ্লব ছিল ১৯১৭ খ্রীঃ বিপ্লবের মহড়া। তবে ইতিহাস কর্ত্তৃক গঠিত হলেও ইতিহাসের স্রোতে তিনি ভাসেন নি বা শুধু ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াই তার উত্থান সম্ভব করে নি। E.H. Carr বলেছেন যে, লেনিন মহতের মধ্যে মহীয়ান এই কারণে যে, শুধু পূর্ব নিয়ন্ত্রিত শক্তির তরঙ্গে ভাসমান থেকে তিনি মহত্বে উত্তীর্ণ হন নি। ইতিহাসের সৃষ্টি হলেও তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই পৃথিবীতে স্থাপিত হয়েছিল প্রথম সাম্যবাদী সরকার।

*'এপ্রিল তত্ত্বে' লেনিন ঘোষণা করেন বুর্জোয়া বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটেছে, তাই এখনই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। তা জন্য তিনি আওয়াজ তোলেন— **'All power to the Soviets'**।*

বিপ্লবের এক চরম মুহূর্তে ১৯১৭ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে লেনিন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এর আগে জারতন্ত্রের অবসান হয়েছিল এবং প্রজাতন্ত্রী শাসন কাঠামোয় বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতা দখল করে এক অন্তর্বর্ত্তী সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল, কিন্তু রাশিয়ার পুঁজিপতি শ্রেণী ছিল দুর্বল ও অনগ্রসর। অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণী ছিল সুসংগঠিত ও সচেতন। জারতন্ত্রের পতনের পর কেরেনেস্কির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত অন্তর্বর্ত্তী সরকারের ভিত্তি ছিল দুর্বল। এই অস্থায়ী সরকার দুটি পরস্পর বিরোধী আদর্শ্য ও চিন্তার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছিল, উদারনৈতিক বুর্জোয়া শ্রেণী ও নরমপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী দল ও গোষ্ঠী চেয়েছিল একটি গণতান্ত্রিক সংসদীয় সরকার গঠন করে সাংবিধানিক শাসনতন্ত্রের ছত্রছায়ায় শাসনকার্য পরিচালনা করতে। কিন্তু পেট্রোগার্ডের শ্রমিক সোভিয়েট ও বিদ্রোহী সামরিক নেতারা ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিল। এরা চেয়েছিল যুদ্ধ মিটিয়ে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে আর্থিক প্রগতি সুনিশ্চিত করতে। যুদ্ধে জার্মানীর হাতে বিপর্যয় রাশিয়ার সমস্যাকে জটিলতর করেছিল। এই অবস্থায় লেনিন তাঁর বিখ্যাত 'এপ্রিল তত্ত্ব' পেশ করে বলেন, বিপ্লব সফল করার জন্য প্রয়োজন পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন, অস্থায়ী সরকারের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে সোভিয়েটগুলিকে শক্তিশালী করে তোলা, এবং তার জন্য সোভিয়েটগুলির উপর বলশেভিক কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ করা। তিনি বলেন, সংসদীয় প্রজাতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে জমি ও ব্যাংকের জাতীয়করণ করতে হবে, উৎপাদন ও বন্টনের দায়িত্ব নিতে হবে সোভিয়েটগুলিকে। লেনিনের 'এপ্রিল তত্ত্বে'র বক্তব্যের মূল কথা হল বুর্জোয়া বিপ্লবের সমাপ্তি ঘটেছে, তাই এখনই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে এবং তার জন্য তিনি আওয়াজ তোলেন -- 'All power to the Soviets' । তাঁর অপর স্লোগান হ'ল 'শান্তি, রুটি ও জমি'। লেনিনের পরিকল্পনা ছিল তিনটি (ক) জার্মানীর সঙ্গে শান্তি স্থাপন, (খ) কৃষকদের মধ্যে জমি বিতরণ এবং (গ) সোভিয়েটগুলির হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রদান। শেষ পর্যন্ত লেনিন বলপ্রয়োগ করে অন্তর্বর্ত্তী সরকারকে উৎখাত করে রুশ বিপ্লব সম্পূর্ণ করেন।

বিপ্লবের কাজ সম্পূর্ণ করে রাশিয়াকে একটি সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে উন্নীত করার জন্য প্রয়োজন ছিল একদিকে যেমন জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ মিটিয়ে নেওয়া, অন্যদিকে তেমনি গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে মার্কসবাদকে কার্যে রূপায়িত করে সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে একটি সমাজতান্ত্রিক আদর্শ তুলে ধরা, ক্ষমতা দখলের পর লেনিনের প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলিকে ধ্বংস করে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রী বিপ্লব সফল করা। এরজন্য প্রয়োজন ছিল শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। এই কারণে তিনি ১৯১৮ খ্রীঃ জার্মানীর সঙ্গে কঠোর শর্তে ব্রেষ্ট লিটোভস্কের চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই সঙ্গে ভূমি সংস্কারের কাজে নজর দেন। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদার ও চার্চের সমস্ত জমি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির জাতীয়করণ করা হয়। এরপর স্থানীয় সোভিয়েট মারফৎ এইসব জমি কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হয়। বিনা ক্ষতিপূরণে কলকারখানাও রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। এই সঙ্গে জমিদার, যাজক শ্রেণী ও অন্যান্য বিত্তশালী মানুষের পৃষ্ঠপোষক প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলিকে দমন করেন। ক্ষমতা দখল করার পর বলশেভিক দল লক্ষ্য করেছিল যে দেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে বিপর্যস্ত, যুদ্ধ দেশের অর্থনীতিকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কৃষি, শিল্প এ থেকে রেহাই পায় নি। মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ভয়াবহ। মজুরি বাড়নো হলেও জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে শ্রমিক ও বিশেষভাবে কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, লেনিন বুঝেছিলেন বিপ্লব সফল করার জন্য অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং শ্রমিক-কৃষকদের আনুগত্য ও সমর্থন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই অবস্থায় লেনিন তাঁর নূতন অর্থনৈতিক নীতি বা New Economic Policy ঘোষণা করেন। এই নীতি অনুসারে ছোট ছোট জমির মালিক ও ব্যবসায়ীদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কৃষকরা তাদের ক্ষেত্রে ফসল বিক্রি করার সুযোগ পায়। গ্রামে সমবায় প্রথা উৎসাহিত হয়। ছোট শিল্প মালিকদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বিদেশ থেকে মূলধন এনে শিল্প প্রসারের নীতি গ্রহণ করা হয়। শিল্পে কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রণ নীতি পরিত্যক্ত হয়। এরফলে রাশিয়ায় কৃষি ও শিল্পের দ্রুত উন্নতি হয়। লেনিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকের কাছে আত্মসমর্পণ করেন,

সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে সরকারী নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ণ ছিল। নূতন এই নীতির ফলে কৃষকরা শ্রমিকদের তুলনায় বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। তাঁর নীতি ছিল মার্কসবাদের পরিপন্থী।

মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন বলে লেনিন মনে করেন না। বিশেষ বাস্তব পরিস্থিতির তাগিদে তিনি বিশেষ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মানবদরদী, জারতন্ত্রকে তিনি ঘৃণা করতেন তার অত্যাচার ও শোষণের জন্য। মানবিক মন নিয়েই তিনি এই শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। ঐতিহাসিক C.H. Hill মন্তব্য করেছেন -- 'Lenin symbolizes the Russian Revolution as a movement of the poor and oppressed of the earth who have successfully risen against the great and the powerful.'

প্রশ্ন

১। লেনিন কি মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন?

২.২.২.৪ ঃ পশ্চিম ইউরোপে রুশ বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া

রুশ বিপ্লব শুধু রাশিয়ার ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে স্বীকৃত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেই পৃথিবীতে প্রথম সফল হ'ল সমাজতন্ত্রী আন্দোলন -- জন্ম নিল পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

এই বিপ্লব ঘটার কথা ছিল পূর্ণ বিকশিত কোন এক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, কিন্তু সেখানে তা না ঘটে রাশিয়ার মত একটি অনগ্রসর দেশে ঘটল, যেখানে পুঁজিবাদ ও শিল্পবিপ্লবের বিকাশ হয়েছিল সব শেষে। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির তুলনায় রাশিয়ার পুঁজিপতি শ্রেণী ছিল অনেক পিছিয়ে। ক্ষমতা ধরে রাখার মত অর্থনৈতিক শক্তি, রাজনৈতিক পরিপক্কতা বা সংহতিবোধ কিছুই তার ছিল না, অপরদিকে সর্বহারা শ্রেণীর সাহায্য নিয়ে বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পূর্ণ করাও ছিল অবাস্তব একটি পরিকল্পনা। এই অবস্থায় লেনিন একই সঙ্গে বুর্জোয়া বিপ্লবের অবসান ঘটিয়ে ও বলশেভিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়ে রাশিয়ার ইতিহাসের গতি অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের দৃঢ় ভিত্তির উপর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যে বনিয়াদ গড়ার কথা মার্কস বলেছিলেন, এক্ষেত্রে তার কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটেছিল। লেনিন সমাজবাদ গড়েছিলেন অর্থনীতি ও রাজনীতিতে পিছিয়ে থাকা একটি দেশে। এই প্রচেষ্টা সফল হত যদি একই সঙ্গে অন্যান্য দেশেও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হ'ত বা অন্যান্য দেশের শ্রমিকরা ও পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করতো। রুশ বিপ্লবের এই সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতার কথা E.H. Carr উল্লেখ করেছেন।

মিত্রশক্তি সদ্য প্রতিষ্ঠিত ও সাম্যবাদী বলশেভিক সরকারকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। বৈদেশিক শক্তিবর্গ সম্মিলিত ভাবে বলশেভিক শাসনকে উচ্ছেদ করার জন্য অগ্রসর হয় এবং রাশিয়ার অভ্যন্তরে অভিযান চালায়।

রুশ বিপ্লবের ঢেউ পশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে নি। তবে পূর্ব ইউরোপ, এশিয়া এবং এমনকি পরবর্ত্তীকালে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের মানুষ রাশিয়ার সাফল্যে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অভ্যুদয় পুঁজিবাদী জগতের কাছে বিপজ্জনক মনে হল। জার্মানীর

সঙ্গে রাশিয়া মৈত্রী স্থাপন করায় পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। মিত্রশক্তি সদ্য প্রতিষ্ঠিত সাম্যবাদী বলশেভিক সরকারকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে, সম্মিলিতভাবে বৈদেশিক শক্তিবর্গ বলশেভিক শাসনকে উচ্ছেদ করার জন্য অগ্রসর হয় এবং রাশিয়ার ভেতরে অভিযান চালায়। ব্রিটিশ সেনাবাহনী ককেসাস ও ফরাসী সৈন্যবাহিনী দক্ষিণ রাশিয়ার ভূখন্ড দখল করে নেয়। সেই সঙ্গে ১৯২০ খ্রীঃ ফ্রান্স, পোলান্ডকে রাশিয়া আক্রমণে ও ইউক্রেনে গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত করতে উৎসাহিত করে। ১৯২১ খ্রীঃ নাগাদ পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ উপলব্ধি করে যে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বলশেভিক রাশিয়াকে উৎখাত করা অসম্ভব। অন্যদিকে ইউরোপের অন্যত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের স্বপ্ন ব্যর্থ হল। বলা যেতে পারে, রাশিয়ায় যে পরিস্থিতি ও আর্য-সামাজিক অবস্থায় বিপ্লব সাফল্যলাভ করেছিল, অন্যত্র সেরকম পরিস্থিতি ছিল না। এছাড়া যুদ্ধের অবসানে বিজয়ী পাশ্চাত্য শক্তি আন্তর্জাতিক স্থায়িত্ব ও ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে নূতন রাষ্ট্রিক বিন্যাস সাধন করে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে লেনিনের নূতন অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ায় বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়ন করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হয় ১৯২১ খ্রীঃ ইঙ্গ রুশ বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন। ১৯২১ খ্রীঃ গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলি রাশিয়ার সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট হয়। যদিও লোকার্নো চুক্তি (১৯২৫ খ্রীঃ) -র ফলে রাশিয়া অসন্তুষ্ট হয়েছিল, রাশিয়া নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন সম্মেলনে-ও অংশ গ্রহণ করতে থাকে। ১৯২৬ খ্রীঃ রাশিয়া লীগ কাউন্সিল কর্ত্তৃক গঠিত নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত প্রস্তুতি কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হয়। ১৯২৭-২৮ খ্রীঃ জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে সোভিয়েত রাশিয়া যোগদান করে, এই সম্মেলনে সোভিয়েত রাশিয়া স্থল, নেট ও বিমানবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র অবিলম্বে ক্রমান্বয়িক হারে সংকোচন করার প্রস্তাব পেশ করে। কিন্তু এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নি, ১৯৩২ খ্রীঃ লীগ কাউন্সিলের উদ্যোগে জেনেভায় প্রথম বিশ্ব-নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনেও রাশিয়া বিশেষ ভূমিকা নেয়, সোভিয়েত প্রতিনিধি সমস্ত রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি সমানুপাতিক হারে হ্রাস করার প্রস্তাব রাখেন। নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৩২ খ্রীঃ পোলান্ড, এস্টোনিয়া, লাটভিয়া, ফিনল্যান্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সোভিয়েত ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দেয়। এই পর্যায়ে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রতিবিপ্লবী শক্তির দাপট শেষ হয় এবং পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

প্রশ্ন

১। লোকার্নচুক্তি কত সালে স্থাপিত হয়?
২। ১৯২৭ খ্রীঃ আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে রাশিয়া কি প্রস্তাব দিয়েছিল?
৩। কিভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ইউরোপীয় শক্তিগুলির সদ্ভাব গড়ে উঠেছিল?

২.২.২.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) E.H. Carr — *The Russian Revolution from Lenin to Stalin.*

(২) Kochan Lionel — *The Making of Modern Russia.*

(৩) Joll James — *Europe since 1870.*

(৪) Eric Hobsbawm — *The Age of Empire.*

(৫) সমর কুমার মল্লিক — *নবরূপে ইউরোপ, ১৮৪৮-১৯১৯।*

(৬) প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় — *আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস।*

২.২.২.৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ কর।

(২) রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় লেনিনের ভূমিকার মূল্যায়ণ কর।

(৩) পশ্চিম ইউরোপে রুশ বিপ্লবের প্রভাব আলোচনা কর।

———————

পর্যায় গ্রন্থ - ৩
WORLD BETWEEN THE TWO WARS

একক - ১
জাতিসংঘ ও যৌথ নিরাপত্তা
বিশ্ব অর্থনৈতিক বিপর্যয়

বিন্যাস ক্রম ঃ

২.৩.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

২.৩.১.১ ঃ জাতিসংঘ ও যৌথ নিরাপত্তা

২.৩.১.২ ঃ পুঁজিবাদ/ধনতন্ত্রের সংকট ঃ বিশ্ব অর্থনৈতিক বিপর্যয়

২.৩.১.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

২.৩.১.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

২.৩.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) যৌথ নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ভূমিকা।

(২) জাতিসংঘের সামনে নানা সমস্যা ও সংকট।

(৩) জাতিসংঘের সাফল্য-ব্যর্থতা নিরূপণ ও যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার পতনের কারণ।

(৪) ইউরোপে পুঁজিবাদ ও ধনতন্ত্রের সংকট।

(৫) বিশ্ব অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের উৎপত্তির কারণ।

(৬) বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল।

২.৩.১.১ ঃ জাতিসংঘ ও যৌথ নিরাপত্তা

বিশ্বযুদ্ধের পরিবর্তে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের মহান উদ্দেশ্য নিয়েই জাতিসংঘ তার যাত্রা শুরু করে। একটি সাধারণ সভা, একটি কাউন্সিল ও একটি স্থায়ী দপ্তর নিয়ে লীগ অব নেশনস্ গঠন করা হল।

জাতিসংঘ বা লীগ অব নেশনস্ ছিল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রধানতম রক্ষাকবচ ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উইলসন আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের জন্য এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত চৌদ্দদফা (Fourteen Points)-র শেষ শর্তটিতে বিভিন্ন

রাষ্ট্রের সহযোগিতায় একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করার উল্লেখ ছিল। বলা যেতে পারে, এই শর্তটির উপর ভিত্তি করেই জাতিসংঘ গড়ে উঠে।

আন্তর্জাতিক এই সংগঠনটির প্রতিষ্ঠায় উইলসন একা ছিলেন না। অনেকেই উপলব্ধি করেছিলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রকে আঘাত করবে বেশী এবং সমাজতন্ত্রের পথ প্রশস্ত হবে। ১৯১৭ খ্রীঃ রুশ বিপ্লব ছিল এর প্রমাণ। তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী অন্তর্কলহ ভুলে পুঁজিপন্থী শান্তি অর্জনের লড়াইয়ে পরিণত হোক, উইলসনের এই মনোভাবের শরিক অনেকেই হয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, আন্তঃরাষ্ট্রিক ধারণা এই প্রথম এতটা স্পষ্টভাবে রাষ্ট্রনেতাদের মনে আন্তর্জাতিক ধারণার সঙ্গে মিশে গিয়েছিলো আমেরিকার লানসিঙ্গ (Lansing), ইংল্যান্ডের রর্বাট সিসিল (Cecil), ফ্রান্সের লিওঁ বোর্জে (Leon Bourgeois)-এরা কেউই আন্তরাষ্ট্রিক সংগঠনের কথা বলেননি, এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের কথা বলেছিলেন। এক একটা জাতি যে পারস্পরিক রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সত্তার নিরিখে একটি আন্তঃরাষ্ট্রিক তথা আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ায় শামিল হবে, তা উইলসনই ব্যক্ত করেছিলেন। জাতিসংঘের সনদে 'Promotion of Internatioal Co-operation' এবং Achieving of International peace and Security' কে জাতিসংঘের প্রধান আদর্শ ও লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রবর্গ স্বীকার করে যে যুদ্ধের পরিবর্ত্তে আর্ন্তজাতিক সহযোগিতা দ্বারা তারা আর্ন্তজাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করবে, ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করবে ও আন্তর্জাতিক আইন-কানুন মেনে চলবে, নিজেদের ভিতর বিবাদ-বিসম্বাদ জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় নিষ্পত্তি করবে, কোনো রাষ্ট্র, জাতিসংঘের নির্দেশ অমান্য করলে, অন্যান্য রাষ্ট্রবর্গ তার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করবে ও প্রয়োজন হলে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে প্রস্তুত হবে। বিশ্বে যুদ্ধের পরিবর্ত্তে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের মহান উদ্দেশ্য নিয়েই জাতিসংঘ তার যাত্রা শুরু করে। একটি সাধারণ সভা, একটি কাউন্সিল ও একটি স্থায়ী দপ্তর নিয়ে লীগ অব নেশনস্ গঠন করা হল। এই প্রতিষ্ঠানের একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয় ও একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ সৃষ্টি করা হল।

প্রশ্ন ১। লীগ অব নেশনস্ এর উদ্দেশ্য কি ছিল?

ত্রিশের দশক আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সংকটের যুগ নামে পরিচিত। কারণ এই সময়ে শান্তি ও গণতন্ত্র এক প্রচন্ড চাপের সম্মুখীন হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের বিধি ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল গণতান্ত্রিক রাজনীতি সুদৃঢ় করা এবং বিশ্বযুদ্ধ ও নিরাপত্তা বজায় রাখা। কিন্তু একনায়কতন্ত্রী দেশগুলির উদ্ভব ও শক্তিবৃদ্ধি একদিকে যেমন গণতন্ত্রকে লঙঘন করেছিল, অন্যদিকে শান্তি ও স্থিতাবস্থা বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। যদিও বিশের দশকে জাতিসংঘ তার দায়িত্ব প্রতিপালনে সম্পূর্ণ সফল না হলেও তার ভূমিকা নিন্দনীয় ছিল না। কিন্তু ত্রিশের দশকে শুরু থেকেই একনায়কতন্ত্রী দেশগুলির সম্প্রসারণবাদী তৎপরতা বিশ্বশান্তিকে বিপন্ন করে তোলে এবং যৌথ নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘ ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।

জাতিসংঘের কোন সদস্য রাষ্ট্র কাউন্সিলের নির্দেশ অথবা সালিশী বোর্ডের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে মনে করবে এবং সেই রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক বা অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন করবে।

সমষ্টিগত নিরাপত্তা রক্ষায় জাতি সংঘের ভূমিকা বিশ্লেষণ করার জন্য দুটি বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন -- (ক) সমষ্টিগত নিরাপত্তা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ দূরীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা করার সময় জাতিসংঘে এ বিষয়ে

যে সমস্ত ব্যবস্থার কথা উল্লেখ ছিল বা জাতিসংঘ নানাভাবে সমষ্টিগত নিরাপত্তার আদর্শকে কার্যকরী রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল তা ব্যাখ্যা করা এবং (খ) বাস্তবক্ষেত্রে জাতিসংঘ সমষ্টিগত নিরাপত্তা বজায় রাখতে কতদূর সক্ষম হয়েছে সে বিষয় আলোচনা করা। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রধান প্রধান সমস্যার প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

জাতিসংঘের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরকারী সকল রাষ্ট্র প্রতিশ্রুতি দেয় যে জাতিসংঘের সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা তারা মেনে চলবে এবং বৈদেশিক আক্রমণ থেকে তা রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তি ব্যাহত হতে পারে এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হলে জাতিসংঘের যে কোন সদস্যরাষ্ট্র সেই অবস্থার দিকে সাধারণসভা বা কাউন্সিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। জাতিসংঘ বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ উপায়ে সেই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করবে।

জাতিসংঘের কোন সদস্যরাষ্ট্র কাউন্সিলের নির্দেশ অথবা সালিশী বোর্ড বা বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে জাতিসংঘের অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ তা তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে মনে করবে এবং সেই রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন করবে। আক্রমণকারী দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ফলে সদস্যরাষ্ট্রদের যে অর্থনৈতিক ক্ষতি ও অসুবিধার সৃষ্টি হবে তা হ্রাস করার জন্য সদস্যরাষ্ট্রেরা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলবে। তাছাড়া জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্ররা আক্রান্ত দেশকে সামরিকভাবে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকবে এবং সেই সাহায্যের পরিমাণ সম্বন্ধে জাতিসংঘের কাউন্সিল বিভিন্ন সরকারের কাছে সুপারিশ প্রেরণ করবে। উল্লেখ্য যে সদস্যরাষ্ট্রদের কাছে সামরিক সাহায্য দাবী করার কোন অধিকার কাউন্সিলের ছিল না। কাউন্সিলের অধিকার ছিল কেবলমাত্র সুপারিশ করার। এছাড়া আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ আক্রমণকারী রাষ্ট্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে এমন ব্যবস্থা ছিল না। পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্র, বিশেষ করে কয়েকটি শক্তিশালী রাষ্ট্র, জাতিসংঘের সদস্য না থাকায় এই অর্থনৈতিক অবরোধের মূল্য অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ইতালী যখন ইথিওপিয়া আক্রমন করে তখন ইতালীর বিরুদ্ধে এই অর্থনৈতিক অবরোধ প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী ও জাপান জাতিসংঘের সদস্য না থাকায় এই অবরোধ বিশেষ কার্যকরী হয় নি।

প্রশ্ন

১। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক অবরোধের বিষয়টি কি ছিল?

২। ইতালীর ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অবরোধ কার্যকর হয়নি কেন?

জাতিসংঘ নানাভাবে সমষ্টিগত নিরাপত্তার আদর্শকে কার্যকরী রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। নিরস্ত্রীকরণ জাতিসংঘের একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং মনে করা হয়েছিল যে বিভিন্ন দেশের অস্ত্রসজ্জা হ্রাস করা সম্ভব হলে সকল রাষ্ট্রের মধ্যেই নিরাপত্তাবোধ স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাবে। জাতিসংঘের সাধারণ সভার অনুরোধে অস্থায়ী মিশ্র কমিশন (Temporary Mixed Commission) খসড়া চুক্তি রচনা করে যেটি Draft Treaty of Mutual Assistance নামে পরিচিত। এতে বলা হয় যে একটি দেশ আক্রান্ত হলে এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সমস্ত রাষ্ট্র সেই দেশকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। তবে নিরাপত্তার সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণের সংযোগ সাধনের জন্য এই চুক্তিতে স্থির হয় যে নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যদি কোন রাষ্ট্র সম্মত না হয় তবে সেই রাষ্ট্রের জন্য এই চুক্তি প্রযোজ্য হবে না।

পারস্পরিক সাহায্য সংক্রান্ত খসড়া চুক্তির বিরুদ্ধে অনেক রাষ্ট্রের অভিযোগ ছিল যে আক্রমণকারী রাষ্ট্র সম্বন্ধে কোন বিশেষ সংজ্ঞা না থাকায় সেই চুক্তি তাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই ১৯২৪ খ্রীঃ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামশে ম্যাকডোনাল্ড এবং ফরাসী প্রধানমন্ত্রী হ্যারিয়ট সাধারণ সভার পঞ্চম অধিবেশনে নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে আক্রমণকারী রাষ্ট্রের একটি বিশেষ সংজ্ঞা যুক্ত করে এক নূতন পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। এটি হল Protocol for the pacific settlement of International Disputes সংক্ষেপে এই পরিকল্পনার নাম General Protocol এই প্রোটোকোলের দ্বিতীয় ধারায় বলা হয় যে, দলিলে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। তাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে, আইন সংক্রান্ত সমস্ত বিরোধ স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে উপস্থাপন করতে হবে এবং আদালতের সিদ্ধান্ত সমস্ত রাষ্ট্র মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। আইন সংক্রান্ত বিরোধ ছাড়া অন্যান্য বিরোধে জাতিসংঘের কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারলে কাউন্সিলের দ্বারা নিযুক্ত সালিশী কমিটি বিচার করবে। এই বিচার উভয় পক্ষকেই মেনে নিতে হবে। কোন বিবাদ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বা কাউন্সিলের বা সালিশী কমিটির বিচারাধীন থাকার সময় কোন রাষ্ট্র যদি সৈন্য সমাবেশ বা প্রস্তুতি আরম্ভ করে তবে সেই দেশকে আক্রমণকারী রূপে গণ্য করতে হবে বলে প্রোটোকলে বলা হয়। জাতিসংঘের কাউন্সিলকে আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বয়কট এবং সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার এবং প্রয়োজন হলে ক্ষতিপূরণ ধার্য করার অধিকার দেওয়া হবে। নিরাপত্তার সঙ্গে নিরস্ত্রীকরণের যোগসূত্র স্থাপন করার জন্য এই প্রোটোকলে প্রস্তাব করা হয় যে ১৯২৫ খ্রীঃ ১৫ জুনের মধ্যে বহু সংখ্যক রাষ্ট্র এই চুক্তি স্বীকার করে নিলে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন আহ্বান করা হবে।

১৯২৪ খ্রীঃ সাধারণ সভার পঞ্চম অধিবেশনে নিরাপত্তা ও নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে আক্রমণকারী রাষ্ট্রের একটি বিশেষ সংজ্ঞাযুক্ত করে 'General Protocol' নামে এক নতুন পরিকল্পনা উপস্থাপিত করা হয়। কিন্তু এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি।

জেনেভা প্রোটোকল শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। সমস্ত রাজনৈতিক বিরোধের বাধ্যতামূলক সালিশী কমিটির বিচার ব্রিটেন মেনে নিতে অস্বীকার করে। ব্রিটেন তার নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে খুব বেশী চিন্তিত ছিল না। তাই সমষ্টিগত নিরাপত্তার বেড়াজালে ব্রিটেন বিশেষ জড়িত হতে চায়নি। তাছাড়া কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড অভ্যন্তরীণ সমস্যা সম্পর্কে জেনেভা প্রোটোকলের সুপারিশ গ্রহণ করতে রাজী ছিল না।

জেনেভা প্রোটোকল প্রত্যাখ্যাত হলেও এই পরিকল্পনার মূল বিষয় কয়েকটি রাষ্ট্র একটি আঞ্চলিক চুক্তির মাধ্যমে গ্রহণ করে নেয়। এটি হল লোকার্ণ চুক্তি। জাতিসংঘের বাইরে কয়েকটি রাষ্ট্রের চেষ্টায় এই চুক্তি সম্পাদন সম্ভব হয়েছিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অষ্টেন চেম্বারলেন জেনেভা প্রোটোকল সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার সময় বলেছিলেন যে, আঞ্চলিক চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যোগ না দেওয়ায় জাতিসংঘের মাধ্যমে সাধারণভাবে সমষ্টিগত নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোন কার্যকরী চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করতেন। উল্লেখ্য, জাতিসংঘ অনেক চেষ্টা করেও যেখানে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি করতে পারে নি, সেখানে জাতিসংঘের বাইরে লোকার্ণ চুক্তি অন্ততঃ আঞ্চলিকভাবে তা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। লোকার্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর দুই বছরের মধ্যে কেলগব্রিয়াঁ চুক্তি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলি 'জাতীয় নীতি হিসাবে যুদ্ধ বর্জনে' স্বীকৃত হয়। এর ফলে জাতিসংঘের মর্যাদা কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়।

প্রশ্ন

১। জেনেভা প্রোটোকল কত সালে গঠিত হয়?

২। জেনেভা প্রোটোকলের মূল বিষয় কি ছিল?

মাঞ্চুরিয়া সমস্যা

জাতিসংঘের যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রথম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় সুদূর প্রাচ্যে। সেখানে জাপানের আগ্রাসী তৎপরতা থেকে সংকট সৃষ্টি হয় এবং তা প্রতিরোধ করতে জাতিসংঘের দুর্বলতা ও ব্যর্থতা প্রতিপন্ন হয়। মাঞ্চুরিয়াতে ক্ষমতা সম্প্রসারণ নিয়ে জাপান, চীন ও রাশিয়ার মধ্যে বহু বছর ধরেই বিরোধ ছিল। জাপান সুদূর প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করে ১৮৯৫ খ্রীঃ চীনকে পরাজিত করে লিয়াওটাং উপদ্বীপ এবং পোর্ট আর্থার অধিকার করে নেয় এবং চীনকে কোরিয়ার স্বাধীনতা মেনে নিতে বাধ্য করে। কিন্তু জার্মানী, ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিরোধিতার ফলে জাপান লিয়াওটাং উপদ্বীপ এবং পোর্ট আর্থার চীনকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। ১৮৯৮ খ্রীঃ পোর্ট আর্থারে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তৃত হলে জাপান অসন্তুষ্ট হয় এবং ১৯০৪ খ্রীঃ যুদ্ধে জাপান রাশিয়াকে পরাজিত করে লিয়াওটাং উপদ্বীপে এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার রেলপথে নিজের আধিপত্য বিস্তার করে। এর পরেও চীনের সঙ্গে জাপানের শত্রুতা অব্যাহত থাকে এবং ১৯১০ খ্রীঃ কোরিয়াতে জাপানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়াশিংটন সম্মেলনে (১৯২১-২২ খ্রীঃ) জাপান প্রথম মহাযুদ্ধের সময চীনে যে সব অধিকার লাভ করে তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেও জাপান আবার চীনে বিশেষ করে মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করে। ১৯৩১ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে একটি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাপান চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে।

জাতিসংঘের ১১ নং ধারা অনুযায়ী চীন জাতিসংঘের নিকট সুবিচার প্রার্থনা করে। ১১ নং ধারায় বলা হয়েছিল যে জাতিসংঘ বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তি সুনিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। উল্লেখ্য, এই ধারা অনুযায়ী লীগ কাউন্সিলের যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ঐক্যমত্য প্রয়োজন। প্রথমে লীগ কাউন্সিল জাপানকে তার সেনাবাহিনী রেলপথ অঞ্চলে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিলে জাপান এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। জাপান জাতিসংঘের প্রস্তাব উপেক্ষা করে সমগ্র মাঞ্চুরিয়া দখল করে নেয়। বিজিত ভূখন্ডের নাম রাখা হয় মাঞ্চুকুয়ো। মাঞ্চুরিয়া নিয়ে জাতিসংঘ তার ব্যর্থতা ঢাকবার জন্য পাঁচটি বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে (ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইতালি) একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে এবং ব্রিটেনের প্রতিনিধি লর্ড লিটন এই কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। এই কমিশনের ওপর সমস্যার প্রকৃতি অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে জাপান চীনের মূল ভূখন্ডে আক্রমণ চালায়। ১৯৩২ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে জাপান চীনের সাংহাই শহরে বোমাবর্ষণ করে। চীন জাতিসংঘের ১০ ও ১৫ ধারার প্রয়োগ দাবী করে কিন্তু জাতিসংঘ চীনের দাবীর প্রতি নীরবতা দেখায়। ১৯৩২ খ্রীঃ সেপ্টেম্বরে লিটন কমিশনের প্রতিবেদন লীগের সদর দপ্তরে পেশ করা হয়। এতে জাপানের মাঞ্চু রিয়া অভিযানের সকল অজুহাত নাকচ করা হয় এবং স্বাধীন মাঞ্চুকুয়ো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে একটি সাজানো পদক্ষেপ বলা হয়। তবে লিটন কমিশনের প্রতিবেদনে জাপানকে আক্রমণকারী চিহ্নিত করা হলেও লীগ চুক্তিপত্রের ১৬ নং ধারায় উল্লিখিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রয়োগ সম্পর্কে কোন কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সুপারিশ করা হয় নি। ১৯৩৩ খ্রীঃ ২৪শে ফেব্রুয়ারী জাতিসংঘের সংসদে লিটন কমিশন নিয়ে ভোটাভুটি হয়। উপস্থিত ৪৪টি দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে ৪২টি দেশ লিটন কমিশন রিপোর্ট মঞ্জুর করে। জাপান বিপক্ষে ভোট দেয় এবং শ্যামদেশ ভোটদানে বিরত থাকে। লিটন কমিশনের রিপোর্ট আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হওয়ার পর জাপান জাতিসংঘের সদস্যপদ ত্যাগ করে।

লীগ কাউন্সিল জাপানকে তার সৈন্য বাহিনী রেলপথ অঞ্চলে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিলে জাপান তা উপেক্ষা করে সমগ্র মাঞ্চুরিয়া দখল করে নেয়। জাতিসংঘ তার ব্যর্থতা ঢাকার জন্য পাঁচটি বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করে এবং লিটনকে সভাপতি নিযুক্ত করা হয়।

মাঞ্চুরিয়াতে জাতিসংঘের ব্যর্থতার ফলে সমষ্টিগত নিরাপত্তার প্রতি বিশ্বাস অনেক পরিমাণে শিথিল হয়ে যায়। মাঞ্চু রিয়াতেই প্রথম জাতিসংঘ একটি বৃহৎ রাষ্ট্রকে তার আক্রমণাত্মক নীতি থেকে প্রতিহত করার সমস্যার সম্মুখীন হয়। অন্যান্য বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্র জাপানের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে রাজী ছিল না। সমস্ত পৃথিবী তখন এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং কোন রাষ্ট্রই জাপানের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে রাজী ছিল না। মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু রাশিয়া তার নিজের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে এত ব্যস্ত যে জাপানের বিরুদ্ধাচারণ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ সমর্থন করতে না পারলেও কোন বৃহৎ রাষ্ট্র কার্যকরীভাবে সেখানে জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করা তার নিজের জাতীয় স্বার্থের অনুকূল মনে করে নি। তাই জাতিসংঘের সমস্ত কাজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের পররাষ্ট্র নীতি দ্বারাই বিশ্ব রাজনীতি পরিচালিত হত। সেই রকম কোন দেশের পররাষ্ট্র নীতির সঙ্গে জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত সামাঞ্জস্যপূর্ণ না হলে জাতিসংঘের পক্ষে কোন দেশের নিরাপত্তা বজায় রাখা সম্ভব ছিল না।

প্রশ্ন

১। লিটন কোন দেশের প্রতিনিধি ছিল?
২। মাঞ্চুরিয়া সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ ব্যর্থ হয়েছিল কেন?
৩। চীন জাপানের বিরোধ বেধে ছিল কেন?

ইথিওপিয়া সংকট

জাতিসংঘের মর্যাদা ও অস্তিত্বের ওপর বৃহত্তর আঘাত আসে ইতালীর কাছ থেকে। জাপান কর্তৃক সম্প্রসারণ নীতির অবতারণার ফলে যেমন সুদূর প্রাচ্যে শান্তি বিপন্ন হয়েছিল, ইতালীর ফ্যাসিস্ত নেতা মুসোলিনী আফ্রিকার ইথিওপিয়া রাজ্য আক্রমণ করায় পুনরায় জাতিসংঘের অকার্যকারিতা প্রমাণিত হল। ঊনিশ শতকের শেষদিকে ইতালী ইথিওপিয়ায় প্রাধান্য বিস্তারে সচেষ্ট হলেও ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিরোধিতার ফলে তা ফলপ্রসূ হয় নি। ইতালীতে মুসোলিনীর একনায়কতন্ত্রী শাসন প্রবর্ত্তনের ফলে ইতালী পুনরায় সম্প্রসারণশীল পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণে উদ্যত হয়। ত্রিশের দশকের শুরুতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ অর্থনৈতিক সংকটে নিমজ্জমান হয় এবং মূল শত্রু ফ্রান্স জার্মানীতে হিটলারের আগমনের ফলে উদ্বিগ্ন হয়ে ইতালির প্রতি মিত্রতা স্থাপনে আগ্রহী হয়। এইরকম অনুকূল পরিবেশে ইতালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করার সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। ১৯৩৪ খ্রীঃ ডিসেম্বরে ওয়াল ওয়াল নামক স্থানে আবিসিনিয়া সেনাবাহিনীর সঙ্গে ইতালীর অধীনস্থ সোমালিল্যাণ্ড থেকে আগত টহলদারী সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ বাধে। এতে কয়েকজন ইতালী সৈন্য নিহত হয়। এই ঘটনায় ইতালী সরকার আবিসিনিয়ার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দাবী করে। আবিসিনিয়া সরকার সমস্যার শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য জাতিসংঘের নিকট আবেদন জানায় এবং চুক্তিপত্রে ১১ নং শর্ত অনুযায়ী এই সমস্যাকে জাতিসংঘের বিচার্য বিষয়রূপে অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানায়।

জাতিসংঘের ধারণা ছিল যে সালিশীর সাহায্যে ইতালী ও ইথিওপিয়া তাদের সমস্যা সমাধানে সক্ষম হবে। ১৯৩৫ খ্রীঃ আবিসিনিয়ার আবেদনক্রমে জাতিসংঘ আপোষ মীমাংসার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। কমিটির সদস্য ছিল ফ্রান্স, ব্রিটেন, পোলান্ড, স্পেন ও তুরস্ক। ইতালী কোন প্রকার আপোষ মীমাংসায় যেতে রাজী হয় নি। ১৯৩৫ খ্রীঃ ৩রা অক্টোবর ইতালী প্রকাশ্যভাবে আবিসিনিয়া আক্রমণ করে। এই অবস্থায় জাতিসংঘ কর্তৃক নিযুক্ত আপোষ-মীমাংসার কমিটির সুপারিশক্রমে ৭ই অক্টোবর জাতিসংঘ চুক্তিপত্রের ১৬ নং ধারা অনুসারে সর্বসম্মতভাবে ইতালীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আক্রমণকারীরূপে সনাক্ত ইতালীর বিরুদ্ধে গৃহীত প্রস্তাবে সকল সদস্যরাষ্ট্রকে ইতালীর সঙ্গে সর্বপ্রকার আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, ব্রিটেন

ও ফ্রান্স জাতিসংঘের নির্দেশ পালন করতে আন্তরিকভাবে আগ্রহী ছিল না। তারা ইতালীর বিরাগভাজন হতে চায় নি। ব্রিটেন ইতালীর সঙ্গে তেল রপ্তানী অব্যাহত রাখে। এই সময় ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ইতালীয় নীতির মধ্যে স্ববিরোধিতা দেখা যায়। তারা একদিকে জাতিসংঘের অগ্রগণ্য সদস্য রূপে জাতিসংঘের গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধিতা করে নি, অন্যদিকে তারা ইতালীর বিরাগভাজন হতে চায় নি। ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পিয়ের লাভাল ও ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামুয়েল হোর ১৯৩৫ খ্রীঃ ৮ই ডিসেম্বর ইতালীর সঙ্গে একটি গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এই চুক্তি অনুসারে আবিসিনিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ ভূখন্ড ইতালীকে হস্তান্তর করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। তবে আবিসিনিয়ার স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয় নি। ইতালীর আক্রমণের চাপে আবিসিনিয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আবিসিনিয়ার স্বাধীন অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

ব্রিটেনে রক্ষণশীল দলের নেতা উইনস্টন চার্চিল ছিলেন একনায়কতন্ত্র বিরোধী প্রতিরোধমূলক শক্তি সংঘের প্রধান প্রবক্তা। ১৯৩৬ খ্রীঃ 'হাউস অব কমনস্'-এ এক ভাষণে জাতিসংঘের যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সর্বশক্তি নিয়োজিত করে সুদৃঢ় করতে আহ্বান জানান।

এইভাবে ১৯৩৬ খ্রীঃ থেকে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ভিত্তি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। জাপানের আঘাতে জাতিসংঘের ব্যর্থতা প্রথম প্রমাণিত হয়। ইতালীর আঘাতে দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠে। শেষে জার্মানীর সম্প্রসারণ নীতির ফলে যৌথ নিরাপত্তার শেষ রেশটুকু অবলুপ্ত হয়। ইতালীর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে হিটলার ভার্সাই চুক্তি ও লোকার্ণ চুক্তির ধারা অমান্য করে, রাইন অঞ্চলে সেনা সমাবেশ করেন (৭ই মার্চ, ১৯৩৬ খ্রীঃ)। ব্রিটেন কোনরকম প্ররোচনা না দেওয়ার জন্য ফ্রান্সকে নির্দেশ দেওয়ায় ফ্রান্স কোনরকম প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সাহস পেল না। এই অবস্থায় জাতিসংঘের পক্ষে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যৌথ নিরাপত্তা সম্বন্ধে যে বিধিব্যবস্থা বলবৎ হয়েছিল, তার পরিসমাপ্তি ঘটে। এ.জে.পি. টেলর মন্তব্য করেন, 'The German re-occupation of the Rhineland marked the end of devices for security which had been set up after the first world war.' জার্মান সম্প্রসারণের জয়যাত্রা শুরু হওয়ায় আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নৈরাজ্য নেমে এল। জার্মান আগ্রাসনের পরিপ্রেক্ষিতে যখন যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা অকার্যকর, সেই সময় ব্রিটেন জার্মানীর প্রতি আত্মঘাতী তোষণ নীতি অনুসরণ করে। ১৯৩৯ খ্রীঃ আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিধিবদ্ধ পরিসমাপ্তি ঘটে।

যৌথ নিরাপত্তা রক্ষায় লীগের ব্যর্থতার জন্য জাতিসংঘ নয় ; বরং এরজন্য দায়ী ছিল সমকালীন প্রতিকূল পরিবেশ ও সদস্য রাষ্ট্রদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা। ব্রিটেনে রক্ষনশীল দলের নেতা উইনস্টন চার্চিল ছিলেন একনায়কতন্ত্র বিরোধী প্রতিরোধমূলক শক্তিসংঘের প্রধান প্রবক্তা। ১৯৩৬ খ্রীঃ নভেম্বরে 'হাউস অব কমনস্'-এ প্রদত্ত এক বলিষ্ঠ ভাষণে তিনি জাতিসংঘের যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সর্বশক্তি নিয়োজিত করে সুদৃঢ় করতে আহ্বান জানান। কারণ তাঁর মতে একমাত্র এই পথেই শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে। চার্চিলের মতে ইংল্যান্ডকেই এই বিষয়ে অগ্রণী হতে হবে। কিন্তু চার্চিলের প্রত্যাশা পূরণ হয় নি। জাতিসংঘের যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যর্থতা শান্তি ও গণতন্ত্রের পক্ষে বিপদ ডেকে আনল।

জাতিসংঘের লক্ষ্য আগামী প্রজন্মকে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে রক্ষা করা হলেও জাতিসংঘের চুক্তিপত্রে যুদ্ধ বে-আইনী বলে ঘোষিত হয় নি। চুক্তিপত্রে সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে নিষেধ করা হয়েছিল। জাতিসংঘের

প্রশ্ন

১। ফ্রান্স ও ব্রিটেন জাতিসংঘের ইতালীয় নীতি কার্যকর করতে চায়নি কেন?

২। ব্রিটেনে রক্ষণশীল দলের নেতা কে ছিলেন?

চুক্তিপত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিল, তার ফলে জাতিসংঘের কার্যকারিতা বিপন্ন হয়। ৫(১) নং ধারা অনুসারে জাতিসংঘ কাউন্সিল বা পরিষদে কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র কোন প্রস্তাব গ্রহণ করতে হলে সকল সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতি দানের প্রয়োজন ছিল। কোন সদস্য রাষ্ট্র তার স্বার্থ ক্ষুন্ন হতে পারে আশঙ্কা করে কোন প্রস্তাবের বিরোধিতা করলে পরিষদের পক্ষে কোন কার্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হত না। জাতিসংঘ আক্রমণ বন্ধের জন্য শুধুমাত্র প্রস্তাব গ্রহণের অধিকারী ছিল, কিন্তু প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য কোন তার নিজস্ব কোন সামরিক বাহিনী ছিল না। ফলে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করে বিশ্বশান্তি বজায় রাখা জাতিসংঘের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সামঞ্জস্য স্থাপনে অনেক রাষ্ট্রই ব্যর্থ হয়। আবার জাতিসংঘের কাঠামোগত দুর্বলতা শুরু থেকেই সংগঠনকে সীমাবদ্ধ অসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের অগ্রগতির ফলে ঐ দুটি দেশ বিশ্বরাজনীতিতে প্রবল প্রতাপশালী হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্যপদ গ্রহণ করে নি। জাপানই ছিল ইউরোপ বহির্ভূত একমাত্র শক্তিশালী সদস্য রাষ্ট্র। অন্যদিকে ইউরোপের অভ্যন্তরে জার্মানী ও সোভিয়েত রাশিয়াকে ইচ্ছাকৃতভাবে জাতিসংঘের সদস্যপদ দেওয়া হয় নি। বলা যেতে পারে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পশ্চিমের গণতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে যে অবিশ্বাস, ভয় ও সন্দেহ সৃষ্টি হয় তা দ্বারা জাতিসংঘের আদর্শ ব্যাহত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রথম জাতিসংঘে গ্রহণ না করায় সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির ষড়যন্ত্রমূলক প্রতিষ্ঠান বলেই মনে করে। তাই জাতিসংঘের উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা হলেও জাতিসংঘ প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক সংগঠন ছিল না। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠানিক ভিত্তি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তারা নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। জাতিসংঘের কাঠামোগত দুর্বলতার একটি দিক হলে সদস্যরাষ্ট্রদের জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রত্যাহারের প্রবণতা। চুক্তিপত্রের ১(৩) নং ধারায় কোন সদস্য রাষ্ট্রকে দু-বছরের বিজ্ঞপ্তি মারফৎ সদস্যপদ নাকচের অধিকার দেওয়া হয়। ত্রিশের দশকে এই সুযোগে জাপান, জার্মানী, ইতালী জাতিসংঘ ত্যাগ করে এবং এরফলে জাতিসংঘের কার্যকারিতা ও মর্যাদাহানি ঘটে। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি এক সঙ্গে জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত না থাকায় জাতিসংঘের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কাজ করা সম্ভব ছিল না। কোন আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বা সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও সমস্ত বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি জাতিসংঘের সদস্য না থাকায় সেই ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকরী হওয়া সম্ভব ছিল না। ইতালী-ইথিওপিয়া যুদ্ধে এই ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রথম জাতিসংঘে গ্রহণ না করায় সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির ষড়যন্ত্রমূলক প্রতিষ্ঠান বলেই মনে করে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে জাতিসংঘ কোন আন্তর্জাতিক সংগঠন ছিল না।

একনায়কতন্ত্রী ও সমরবাদী রাষ্ট্র জাপান, জার্মানী ও ইতালীর সংশোধনবাদী ও সম্প্রসারণশীল তৎপরতা ত্রিশের দশকে জাতিসংঘের অক্ষমতা প্রতিপন্ন করে। সামগ্রিকভাবে তারা শান্তি ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করায় যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলবৎ হয় নি। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ বিশেষতঃ ব্রিটেন ও ফ্রান্স লীগের ভেতরে ও বাইরে কোন সক্রিয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিল না। একনায়কতন্ত্রী দেশগুলির হিংসাত্মক আগ্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যৌথ নিরাপত্তা রক্ষায় জাতিসংঘ বিফল হয়েছিল। তবে যৌথ নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ তার দায়িত্ব পালনে শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হলেও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিল তা ঐতিহাসিক দিক থেকে অর্থহীন বলা চলে না। কারণ এর উপর ভিত্তি করেই বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

প্রশ্ন

১। সোভিয়েত রাশিয়া ও জার্মানীকে জাতিসংঘের সদস্য পদ দেওয়া হয়নি কেন?

২। আক্রমণকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জাতি সংঘের সম্ভব হয়নি কেন?

(৪) প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় -- *আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস।*

(৬) অলক কুমার ঘোষ -- *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব (১৮৭০-২০০৬)।*

(৭) গৌরীপদ ভট্টাচার্য্য -- *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।*

২.৩.১.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) উনবিংশ শতকে ত্রিশের দশকে জাতিসংঘের যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার পতন কিভাবে হয়েছিল?

(২) জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখলের পিছনে কি কি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল? মাঞ্চুরিয়া সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ কি ভূমিকা পালন করেছিল?

(৩) বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার উৎপত্তির কারণ কি? ইহা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল?

পর্যায় গ্রন্থ - ৩
WORLD BETWEEN THE TWO WARS

একক - ২
ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ
ইতালিতে মুসোলিনী ও জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুদয়

বিন্যাস ক্রম ঃ

২.৩.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

২.৩.২.১ ঃ ভূমিকা

২.৩.২.২ ঃ ইতালিতে মুসোলিনীর ক্ষমতালাভ ও ফ্যাসিবাদের প্রতিষ্ঠা

২.৩.২.৩ ঃ ফ্যাসিবাদের তত্ত্ব ও নানা লক্ষণ

২.৩.২.৪ ঃ মুসোলিনীর পররাষ্ট্রনীতি

২.৩.২.৫ ঃ হিটলারের ক্ষমতালাভ ও জার্মানীতে নাৎসিবাদের প্রতিষ্ঠা

২.৩.২.৬ ঃ হিটলারের ক্ষমতা দখলের এবং নাৎসি দলের সাফল্যের কারণ

২.৩.২.৭ ঃ নাৎসি মতবাদ

২.৩.২.৮ ঃ হিটলারের বৈদেশিক নীতি

২.৩.২.৯ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

২.৩.২.১০ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

২.৩.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায়গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) ইতালিতে কিভাবে মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠিত হল।

(২) ফ্যাসিবাদের তত্ত্ব, নানা বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ।

(৩) মুসোলিনীর বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং ধারা।

(৪) হিটলারের জার্মানীতে ক্ষমতালাভ এবং নাৎসিবাদের প্রতিষ্ঠা।

(৫) নাৎসি দলের সাফল্যের নানাবিধ কারণ।

(৬) নাৎসি মতবাদ-এর বৈশিষ্ট্য।

(৭) হিটলারের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ধারা।

২.৩.২.১ ঃ ভূমিকা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয় তথা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নানা পালাবদল চলতে থাকে। ত্রিশের দশকে ইউরোপে দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তির সমাবেশই ঘটল না; একইসঙ্গে পরস্পর বিরোধী দুটি মতাদর্শেরও আবির্ভাব দেখা দিল। একদিকে গণতন্ত্র ও শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টা চলল। আবার অন্যদিকে ভার্সাই চুক্তিকে নস্যাৎ করে একনায়কতন্ত্রের উন্মেষ ঘটল ও সম্প্রসারণ নীতির প্রয়োগ করা হল। এই একনায়কতন্ত্রের উন্মেষের ফলে ইতালিতে একনায়কতন্ত্রী ফ্যাসিবাদের প্রতিষ্ঠা হল। ফ্যাসিস্ত দলের নেতা, হিসেবে বেনিটো মুসোলিনী হলেন ইতালির সর্বময় কর্তা। ঠিক একইভাবে জার্মানীতে গণতন্ত্র ও শান্তির বিকল্পরূপে একনায়কতন্ত্র ও সমরবাদ জন্ম নিল। জার্মানিতে হিটলারের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হল নাৎসিবাদী একনায়কতন্ত্রী রাজনীতি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে দুটি পরস্পর বিরোধী মতাদর্শের আবির্ভাব ঘটে। একটি হল গণতন্ত্র ও শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টা এবং অন্যটি হল একনায়কতন্ত্রের উন্মেষ ও তার সম্প্রসারণ নীতির প্রয়োগ।

প্রশ্ন

১। ইতালীর ফ্যাসিস্ত দলের নেতা কে ছিলেন?
২। ইউরোপে পরস্পর বিরোধী মতাদর্শ দুটি কি ছিল?

২.৩.২.২ ঃ ইতালিতে মুসোলিনীর ক্ষমতালাভ ও ফ্যাসিবাদের প্রতিষ্ঠা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে যে ভার্সাই সম্মেলন ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে ইতালির কোন আশা-আকাঙ্খাই পূরণ করা হয়নি। একেবারে শূন্য হাতে তাকে ফিরে আসতে হয়েছিল। যে লাভের আশায় ইতালি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগদান করেছিল তা বাস্তবায়িত হয়নি। ইতালিবাসির এই হতাশা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ইতালির শোচনীয় আর্থিক অবস্থার কারণে। অত্যধিক মুদ্রাস্ফীতি, কম উৎপাদন, বন্ধ কল-কারখানা, শ্রমিক অসন্তোষ, দেশবাসীর আর্থিক অনটন, কৃষক বিক্ষোভ ইত্যাদি নানা ঘটনা ইতালিতে অশান্তি ডেকে আনে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ১৯১৯ খ্রীষ্ট্রাব্দের পর ইতালির রাজনৈতিক অস্থিরতা। এর ফলে ইতালির জনগণ একটি সুদৃঢ় সরকার ও শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করতে লাগল। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সর্বক্ষেত্রে এই অস্থিরতা ও দুর্বলতা ইতালিতে মুসোলিনীর নেতৃত্বে একনায়কতন্ত্রের আগমনের পথ সুগম করল। গণতন্ত্রের দুর্বলতা ও সেনাবাহিনী ও শাসকগোষ্ঠীর সাম্যবাদ বিরোধী মনোভাব মুসোলিনীকে ক্ষমতা দখলে সাহায্য করেছিল।

ভার্সাই সন্ধির পর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও দুর্বলতা ইতালীতে মুসোলিনীর নেতৃত্বে একনায়কতন্ত্রের আগমনের পথ সুগম করেছিল।

ক্ষমতা দখলের প্রথম পর্বে (১৯২২-২৬ খ্রীঃ) প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি ইতালিতে নানা সন্ত্রাস ও দমনমূলক কাজ চালিয়ে সর্বময় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি তার ফ্যাসিস্ত দলকে একমাত্র বৈধ রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি ও মর্যাদা দিলেন। অন্য সব উদারতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দলগুলিকে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিষ্ক্রিয় করে দিলেন। দ্বিতীয় পর্বে (১৯২৭-৩৯ খ্রীঃ) তিনি ইতালিতে ফ্যাসিস্ত মতাদর্শকে সর্বাগ্রে স্থান দিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ইতালিতে কৃষি, শিল্প, অর্থনীতি ও শ্রমিক সংগঠনের উপর রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব স্থাপন করা হল।

প্রশ্ন

১। ইতালীতে কেন একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

২। মুসোলিনী ইতালীতে কিভাবে ফ্যাসীবাদী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

২.৩.২.৩ ঃ ফ্যাসিবাদের তত্ত্ব ও নানা লক্ষণ

ফ্যাসিবাদের মূল কথা হোল রাষ্ট্রের সর্বময় প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এই মতাদর্শানুসারে রাষ্ট্রই সর্বেসর্বা, রাষ্ট্রস্বার্থ ব্যক্তিস্বার্থের অনেক উপরে। ইতালিয়ান 'ফ্যাসিস্‌মো' (Fascismo) কথাটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল ফ্যাসিজম (Fascism)। বাংলায় একে বলা হয় ফ্যাসিবাদ। 'Fascism' (ফ্যাসিজিম্‌) শব্দটির সরাসরি উৎপত্তি ইতালিয়ান 'ফ্যাসিও' (Fascio) শব্দ থেকে। পরোক্ষভাবে শব্দটি লাতিন 'ফাসেস' (Fasces) এর সঙ্গে যুক্ত। ফ্যাসিজম্‌ এর অর্থ হল 'একগুচ্ছ' বা একসঙ্গে গ্রথিত।

ইতালিয়ান 'ফ্যাসিসমো' কথাটির ইংরাজী প্রতিশব্দ হল ফ্যাসিজিম। বাংলায় একে বলা হয় 'ফ্যাসিবাদ'।

প্রশ্ন

১। ফ্যাসিজিম শব্দের অর্থ কি?

সাম্যবাদী তত্ত্বে ফ্যাসিস্ট শব্দটি নিন্দাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হলেও প্রাচীন রোমে এটি ছিল একতা, ক্ষমতা ও বাধ্যতার প্রতীক। যেসব ব্যবস্থা অগণতান্ত্রিক, উদারতন্ত্র বিরোধী এবং সমাজতন্ত্র বিরোধী তাই ফ্যাসিবাদের অন্তর্ভুক্ত। ফ্যাসিবাদ উগ্র জাতীয়তাবাদের ধারক ও বাহক। ইতিহাসগত ভাবে ফ্যাসিবাদ বলতে বোঝায় ইতালিতে মুসোলিনির ক্ষমতালাভের এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সময়কাল-অর্থাৎ ১৯২২ খ্রীঃ থেকে ১৯৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। কারণ এই সময়ে মুসোলিনী ইউরোপে তথা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর নীতি, আদর্শ, আন্দোলন ও সম্প্রসারণ নীতির জাল বিস্তার করেছিলেন। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে কিভাবে ইতালিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ফ্যাসিবাদের উত্থান ও মুসোলিনীর ক্ষমতা দখল সম্ভব হয়েছিল। ফ্যাসিবাদি ভাবাদর্শের বেশ কিছু সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল ঃ (১) পুঁজিবাদী শোষণ এবং হিংসাত্মক সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণ; (২) বিরুদ্ধ মতাদর্শের উপর আক্রমণ এবং নিষ্ঠুর অসহিষ্ণুতা; (৩) উগ্র জাতীয়তাবাদ, (৪) জাতি শ্রেষ্টত্বের অভিমান বজায় রাখার সংকল্প, (৫) সমাজতন্ত্র বিরোধী চিন্তাভাবনা; (৬) ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংগঠনগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার করা এবং শ্রমিক শ্রেণীর উপর অত্যাচার চালানো; (৭) "Elitism" (আভিজাত্যকে) মেনে নেওয়া ও প্রশ্রয় দেওয়া; (৮) সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণে যে কোন পন্থা গ্রহণ যেমন যুদ্ধ, গণহত্যা, অত্যাচার এবং যে কোনো রকমের হিংসার আশ্রয় গ্রহণ ইত্যাদি; (৯) মার্কসীয় সাম্যবাদের বিরোধিতা করে অপ্রতিহত, অহঙ্কারী, সর্বক্ষমতাময় একনায়কতন্ত্রী নেতৃত্ব; (১০) সমাজবাদী আন্তর্জাতিকতাবাদের ঘোরতর বিরোধিতা করা। (১১) তত্ত্বগতভাবে হেগেলিয় আদর্শবাদ গ্রহণ করা হলেও কার্যক্ষেত্রে তাত্ত্বিক আদর্শবাদের পরিবর্তে নেতাভিত্তিক একনায়কতন্ত্রী শাসন চালানো। (১২) 'কর্পোরেট' (সমন্বয়ী) রাষ্ট্রে পরিণত করা। ফ্যাসিবাদকে তত্ত্বগতভাবে একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ মতবাদ হিসাবে গ্রহণ করলে

ইতিহাসগত ভাবে ফ্যাসিবাদ বলতে বোঝায় ইতালীতে মুসোলিনীর ক্ষমতা লাভের এবং ক্ষমতার অধিষ্ঠিত থাকা পর্যন্ত সময়কালকে।

ভুল হবে। গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের মত এটি দীর্ঘ বিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসেবে আসেনি। এই মতাদর্শ গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের ন্যায় সুস্পষ্ট ও সুচিন্তিতও নয়। এটি বহু রাজনৈতিক তত্ত্বের টুকরো টুকরো অংশের একটি সংকলন মাত্র। আসলে ফ্যাসিবাদ ছিল কর্মপ্রধান। তাই মুসোলিনী ইতালিতে তাঁর একনায়কতন্ত্রী শাসনের সমর্থনে একটি রাজনৈতিক দর্শনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। সে কারণেই তিনি ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত "Doctrine of Fascism" নামক রচনায় তাঁর ফ্যাসিবাদী তত্ত্ব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। হেগেলিয় দার্শনিক গিওভানি জেন্টিলে ফ্যাসিসমোর বা ফ্যাসিবাদের তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন।

প্রশ্ন

১। ফ্যাসিবাদের অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলি কি কি?

২। "Doctrine of Fascism" কতসালে প্রকাশিত হয়?

ফ্যাসিবাদের তত্ত্বগত দিকটি বিচার করলে কতকগুলি লক্ষণ ধরা পড়ে। ফ্যাসিবাদের মূল কথা হল, রাষ্ট্র হচ্ছে একটি স্বাধীন জৈবিক সত্তা। এর নিজস্ব ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও ব্যক্তিত্ব আছে। রাষ্ট্রশক্তির সর্বব্যাপিতা (all-pervasiveness) হচ্ছে ফ্যাসিবাদের সবচেয়ে বড় কথা। রাষ্ট্র হল সর্বগ্রাসী, কর্তৃত্বের ও সর্বরমক নিয়ন্ত্রণের একমাত্র অধিকারী। যেহেতু রাষ্ট্রের উপরে আর কিছু থাকতে পারে না, সে কারণে সর্বরকম ব্যক্তিস্বার্থকে রাষ্ট্রের কল্যাণে বিসর্জন দিতে হয়। রাষ্ট্রই একমাত্র হচ্ছে জনগণের আশা-আকাঙ্খা, 'সার্বজনীন বিবেক' ও নৈতিকতার পূর্ণ প্রতীক। রাষ্ট্র চরম সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এ ক্ষেত্রে মুসোলিনীর বক্তব্য হলঃ "রাষ্ট্রের মধ্যেই সমস্ত কিছু, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিছু নয়, রাষ্ট্রের বাইরেও কিছু নয়"। রাষ্ট্রের মাধ্যমেই ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়ে ওঠে এবং সেই জাতির ইচ্ছা-অনিচ্ছা রাষ্ট্রের মাধ্যমেই প্রকাশলাভ করে। সর্বব্যাপী রাষ্ট্র মানুষের সামগ্রিক জীবনের নিয়ন্তা। ফ্যাসিবাদ সাম্যবাদীদের শ্রমিক-পুঁজিপতি শ্রেণী সংঘাতের বিরোধিতা করে শ্রেণীঐক্য বা সহযোগিতার উপর জোর দিয়েছিল। কারণ এই সহযোগিতার মাধ্যমেই রাষ্ট্রের গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধি একমাত্র সম্ভবপর। ইতালিতে মুসোলিনীর আমলে ফ্যাসিবাদ বিরোধী সমস্ত রকম কার্যকলাপ ও প্রচার বন্ধ করে দিয়ে রাষ্ট্রের অনিবার্য প্রাধান্য বজায় রাখা হত এবং ব্যক্তি জীবনের সর্বক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে সমস্ত নীতি নির্ধারিত হত। সমগ্র ইতালিতে ফ্যাসিস্ট মূল্যবোধ গড়ে তোলাই ছিল ফ্যাসিবাদি রাজনীতির মূল লক্ষ্য।

রাষ্ট্র হল সর্বগ্রাসী কর্তৃত্বের ও সবরকম নিয়ন্ত্রণের একমাত্র অধিকারী। এই রাষ্ট্রই হল জনগণের আশা-আকাঙ্খা, 'সার্বজনীন' বিবেক ও নৈতিকতার একমাত্র পূর্ণ প্রতীক।

প্রশ্ন

১। ফ্যাসিবাদের মূল কথা কি?

ফ্যাসিবাদ জনগণের সমস্ত যুক্তিবাদী প্রবণতার ঘোরতর বিরোধী ছিল। ফ্যাসিস্তদের মতে, মানুষ মূলতঃ যুক্তিহীন জীব। ফ্যাসিবাদ তাই যুক্তিবাদের চেয়ে ভাবাবেগের উপর বেশি জোর দিয়েছিল। মুসোলিনী মনে করতেন যে ভয়ই সুদৃঢ় শাসন কায়েম করার একমাত্র পথ। জনগণ যদি একনায়ককে ভয় পায় তবেই নেতৃত্বের কাজ সহজতর হয় এবং জনগণের আস্থা ও ভালবাসা অর্জন করা একনায়কের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে। এই ভাবে ফ্যাসিবাদ বীরপূজার তত্ত্ব জনগণের মধ্যে প্রচার করেছিল।

ফ্যাসিবাদের আরেকটি বিশিষ্ট লক্ষণ হোল গণতন্ত্রবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যনীতির ঘোর বিরোধিতা। মুসোলিনী অবশ্য প্রথম জীবনে চরমপন্থী সমাজতন্ত্রী হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। পরে তার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। ফ্যাসিস্তরা জনগণের সাম্য, স্বাধীনতা ও গণসার্বভৌমত্বের তত্ত্বে একেবারেই বিশ্বাসী ছিল না। ফ্যাসিস্ত ধারণা হল, স্বাধীনতা "জনগণের অধিকার নয়, কর্তব্য।" ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগের পূর্বশর্ত হল রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের অখন্ড আনুগত্য প্রকাশ। মুসোলিনী মনে করতেন, 'সাম্য দূর্বলতা বিধায়ক ধারণা। অন্যদিকে অসাম্য অনিবার্য, ফলপ্রসূ এবং শুভপ্রদ।' জনগণের মঙ্গলের জন্য একজন যোগ্য নেতা বা একনায়কের প্রয়োজন যিনি অযোগ্য আপামর জনসাধারণকে সঠিকপথে চালনা করতে পারবেন। যোগ্য, স্বাভাবিক জ্ঞান ও বুদ্ধিসম্পন্ন বিশিষ্ট অভিজাত বা 'এলিটদের' হাতে রাষ্ট্রের শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা অর্পণ করা উচিত।

ফ্যাসিস্ত ধারণা হল, স্বাধীনতা "জনগণের অধিকার নয়, কর্তব্য।" ব্যাক্তি স্বাধীনতা ভোগের পূর্বশর্ত হল রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের অখন্ড আনুগত্য প্রকাশ।

এই অভিজাতদের মাথার উপরে থাকবেন দলের সর্ব্বোচ্চ নেতা। এই নেতাই রাষ্ট্রের ভাগ্য, আশা-আকাঙ্খার বাস্তব রূপ দেবেন। এই নেতার সব সিদ্ধান্ত এবং কার্যকলাপ অভ্রান্ত। এই কারণেই ফ্যাসিস্তদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল " মুসোলিনী সব সময়ে অভ্রান্ত।" এক কথায় বলতে গেলে, ফ্যাসিস্তরা এক জাতি, এক রাষ্ট্র, এক দল এবং এক নেতা এই তত্ত্বে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসী ছিল।

প্রশ্ন

১। ফ্যাসিবাদ যুক্তি অপেক্ষা কিসের উপর বেশী জোর দিয়েছিল?

ফ্যাসিবাদ জাতীয় রাষ্ট্রের গৌরববৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ, সম্প্রসারণকে অনিবার্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল। মুসোলিনী এ সম্পর্কে বলেছিলেন, "ইতালিকে অবশ্যই সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করতে হবে, না হলে তার বিনাশ অনিবার্য।" তাঁর ভাষায়, "নারীদের কাছে মাতৃত্ব যেমন স্বাভাবিক, পুরুষদের কাছে যুদ্ধও তেমনি স্বাভাবিক।" আন্তর্জাতিক শান্তিকে 'কাপুরুষের স্বপ্ন' বলে অভিহিত করে ফ্যাসিবাদ সাম্রাজ্যবিস্তার ও যুদ্ধকে জাতীয় জীবনীশক্তির 'সঞ্জীবনী সুধা' হিসেবে গ্রহণ করেছিল। মুসোলিনী তাই ক্ষমতালাভ করেই ফ্যাসিবাদী মতাদর্শকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য যুদ্ধের পথ গ্রহণ করেছিলেন।

ফ্যাসিবাদ ইউরোপের আধুনিক রাজনৈতিক মতবাদগুলির বিরোধিতা করলেও পুরনো ব্যবস্থার পুনঃস্থাপনায় আগ্রহী ছিল না। তাই যন্ত্রযুগ এবং প্রাক্ ফরাসী বিপ্লব যুগের ধারণার সঙ্গে তাদের ধারনার পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছিল। তাই প্রাক্-ফরাসী বিপ্লবযুগের স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র উত্তরাধিকারি সূত্রে অভিজাত প্রথা, মধ্যযুগীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের আধিপত্য, চার্চের প্রভুত্ব ও স্বাতন্ত্র্য, রাষ্ট্রের থেকে পৃথক কোন প্রভাবশালী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ইত্যাদি ফ্যাসিস্টদের কাছে কোনোভাবেই কাম্য ছিল না। তাই ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির উপর ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রশক্তি তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

রোমান সাম্রাজ্যের অতীত স্মৃতিমধুর ইতিহাস এবং রোম সভ্যতার ধারক ও বাহক হিসেবে জাত্যাভিমান এবং অহংবোধ থেকে জন্মলাভ করেছিল পরজাতির প্রতি বিদ্বেষ।

ফ্যাসিবাদি তত্ত্বের একটি মূল কথা হল উগ্রজাতীয়তাবাদ ও জাত্যভিমান। জাতিশ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য যে কোনো পন্থা অবলম্বনে ফ্যাসিস্তরা দ্বিধাবোধ করত না। রোমান সাম্রাজ্যের অতীত স্মৃতিমধুর ইতিহাস এবং রোম সভ্যতার ধারক ও বাহক হিসেবে জাত্যভিমান এবং অহংবোধ ফ্যাসিস্তদের উগ্র একজাতীয়তাবাদের ধারণাকে শক্তিশালী করেছিল। এই

জাত্যভিমান এবং অহংবোধ থেকে জন্মলাভ করেছিল পরজাতির প্রতি বিদ্বেষ। এই কারণেই ১৯৩৬-৩৭ সালের পর মুসোলিনীও ইহুদিবিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলেন। অবশ্য এর পেছনে যে শুধুমাত্র আদর্শগত কারণ কাজ করেছিল তা নয়, অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। একদিকে ইহুদি নিধনের মাধ্যমে মুসলমান জগতের সমর্থনলাভ এবং অন্যদিকে ইহুদিদের সম্পত্তির উপর পূর্ণ দখল স্থাপন করে আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠা মুসোলিনীর লক্ষ্য ছিল।

প্রশ্ন

১। মুসোলিনী ইহুদী বিদ্বেষী হয়েছিলেন কেন?

২.৩.২.৪ ঃ মুসোলিনীর পররাষ্ট্রনীতি

মুসোলিনী তাঁর পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে উগ্র ফ্যাসিস্ত মতাদর্শকে বিশ্বের সর্বত্র প্রসারিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন সময়ে এই মতবাদ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এর ফলে এই মতবাদ কেবলমাত্র ইতালিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলিতে। জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, স্পেন, চীন, জাপান, পর্তুগাল এবং লাতিন আমেরিকার অনেক দেশে এই মতবাদ বিস্তারলাভ করেছিল। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রগুলো একে অপরের কাছে চলে এসেছিল এবং নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিল। এর ফলশ্রুতি হিসেবে ইতালি ও জার্মানির মধ্যে ত্রিশের দশকে বেশ কিছু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল। ১৯৩৬ সালে জাপানও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। গড়ে উঠে রোম-বার্লিন, টোকিও অক্ষশক্তি (Axis Powers)। এইভাবে ফ্যাসিস্ত ও নাৎসী শক্তি নিজেদের মধ্যে ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি এক আন্তর্জাতিক সমঝোতা বজায় রাখতে সফল হয়েছিল।

ভার্সাই সম্মেলনে শূণ্য হাতে ফিরে আসায় ফ্যাসিষ্ট সরকারের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই অন্যায়-অবিচারের প্রতিকার। তাই তাঁর পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য ছিল ভূমধ্যসাগর ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তার করে রোমান উত্তরাধিকারের পুনরুদ্ধার। মুসোলিনীর এই প্রতিশোধ পর্বের সাথী হয়ে ছিল জার্মানী।

ভার্সাই সম্মেলনে শূন্য হাতে ফিরে আসায় মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ত সরকারের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই অন্যায়- অবিচারের প্রতিকার। তাই তাঁর পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য ছিলঃ "ভূমধ্যসাগর ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্য বিস্তার করে রোমান উত্তরাধিকারের পুনরুদ্ধার"। এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য মুসোলিনী জল, স্থল ও বিমান বাহিনীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং এই তিন বিভাগের শক্তি বৃদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন।

মুসোলিনী জঙ্গী বিস্তারধর্মী নীতি অনুসরণ করে ইতালিবাসীর হৃদয় জয় করতে চাইলেও প্রথম দিকে তিনি কিন্তু কিছুটা সাবধানী এবং 'ধীরে চলার' নীতি অনুসরণ করেছিলেন। তাই বিশের দশকে তিনি যুদ্ধ বা সংঘর্ষের পথ যতটা সম্ভব পরিহার করে কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে ইতালির স্বার্থপূরণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য এর পশ্চাতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণও কাজ করেছিল। বিশের দশকে ইতালির অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও বৈদেশিক কূটনৈতিক পরিবেশ জঙ্গী বিস্তারনীতির সহায়ক ছিল না বললেই চলে। প্রথমতঃ ঐ সময়কালে মুসোলিনী ইতালিতে ফ্যাসিস্ত দলের নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপনে ব্যস্ত ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ আর্থিক দিক দিয়ে ইতালি তখন দুর্বল ছিল। তাই ইতালির আর্থিক উন্নতির দিকে তাঁকে বিশেষভাবে নজর দিতে হয়েছিল। প্রয়োজনে বাইরে থেকে অর্থ

এনে ইতালির অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তৃতীয়তঃ উপনিবেশের উপর দখল ও আধিপত্য বিস্তার করে ইতালির পুঁজির যোগান বৃদ্ধির দিকেও তাঁর নজর ছিল। তাছাড়া অর্থনৈতিক দুর্বলতা সামরিক শক্তিবৃদ্ধির পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশেষ করে বিশের দশকের শেষে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মহামন্দার প্রকোপে ইতালি অর্থনৈতিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সবশেষে বলা যায়, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিও বিশের দশকে ইতালির পক্ষে প্রতিকূল ছিল। ইতালি তখনও তার উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজে পায়নি। ফ্রান্স বিশের দশকের শুরু থেকেই ইতালির শত্রু ছিল। ভার্সাই সম্মেলনে ফ্রান্স ইতালির বিভিন্ন দাবীর ঘোরতর বিরোধিতা করেছিল। বিশের দশকের শেষে ফ্রান্স এবং ব্রিটেন ইউরোপের কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিল। অন্যদিকে জার্মানি ছিল দুর্বল, আর সোভিয়েত রাশিয়া নিঃসঙ্গ। এমতাবস্থায় মুসোলিনীর পক্ষে ইউরোপের স্থিতাবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কোন সংশোধনবাদী, জঙ্গী বিস্তারনীতি অনুসরণ করা বিজ্ঞের মত কাজ হত না। তাই মুসোলিনী পরিস্থিতির বিচারে নিজেকে অনেকটাই সংযত রেখেছিলেন।

তবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেই জাতিসংঘের যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মুসোলিনী ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীক দ্বীপ কর্ফু দখল করে নেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত মিত্রপক্ষের মধ্যস্থতায় তা তাকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। বিনিময়ে তিনি পাঁচ কোটি লিরা আদায় করেছিলেন। এরপর আড্রিয়াটিক উপকূলে শক্তি বিস্তারের জন্য মুসোলিনী ফরাসি মিত্র যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এক্ষেত্রে ইতালি অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরিকে মিত্র হিসেবে পেয়েছিল। যুগোশ্লাভিয়ার কাছে মুসোলিনী ডোডেকানিজ দ্বীপপুঞ্জ এবং ফিউম শহর দাবি করেন। ইতালির দাবি মেনে নিয়েই যুগোশ্লাভিয়া ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে নেট্টিউনো কনভেনশন (Nettuno Convention) অনুযায়ী একটি বোঝাপড়া ও মীমাংসাসূত্রে উপনীত হয়। তবে এতে উভয়ের সম্পর্কের বিশেষ কোন উন্নতি লক্ষ্য করা যায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে ইতালির মনোমালিন্যের সম্পর্কই বজায় ছিল।

এরপর মুসোলিনী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে বদলা নেওয়ার জন্য অগ্রসর হন। চারটি কারণে ফ্রান্সের সঙ্গে তার বিরোধ তুঙ্গে পৌঁছায়। প্রথমটি হল ভূমধ্যসাগরে বাণিজ্য প্রাধান্য স্থাপন; দ্বিতীয়টি ফ্রান্সে ইতালিয়দের স্থায়ীভাবে বসবাস করার ব্যাপারে উৎসাহদান নিয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে ইতালির দ্বন্দ্ব; তৃতীয় কারণ হল আদর্শগত বিরোধ অর্থাৎ ফ্রান্সের গণতন্ত্রের প্রতি মুসোলিনীর ঘৃণা এবং চতুর্থ কারণ হল ফ্রান্স ও যুগোশ্লাভিয়ার ইতালির বিরুদ্ধে পারস্পরিক মৈত্রীজোট গঠন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ফরাসী অধিকৃত স্যাভয়, নিস, কর্সিকা, টিউনিসিয়া প্রভৃতি স্থানগুলির উপর ইতালির জোরদার দাবী।

পূর্ব আফ্রিকার বিশেষতরঃ আবিসিনিয়ার (ইথিওপিয়া) উপর দীর্ঘকাল ধরেই ইতালির দৃষ্টি ছিল। তাই ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি আবিসিনিয়া আক্রমণ করে। ইতালি তার নানাবিধ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্র হিসেবে আবিসিনিয়াকে বেছে নিয়েছিল। প্রথমতঃ আবিসিনিয়া দখলে এলে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার সেখানে বসবাসের জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়তঃ ইরিট্রিয়া এবং সোমালিল্যান্ড-এই দুটি উপনিবেশ ইতালির দখলে থাকার ফলে আবিসিনিয়া জয় করা মোটেই কষ্টকর ছিলা না। তৃতীয়তঃ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ আবিসিনিয়া দখল অর্থনৈতিক কারণে ইতালির কাছে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। চতুর্থতঃ জার্মানীতে নাৎসী দলের উদ্ভবের পর থেকে ইতালি ও জার্মানীর সম্পর্কের অবনতি ঘটে। নাৎসী জার্মানীর আগ্রাসী নীতিতে ইতালি ও ফ্রান্স ভয় পেয়ে যায়। সন্ত্রস্ত ইতালি ও ফ্রান্সের এর ফলে সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরপর ১৯৩৫ সালে হিটলারের আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যাবস্থা হিসেবে ফরাসী বিদেশ সচিব পিয়েরে লাভাল, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড মুসোলিনীর সঙ্গে সমঝোতা করে স্টেসা ফ্রন্ট গঠন করেছিলেন। এর ফলে মুসোলিনী স্পষ্টতঃই বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্রিটেন ও ফ্রান্স

আবিসিনিয়াকর প্রশ্নে ইতালির বিরুদ্ধে যাবে না এবং হিটলারের আগ্রাসী নীতি আটকানোর জন্য ইতালির সঙ্গে তোষণ নীতি চালিয়ে যাবে। পঞ্চমতঃ ইতিমধ্যে জাতিসংঘের দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতা প্রকট হয়ে পড়েছিল ১৯৩১ সালে। জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখলের সময় তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল। এতেও ইতালি আবিসিনিয়া আক্রমণে উৎসাহিত হয়েছিল। ষষ্ঠতঃ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি আবিসিনিয়ার কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল। আইমুসোলিনীর ধারণা পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ হিসাবে যদি এখন আবিসিনিয়া দখল করা যায় তবে ইতালিবাসির মন জয় করা যাবে এবং হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে।

এইসব নানা উদ্দেশ্য নিয়ে ইতালি আবিসিনিয়া আক্রমণ করে তার রাজধানী আদ্দিস আবাবা দখল করে নেয়। জাতিসংঘ এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বেই ইতালি ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নিজেই জাতিসংঘ পরিত্যাগ করে।

ইতালির এই আবিসিনিয়া দখলের পরিনীতি হিসাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কূটকৌশলের ক্ষেত্রে নতুন পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। ইংলন্ড এবং ফ্রান্সের সঙ্গে ইতালির সম্পর্কের এর ফলে অবনতি ঘটে। অন্যদিকে জার্মানী ও ইতালির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর ফলে রোম-বার্লিন যোগাযোগ দৃঢ় হয়েছিল। এই যোগাযোগ পূর্ণতা পেয়েছিল স্পেনের গৃহযুদ্ধে (১৯৩৬-১৯৩৯)।

প্রশ্ন

১। ইতালী কত সালে জাতিসংঘ পরিত্যাগ করে?
২। রোম, বার্লিন, টোকিও অক্ষশক্তি কত সালে স্থাপিত হয়?

স্পেনের গৃহযুদ্ধ

স্পেনের গৃহযুদ্ধের রাজনৈতিক পটভূমি তৈরি হয়েছিল ১৯৩০-এর দশকের সূচনায়। ঐ সময়ে প্রজাতন্ত্রীরা স্পেনে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করায় স্পেনের রাজা আলফান্সো ভয়ে তাদের হাতেই ক্ষমতা সমর্পন করেন। এতে প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থীরা প্রমাদ গুণতে থাকে। কারণ প্রজাতান্ত্রিক সরকারের যাজকবিরোধী নীতি এবং ভূমিসংস্কারের নীতি তাদের একেবারেই মনঃপূত ছিল না। অবস্থা আরও ঘোরতর ও জটিল হয়ে ওঠে যখন ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে সাম্যবাদী প্রভাবিত পপুলার ফ্রন্ট সরকার গঠন করে। এর ফলে দেখা দেয় বামপন্থীদের সঙ্গে ফ্যাসিবাদীদের সরাসরি লড়াই। ফ্রন্টের নেতৃত্বে ছিলেন মানুয়েল আথানিয়া ও লার্সো কাবালিয়েরো। অন্যদিকে ফ্যাসিবাদের নেতৃত্বে ছিলেন প্রিমো দে রিভেরা। এদের বিরোধের ফলে স্পেনে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। এই গৃহযুদ্ধ প্রায় স্পেনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। স্পেনে দক্ষিণপন্থীদের দলে যোগ দেন সামরিক নেতা জেনারেল ফ্রাঙ্কো। ফ্যাসিস্তরা জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে স্পেনে সামরিক অভুত্থান ঘটায় এবং ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে তুমুল লড়াই শুরু করে। এই লড়াই যখন প্রায় গোটা স্পেনে ছড়িয়ে যায় এক অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছায় ঠিক সে সময়ে স্পেনে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ ঘটতে দেখা যায়। সাম্যবাদী প্রভাবিত পপুলার ফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে সোভিয়েত রাশিয়ায় হস্তক্ষেপ করে। অন্যদিকে দুই ফ্যাসিস্ত শক্তি—ইতালি ও জার্মানী সামরিক নেতা জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সমর্থনে স্পেনের যুদ্ধে নেমে পড়ে। এর ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতি দুটি শক্তি শিবিরে স্পষ্টতঃই বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে ফ্যাসিবাদ, অন্যদিকে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রবাদ। সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে রোম—বার্লিন শক্তি যুদ্ধে লিপ্ত। 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া' হিসেবে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের গৃহযুদ্ধে ইতালী ও জামানী সমর্থিত জেনারেল ফ্রাঙ্কো জয়লাভ করেন এবং রাশিয়ার সমর্থিত পপুলার ফ্রন্ট পরাজিত হয়।

মহড়া' (Dressrehearsal of the Second World War) হিসাবে স্পেনের এই গৃহযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ফ্রাঙ্কো জয়লাভ করেন এবং পপুলার ফ্রন্ট পরাজিত হয়। ফ্রাঙ্কোর এই জয়লাভে ফ্যাসিস্ত ও নাৎসী শক্তি দ্বিগুণ উৎসাহে ইউরোপে তাদের আগ্রাসী নীতি চালিয়ে যেতে থাকে। অন্যদিকে ফ্রান্স ও ব্রিটেন স্পেনের যুদ্ধে তথাকথিত নিরপেক্ষতা দেখিয়ে একদিকে যেমন স্পেনের পতনকে সুনিশ্চিত করে তুলেছিল; তেমনি অন্যদিকে নিজেদেরও বিপদ ডেকে এনেছিল। স্পেনের গৃহযুদ্ধটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি তৈরি করেছিল বলা যেতে পারে।

প্রশ্ন

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে আন্তজাতিক রাজনীতি কটি শক্তি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে?
২। স্পেনের গৃহযুদ্ধ কতসালে শুরু হয়েছিল?

অক্ষশক্তি চুক্তি

স্পেনের গৃহযুদ্ধের সূত্র ধরে ইতালি ও জার্মানী পরস্পরের কাছে চলে এসেছিল। তাদের মধ্যে মনোমালিন্যেরও অবসান হয়েছিল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা মেনে নেন এবং তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দেন। এর ফলে রোম-বার্লিন সম্পর্কের আরও উন্নতি হয়। এর ফলশ্রুতি হিসেবে গড়ে ওঠে রোম-বার্লিন অক্ষশক্তি চুক্তি (১৯৩৬)। ঐ বৎসরই হিটলার জাপানের সঙ্গে সাম্যবাদবিরোধী 'অ্যান্টিকমিন্টার্ন প্যাকট' চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। উভয়ের মধ্যে শর্ত ছিল যে কেউই রাশিয়ার সঙ্গে কোনরকম রাজনৈতিক বোঝাপড়ায় যাবে না। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে একই শর্তে জাপান ও জার্মানীর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে ইতালি। গড়ে ওঠে এই তিনশক্তির রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষচুক্তি। (Rome-Berlin-Tokyo Axis) অক্ষচুক্তি ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের ভীতির কারণ হল। তারা হিটলার ও মুসোলিনীর প্রতি তাদের তোষণ নীতি চালিয়ে গেল। অন্যদিকে সোভিয়েত সাম্যবাদের ভয় তো ব্রিটেন-ফ্রান্সের ছিলই। সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথ প্রস্তুত করল।

১৯৩৬ সালে হিটলার জাপানের সঙ্গে সাম্যবাদ বিরোধী 'অ্যান্টিকমিন্টার্ন প্যাকট' চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এরই সঙ্গে যুক্ত হয় ইতালী।

প্রশ্ন

১। অষ্ট্রিয়া কত সালে স্বাধীন হয়?
২। অ্যান্টিকমিন্টার্ন প্যাকট কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল?

২.৩.২.৫ ঃ হিটলারের ক্ষমতালাভ ও জার্মানীতে নাৎসিবাদের প্রতিষ্ঠা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হিটলারের জার্মানীতে ক্ষমতালাভের নানা ধাপগুলির সবেমাত্র সূচনা হতে থাকে। তিনি প্রারম্ভিক পর্বে মিউনিখে 'জাতীয় সমাজতন্ত্রী জার্মান শ্রমিক দল' নামে একটি দল গঠন করেন। এই দলের কাজ ছিল বিভিন্ন জনসভায় ভার্সাই চুক্তি বিরোধী বক্তৃতা ও প্রচারের মাধ্যমে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের জনবিরোধী কাজগুলি জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করা। একই সঙ্গে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের শাসনকালে হিটলার নাৎসিশক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'মে'ই ক্যামফ' রচনা করে নাৎসি মতবাদ ও আন্দোলনের আদর্শ প্রচার করা শুরু করেন। তাঁর ক্ষমতালাভের প্রধান প্রধান ধাপগুলি দেখা যায় ১৯২৯ থেকে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। কারণ

১৯২৯ থেকে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতন শুরু হয়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভাইমার প্রজাতন্ত্রের দক্ষ প্রশাসক স্ট্রেসম্যানের মৃত্যু, ১৯২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, জার্মানীতে রাজনৈতিক সংকট, রাইখস্ট্যাগের ঘন ঘন নির্বাচন (১৯৩০-৩৩), কোনো দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাব, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, নাৎসি দলের ক্রমশঃ শক্তিবৃদ্ধি, নাৎসি দলের কর্মসূচীর জনপ্রিয়তা, সমরবাদের উত্থান, ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক দাঙ্গা ইত্যাদি নানা ঘটনা হিটলারের অভ্যুত্থানের পথ প্রশস্ত করেছিল। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নাৎসিদলের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটল নির্বাচনগুলিতে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে-১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনগুলিতে রাইখস্ট্যাগে নাৎসিদের আসনসংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তারাই একক বৃহত্তম দল হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল। তারা নির্বাচনে ২৩০টি আসন পেয়েছিল এবং সবথেকে বেশি ভোটও পেয়েছিল। অশীতিপর বৃদ্ধ জার্মানীর প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবার্গ এমতাবস্থায় ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে হিটলারকে চ্যান্সেলার পদে নিযুক্ত করেন। হিটলার এরপর সংবিধানকে অবজ্ঞা করে চূড়ান্ত রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের দিকে অগ্রসর হন। তিনি জার্মানীতে নাৎসি দল ছাড়া অন্যান্য সব রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এরপর ক্ষমতা দখলের জন্য একের পর এক অন্যায় কাজ চালিয়ে যান। অবশেষে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবার্গের মৃত্যু হলে হিটলার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে প্রেসিডেন্ট ও চ্যান্সেলার এই উভয় ক্ষমতাই নিজের হাতে নিয়ে নেন। এর ফলে তিনি হলেন এক ধারে রাষ্ট্রের, শাসনব্যস্থার এবং সৈন্যবাহিনীর সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর উপাধি হল জার্মান ফ্যুহ্‌রার বা জার্মান সর্ব্বোচ্চ নেতা বা একনায়ক। এইভাবে হিটলার জার্মানীতে একনায়কতন্ত্রী নাৎসিবাদের প্রতিষ্ঠা ঘটালেন।

ভাইমার প্রজাতন্ত্রের পতন, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, জার্মানীতে রাজনৈতিক সংকট, রাইখস্ট্যাগের ঘন ঘন নির্বাচন, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, নাৎসী দলের ক্রমশ শক্তি বৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তা, সমরবাদের উত্থান প্রভৃতি ঘটনা হিটলারের অভ্যুত্থানের পথ প্রশস্ত করেছিল।

প্রশ্ন

১। হিটলার কত সালে জার্মানীর চ্যান্সেলর পদে নিযুক্ত হন?
২। হিটলারের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম কি?
৩। হিটলার কি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন?

২.৩.২.৬ ঃ হিটলারের ক্ষমতা দখলের এবং নাৎসি দলের সাফল্যের কারণ

হিটলারের জার্মানীতে ক্ষমতালাভের কারণ নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। হিটলারের অভ্যুত্থানের ব্যাপারে তিনধরনের পরস্পর বিপরীত মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। ই.এইচ.কার প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা হিটলারের উত্থানকে নাৎসি বিপ্লব হিসেবে (Nazi Revoluion) চিহ্নিত করেছেন। জার্মান ঐতিহাসিক রিটার (Gerhard Ritter) ও মার্কিন ঐতিহাসিক কোপেল এস. পিনসন (Koppel S. Pinson) নাৎসি দলের উত্থানকে গণআন্দোলনের ফল হিসেবে অভিহিত করেছেন। সাম্যবাদী ঐতিহাসিকেরা যেমন দানীল মেলনিকভ ও লিউদমিলা চেরনাইয়া নামক সোভিয়েত ঐতিহাসিকদ্বয় তাঁর আগমনকে প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী রাজনীতির জয় বলে অভিহিত করেছেন। তাঁরা হিটলারকে সমাজবিরোধী শক্তির প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আবার তৃতীয় একদল ঐতিহাসিক যেমন এ.জে.পি. টেলর, গর্ডন ক্রেইগ ও প্রখ্যাত জার্মান ঐতিহাসিক কে. ডি. ব্রেকার হিটলারের উত্থানকে জার্মান সংসদীয় রাজনীতির স্বাভাবিক গতিধারার প্রেক্ষাপটে বিচার করেছেন।

জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুত্থান নিয়ে অনেক ধরনের ভ্রান্ত ধারণা ও ব্যাখ্যা দেখা যায়। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এলান বুলক (Alan Bullock) ও জার্মান নাৎসিপন্থী ঐতিহাসিকরা হিটলারের উত্থানের পশ্চাতে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, বাক্‌পটুতা, রাজনৈতিক কূটকৌশল, জনমোহিনী শক্তি, অসম্ভব আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি চারিত্রিক গুণের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। কিন্তু অধ্যাপক এ.জে.পি. টেলর মনে করেন ব্যক্তিত্বের যুক্তি হিটলারের উত্থানের কারণ হিসেবে গ্রহনীয় নয়। কারণ তাঁর মতে, যদি ব্যক্তিত্বই তাঁর উত্থানের একমাত্র কারণ হত তবে হিটলারকে কেন ১৯৩৩ খ্রীঃ পর্যন্ত ক্ষমতা দখলের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল? একমাত্র ক্ষমতালাভের পরই তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে বিশাল রূপ পেয়েছিল। আরো একটি প্রচলিত ধারণা হল, ভার্সাই চুক্তির অবমাননাকর শর্তগুলি জার্মানবাসীর মনে যে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে হিটলার ক্ষমতার চূড়ায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ফরাসী ঐতিহাসিক মরিস বুমন্ট (Maurice Baumont), অধ্যাপক ই. এইচ.কার (E.H. Carr) ভার্সাই চুক্তির কঠোরতা এবং জার্মানীকে পঙ্গু করার চেষ্টা এবং ভার্সাই চুক্তির পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্তর্দ্বন্দ্ব কিভাবে জার্মানীতে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে একনায়কতন্ত্রের আগমনের পথ প্রশস্ত করেছিল তা তুলে ধরেছেন। আবার জি.বারাক্লু (G. Barraclough) ওয়েমার প্রজাতন্ত্রের ভার্সাই চুক্তিতে স্বাক্ষরদানের মাধ্যমে মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ এবং এর ফলে ওয়েমার প্রজাতন্ত্রের ভাবমূর্তির নষ্টের উপর হিটলারের ক্ষমতালাভের কারণ খুঁজে পেয়েছেন। অধ্যাপক এ.জে.পি. টেলর ভার্সাইচুক্তির কারণটিকে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর মতে ভার্সাই চুক্তি সম্পাদন এবং ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হিটলারের ক্ষমতালাভের মধ্যে ব্যবধান ছিল চোদ্দ বছরের। এই সময়ের ব্যবধানে ভার্সাই চুক্তির অবিচারের প্রতিশোধস্পৃহা জার্মানবাসীর মধ্যে অনেকটাই ধূসর হয়ে উঠেছিল। এছাড়া ভার্সাই চুক্তির অনেক শর্তই প্রযোগ করা হয়নি বা কতকগুলি সংশোধিত হয়েছে। তাই ১৯৩০ এর শুরুতে ভার্সাই-এর অন্যায় হিটলারের জনপ্রিয়তা লাভের কারণ হিসেবে গ্রহণ করা কষ্টকর।

জার্মানীর অভিজাত, সমরবাদী ও পুজিপতি-বিত্তবান গোষ্ঠী বামপন্থী দলগুলির বিরুদ্ধে হিটলারকে সমর্থন জানাতে লাগলেন। ফলে ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সবকটি নির্বাচনে হিটলারের নাৎসীদল তাদের আসন সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে সফল হল।

হিটলারের ক্ষমতায় আসার প্রসঙ্গে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দাকে কারণ হিসেবে দেখানো হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে এ.জে.পি. টেলরের বক্তব্য হল ঃ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার ভয়াবহ প্রভাব শুরুর পূর্বেই জার্মান রাজনীতিতে অস্থিরতা, স্থিতিশীলতার অভাব এবং সংকট দেখা দেয়। তাঁর মতে, ১৯২৯-৩৩ খ্রীঃ কালব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা প্রজাতন্ত্রকে নির্মূল করেনি, বরং প্রজাতন্ত্রের বিলুপ্তির পরিচায়ক ছিল। তিনি এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "The collapse of the republic" was accelerated but not caused by the economic crisis which swept the entire world between 1929 and 1933."

তবে জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুত্থানের মূলে রাজনৈতিক, সামাজিক, সামরিক ও সাংগঠনিক কারণ যে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জার্মান রাজনীতিতে প্রজাতন্ত্রবিরোধীরা প্রথম থেকেই সক্রিয় ছিল। তাছাড়া জনগণের কাছেও ওয়েমার প্রজাতন্ত্রের ভাবমূর্তি ভাল ছিল না। ওয়েমার প্রজাতন্ত্র ছিল দুর্বল এবং জার্মানীতে এর ফলে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল। অন্যদিকে দক্ষিণ পন্থী রাজনীতির সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা বোঝাপড়া ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠতে থাকে। অধ্যাপক এ.জে.পি. টেলর মনে করেন নাৎসি দলের উত্থানের মূলে ছিল বিত্তবান শ্রেণীর সঙ্গে জনতাবাদী (Populist) নাৎসি দলের আপোষ। জার্মানীর অভিজাত, সমরবাদী ও পুঁজিপতি

বিত্তবান গোষ্ঠী বামপন্থী দলগুলির বিরুদ্ধে হিটলারকে সমর্থন জানাতে লাগলেন। ফলে ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সবকটি নির্বাচনে হিটলারের নাৎসি দল তাদের আসন সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে সফল হল।

নাৎসি দলের সাফল্যের পশ্চাতে সামরিক বাহিনীর বিশেষ ভূমিকা ছিল। এইসঙ্গে তাদের শক্তিশালী সংগঠন ও ব্যাপক সামাজিক ভিত্তি তাদেরকে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছিল। তাছাড়া হিটলার ও তাঁর নাৎসি দলের কাছে আশীর্বাদ হয়ে এসেছিল ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা। এর ফলে জার্মানীর কপালে নেমে আসে এক বিরাট অর্থনৈতিক সংকট। জার্মানবাসী প্রচন্ড হতাশায় প্রজাতন্ত্রের প্রতি সম্পূর্ণভাবে আস্থা হারায় এবং একজন পরাক্রমশালী যোগ্য নেতার হাতে সর্ব্বোচ্চ দায়িত্ব তুলে দিতে প্রস্তুত হয়।

তবে হিটলারের ক্ষমতায় অভ্যুত্থান কোন আকস্মিক ব্যাপার ছিল না। সাংবিধানিক উপায়ে বৈধভাবেই হিটলার জার্মান রাজনীতির শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। তাই একদিকে যেমন তাঁর অভ্যুত্থানকে ক্ষমতা দখল বলা যায় না, অন্যদিকে তা 'নাৎসি বিপ্লব' বলা চলে না। অধ্যাপক E.H. Carr অবশ্য তাঁর আগমণকে 'নাৎসি বিপ্লব' বলেছেন। কিন্তু গণ অভ্যুত্থানের পথ পরিত্যাগ করে প্রচলিত পন্থা অনুসরণ করেই তিনি ধাপে ধাপে ক্ষমতার শীর্ষে উঠেছিলেন। তবে হিটলারের অভ্যুত্থান নিয়ে পুঁজিপতিশ্রেণীর ভূমিকা এবং কম্যুনিস্টদের দায়-দায়িত্ব নিয়েও ঐতিহাসিক মহলে বিতর্ক রয়েছে।

এতসব বিতর্ক সত্ত্বেও হিটলারের ক্ষমতায় উত্থান সম্পর্কে দুটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ হিটলার সাংবিধানিক উপায়েই ক্ষমতায় এসেছিলেন। অবশ্য এর পেছনে একটি ক্ষুদ্র চক্রের জোরালো ভূমিকা ছিল। এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল দক্ষিণপন্থী রাজনীতিবিদরা, অভিজাততন্ত্রী নেতা পাপেন এবং থাইসেনের মত পুঁজিপতি। দ্বিতীয়তঃ সাংবিধানিক ও বৈধ উপায়ে তিনি জার্মান গণতন্ত্রের অবসান ঘটান এবং মুখোশধারী একনায়কতন্ত্রকে একদলীয় একনায়কতন্ত্রে রূপান্তরিত করেন। আর এ কাজ তিনি করেন ক্ষমতা দখলের পূর্বে নয়, বরং পরে। তাঁর ক্ষমতালাভের পরই নাৎসি দলের একনায়কতন্ত্র জার্মানীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন

১। E. H. Carr হিটলারের অভ্যুত্থানকে কি বলেছেন?

২। হিটলারের অভ্যুত্থানে অভিজাত সম্প্রদায়ের কি প্রভাব ছিল?

২.৩.২.৭ ঃ নাৎসি মতবাদ

ফ্যাসিস্ত মতবাদের প্রতিধ্বনি শোনা যায় নাৎসি মতবাদে। এই মতবাদ ফ্যাসিবাদের ন্যায় বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের টুকরো টুকরো অংশ নিয়ে জোড়াতালি দিয়ে গড়ে উঠেছে। তাই এখানে সামঞ্জস্যপূর্ণ মতাদর্শের অভাব পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এই মতবাদের মূল কথাগুলি হিটলারেরনেই ক্যাম্ফ' নামে আত্মজীবনীমূলক রচনায় পাওয়া যায়। হিটলারের পূর্বে নাৎসি দলের উদ্দেশ্য ও মতবাদের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে তাঁরই সহকর্মী গট্‌ফ্রিড রচিত পঁচিশ দফা কর্মসূচীর মধ্যে (১৯২০ খ্রীঃ)। 'নাৎসি' শব্দটির উৎপত্তি হিটলারের 'ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট দল' থেকে।

নাৎসিবাদ ফ্যাসিবাদের ন্যায় জঙ্গী ও সংকীর্ণ উগ্র জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রচার করেছে। জার্মান নাৎসিদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল নর্ডিক জাতির শ্রেষ্ঠত্বে। তারা মনে করত যে জার্মান শিরায় নর্ডিক রক্ত প্রবাহিত এবং জার্মান জাতিই পৃথিবীতে একমাত্র 'অর্থে' জাতির মর্যাদা লাভ করবার যোগ্যাধিকারী। জার্মান রাষ্ট্রে অ-জার্মানদের কোন স্থান থাকতে পারে না। এই জাত্যভিমান থেকে জন্ম নেয় তাদের মনে হিংস্র ইহুদিবিদ্বেষ। হিটলারের উগ্র ইহুদি বিদ্বেষ

শেষ পর্যন্ত ইহুদি নিধনে পরিণত হয়েছিল। হিটলারের ইহুদিদের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে নীচু ধারণা ছিল। আরো একটি কারণ হল, ইহুদিরা ছিল নাৎসিবিরোধী এবং হিটলারের প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মান কম্যুনিস্ট দলের নেতাদের অধিকাংশই ছিল ইহুদি। তাছাড়া জার্মানীর অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইহুদিদের হাতেই চলে এসেছিল। তাই হিটলারের নাৎসি রাজনীতির প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল জার্মানী থেকে ইহুদি বিতাড়ন। হিটলার তাই তাঁর গ্রন্থ 'মেঁইক্যামফ'-এ জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেছিলেন এবং সমগ্র বিশ্বে জার্মান সাম্রাজ্য ছড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করেছিলেন। শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক ও সাধারণ জনসাধারণের কাছে তাঁর অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধের ডাক এবং কর্মসূচী অত্যন্ত সাড়া জাগিয়েছিল। সমরবাদীরা তাঁর বিশ্বজয়ের পরিকল্পনা সাদরে গ্রহণ করেছিল।

জার্মান নাৎসীরা মনে করত যে জার্মান শিরায় নর্ডিক রক্ত প্রবাহিত এবং জার্মান জাতিই পৃথিবীতে একমাত্র 'অর্থে' জাতির মর্যাদা লাভ করার যোগ্যাধিকারী। এই জাত্যভিমান থেকে তাদের মধ্যে জন্মনেয় ইহুদী বিদ্বেষ।

নাৎসিবাদ সমস্ত ক্ষমতার নাৎসিকরণের পক্ষপাতী ছিল। এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল হিটলারের সর্বময় ক্ষমতা জার্মানীতে প্রতিষ্ঠিত করবার। জার্মানীতে ব্যক্তিস্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হয়। ফ্যাসিবাদের ন্যায় নাৎসিবাদও রাষ্ট্রের সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিল। চার্চ ও ধর্মাধিপ্রতিষ্ঠানের একাধিপত্য খর্ব করা হয়। রাষ্ট্রের উপরে কিছু নয় এই মতবাদে নাৎসিবাদ জোর দিত। জার্মানরা নাৎসি দল ছাড়া জার্মানীতে অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বে আস্থাশীল ছিল না। ফ্যাসিস্তদের মতই তারা একদলের একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল। ফ্যাসিবাদের ন্যায় নাৎসিবাদ মানুষের যুক্তিপ্রবণতার ঘোর বিরোধী ছিল। তারা বীরপূজার তত্ত্বে আস্থাশীল ছিল।

নাৎসিবাদ উগ্র ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকেই কেবল সমর্থন করেনি; সেইসঙ্গে নগ্ন সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্য সম্প্রসারণকে সবচেয়ে বড় করে দেখেছে। জার্মানরা যাতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হতে পারে সেজন্য হিটলার পৃথিবীর যত অঞ্চলে জার্মানরা বসবাস করত সেই সব অঞ্চল নিজ দখলে আনার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তিনি যুদ্ধকে নাৎসিবাদের মূল চালিকাশক্তি বলে মনে করতেন। যুদ্ধের মাধ্যমে পররাজ্যগ্রাসের ক্ষেত্রে জার্মানী কোন আন্তর্জাতিক আইন, সন্ধি বা বাধা নিষেধ মানবে না বলতে তিনি কোন দ্বিধাবোধ করেননি। যুদ্ধও সাম্রাজ্যবিস্তার নাৎসিবাদের মূলমন্ত্র। হিটলারের ভাষায়, "শাশ্বত যুদ্ধেই মানুষ মহান হয়ে উঠেছে, শাশ্বত শান্তিতে তার বিনাশ ঘটবে।" ফ্যাসিবাদের ন্যায় ন্যাৎসিবাদও শক্তিপ্রয়োগের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেছিল।

নাৎসিবাদ উগ্র জাতীয়তাবাদের সাথে সাথে সমাজতন্ত্রকেও গ্রহণ করেছিল। তবে সাম্যবাদী আদর্শ ও কম্যুনিস্ট সমাজতন্ত্রের সঙ্গে এদের সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার পার্থক্য ছিল। সমাজতান্ত্রিকদের মতই হিটলার রাষ্ট্রের অর্থনীতির ওপর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তবে নাৎসিবাদ ব্যক্তিগত মালিকানায় বিশ্বাসী ছিল। তবে উৎপাদন ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল। মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রামের পরিবর্তে পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় গড়ে তোলাই নাৎসিবাদের লক্ষ্য ছিল। এই পথেই তারা শ্রমিকদের 'সামাজিক মুক্তির' লক্ষ্যে পৌঁছুতে চেয়েছিল। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কঠোর নিন্দা করলেও নাৎসিবাদ কিন্তু জার্মানীতে তাকে নানা ভাবে বজায় রেখেছিল। প্রকৃত সমাজতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাস করেনা, বরং আন্তর্জাতিক শান্তিতে তারা অধিক আগ্রহী। কিন্তু নাৎসিবাদ ফ্যাসিবাদের ন্যায় ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদ নীতিতে বিশ্বাসী ছিল।

প্রশ্ন

১। গটফ্রিড কে ছিলেন?

২। হিটলারের মধ্যে ইহুদি বিদ্বেষ দেখা দিয়েছিল কেন?

২.৩.২.৮ ঃ হিটলারের বৈদেশিক নীতি

বৈদেশিক নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে হিটলার ছিলেন সংশোধনবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী। তিনি জার্মানী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করার জন্য বিশ্ব জয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্যই ছিল জার্মানীকে ইউরোপ তথা বিশ্বের প্রধান শক্তিতে পরিণত করা। অবশ্য এ.জে.পি. টেলর তাঁর "The Origins of the Second World War" গ্রন্থে হিটলারের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনার কথা যে সব ঐতিহাসিক বলেছেন তাদের মতামত যুক্তিপূর্ণ ও প্রামান্য মনে করেন না। তাঁর মতে, তা হলে হিটলার নৌবাহিনীর উপর গুরুত্ব দিতেন। টেলরের মতে, পূর্ব ইউরোপে জার্মান সাম্রাজ্যের বিস্তার সাধন করে উদ্বৃত্ত জার্মান অধিবাসীদের বসবাস ও খাদ্যের সুব্যবস্থা করাই ছিল তার সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রকৃত লক্ষ্য।

ক্ষমতা দখলের পর হিটলার ভার্সাই সন্ধি নস্যাৎ করে দিয়ে জার্মানীর হৃত গৌরব ও রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধারের দিকে দৃষ্টি দিলেন। এর জন্য তিনি একদিকে যেমন সামরিক অস্ত্রশস্ত্র বুদ্ধি করলেন তেমনি অন্যদিকে ইউরোপে মিত্র খোঁজার কাজ শুরু করলেন। পূর্ব ইউরোপে উপনিবেশ বিস্তার এবং সাম্যবাদী সোভিয়েত রাশিয়া বিজয়ের দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল। যেহেতু ইউরোপে সাম্রাজ্যবিস্তার তাঁর একান্ত কাম্য ছিল সেহেতু তিনি প্রথমেই জাতিসংঘের সদস্যপদ ত্যাগ করলেন। কারণ জাতিসংঘের সদস্য থাকলে তাঁর পক্ষে যুদ্ধনীতি অনুসরণ করার পথে বাধা সৃষ্টি হবে। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে তিনি জার্মানীর জন্য যে পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র চেয়েছিলেন তাতে ফ্রান্সের কাছ থেকে বাধা এলে তিনি ভার্সাই সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন ত্যাগ করেন এবং জাতিসংঘেরও সদস্যপদ ছেড়ে দেন। প্রত্যুত্তরে জার্মানীতে তিনি বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন করেন এবং জল, স্থল ও অন্তরীক্ষ সর্ববিভাগেই জার্মানীর সামরিক বিভাগকে আধুনিক করে তোলেন।

হিটলার বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। যার ফলে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ব নিরস্ত্রীকরণ সম্মোলনে ভার্সাই সন্ধির শর্তভঙ্গ করে সম্মেলন ত্যাগ করেন ও জাতিসংঘের সদস্যপদ ছেড়ে দেন।

হিটলার তাঁর আক্রমণাত্মক নীতির প্রস্তুতি হিসেবে পোল জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি (১৯৩৪ খ্রীঃ) স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার ফলে ফ্রান্স ও পোলান্ডের মৈত্রীতে ফাটল ধরে, ফরাসী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয় এবং পোলান্ড ও জার্মানীর মধ্যে ভার্সাই চুক্তির পর যে মনোমালিন্য চলছিল তার সাময়িক অবসান ঘটে। এরপর বর্ধিত জার্মান জনসংখ্যার বাসভূমির সন্ধানে তিনি ফ্রান্সের কাছে আলসাস-লোরেন ও সার উপত্যকা দাবী করেন। পোলান্ডের সঙ্গে দশ বছরের অনাক্রমণ চুক্তি সত্ত্বেও তিনি পোলান্ডের উর্বর কৃষিজমি, ডানজিগ ও পোলিশ করিডর দাবী করে বসেন। রাশিয়ার কাছে দাবী করেন ইউক্রেন অঞ্চল। জার্মানীর সঙ্গে অস্ট্রিয়ার সংযুক্তিকরণে হিটলার বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। ১৮৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান ঐক্যের সময়ে অষ্ট্রিয়াকে সংযুক্ত না করে বিসমার্ক যে 'ঐতিহাসিক ভুল' করেছিলেন তার সংশোধনের জন্য জার্মান-অস্ট্রিয়ার সংযুক্তিকরণের (Anschlus) মাধ্যমে বৃহত্তর জার্মানী হিটলার গড়ে তুলতে চাইলেন। এর ফলে অষ্ট্রিয়ার জার্মান ভাষাভাষী জনগণ হিটলারের সরাসরি শাসনাধীনে আসার সুফল পাবে। তবে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এ ব্যাপারে প্রচন্ড বাধা আসে ইতালির মুসোলিনীর কাছে থেকে। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের নাৎসি সামরিক অভ্যুত্থান অস্ট্রিয়ায় ব্যর্থ হয়। এর পর প্রায় দু-বছর হিটলার অস্ট্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতিসংঘের নির্দেশে এক গণভোটের মাধ্যমে সার উপত্যকা জার্মানীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়। শতকরা নব্বই জন জার্মানীর সঙ্গে সংযুক্তির পক্ষে ভোট দেয়।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-জার্মান নৌচুক্তি সম্পাদন করে হিটলার কূটকৌশলের পরিচয় দেন। এর ফলে ফ্রান্সের কাছ থেকে ইংলন্ডকে বিচ্ছিন্ন করতে হিটলার সক্ষম হন। জার্মানীর সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে ইংলন্ড পরোক্ষে সমর্থন জানায়। এর ফলে হিটলার ভার্সাই সন্ধি ভঙ্গ করে জার্মান অস্ত্রসজ্জাবৃদ্ধি করেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ভার্সাই ও লোকার্নো চুক্তি ভঙ্গ করে হিটলার রাইনল্যান্ড দখল করেন এবং সেখানে অস্ত্রসজ্জা বৃদ্ধি করেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের সূত্র ধরে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলি সেখানে অংশগ্রহণ করে। এর ফলে স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কো যুদ্ধ ঘোষণা করে। হিটলার এবং মুসোলিনী এই যুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর পক্ষে যোগদান করে। স্পেনের যুদ্ধে ফ্রাঙ্কো জয়লাভ করায় সেখানে হিটলারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। স্পেনের গৃহযুদ্ধের ফলে হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে যে মনোমালিন্য ছিল তার অবসান ঘটে। পরস্পর পরস্পরের খুব কাছে চলে আসে। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে তার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি জানায়। অন্যদিকে জার্মানীও ইতালি জাপানের সঙ্গে সাম্যবাদবিরোধী (অ্যান্টিকমিনটার্ন প্যকট)চুক্তি গড়ে তোলে। ফলে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে গড়ে উঠে রোম-বার্লিন - টোকিও অক্ষশক্তি চুক্তি (Axis Powers).

প্রশ্ন

১। কিভাবে সার উপত্যকা জার্মানীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়?
২। ইঙ্গ-জার্মান নৌ-চুক্তির পরোক্ষ ফল কি ছিল?

রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষচুক্তি হিটলারকে জার্মান সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে অধিক উৎসাহী করে তোলে। ইতালির সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় হিটলার অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর আনশ্লুস নীতি কার্যকর করতে অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স হিটলারের ক্ষেত্রে কোনো সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়ার নীতি চালিয়ে যাচ্ছিল। এই উভয় শক্তি হিটলারের বিরুদ্ধে যে নীতি অনুসরণ করছিল তাকে 'তোষণ নীতি' (Policy of Appeasement) বলা যায়। নাৎসি জার্মানীর ভার্সাই চুক্তিকে অবজ্ঞা করে একের পর এক আগ্রাসী নীতির পশ্চাতে ইংলন্ড ও ফ্রান্সের এই তোষণ নীতি যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী ছিল। সাম্যবাদী সোভিয়েত রাশিয়া বারবার ইংলন্ড ও ফ্রান্সকে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের বিপদ সম্পর্কে সাবধান করলেও ইংলন্ড এবং ফ্রান্স সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে কোনোরকম বোঝাপড়ায় আগ্রহী ছিল না। বরং তাদের হিসেব ছিল যে সোভিয়েত রাশিয়া ও জার্মানীর বিরোধ বা সংঘর্ষের সব সুবিধা তারা লাভ করতে পারবে। কিন্তু তাদের এই চিন্তা-ভাবনা ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। ইংলন্ড ও ফ্রান্সের তোষণ নীতির ফলশ্রুতি হল জার্মানীর সঙ্গে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিখ্ চুক্তি সম্পাদন। এই চুক্তির মাধ্যমে হিটলারের দৃষ্টি তারা সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি নিবদ্ধ রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু ফল হল বিপরীত। মিউনিখ্ চুক্তি রাশিয়ার চোখ আরও খুলে দিল। রাশিয়া স্পষ্টতঃই বুঝতে পারল যে নাৎসি বিরোধী জোটে ইঙ্গ-ফরাসী গোষ্ঠী তার সঙ্গে কিছুতেই যোগদান করবে না। ইতিমধ্যে মিউনিখ চুক্তির পুরস্কার হিসেবে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতাল্যানন্ড জায়গাটি পেয়ে যান। এতেই হিটলার ক্ষান্ত হলেন না। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলিনের 'সসম্মানে শান্তি স্থাপন'-এর উক্তিকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে তিনি উইনস্টন চার্চিলের 'প্রথম সারির বিপর্যয়ের' ধারণাকে সত্য প্রমাণিত করলেন তাঁর আগ্রাসী নীতির মধ্য দিয়ে। মিউনিখ্ চুক্তির মাত্র সাত মাস পরেই ১৯৩৯ এ হিটলার সমগ্র চেকোশ্লোভোকিয়া জার্মানীর দখলে

ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের তোষণ নীতির সুযোগে হিটলার একের পর এক আগ্রাসী নীতির মধ্য দিয়ে চেম্বার লিগের সসম্মানে শান্তি স্থাপনের ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে উইনষ্টন চার্চিলের প্রথম সারির বিপর্যয়ের ধারণাকে প্রমাণিত করেন।

নিয়ে এলেন। মিউনিখ চুক্তি ছিল হিটলারের কূটনীতির এক বিরাট সাফল্য। এই চুক্তির মাধ্যমেই তিনি সাম্যবাদের বিরুদ্ধে ইউরোপের দুই প্রধান শক্তিকে তার দলে টেনে আনতে পেরেছিলেন। সেই সঙ্গে ভার্সাই চুক্তির সমাধিও রচনা করতে পেরেছিলেন। এর পরের ঘটনা একের পর এক দ্রুত ঘটতে লাগল। হিটলার ভার্সাই চুক্তি ভঙ্গ করে পোল্যান্ডের ডানজিগ বন্দরটি দখল করে নেয়। এর প্রত্যুত্তরে হিটলারের আক্রমণাত্মক নীতির প্রতিরোধের জন্য ইংলন্ড, ফ্রান্স এবং পোল্যান্ড পারস্পরিক আত্মরক্ষামূলক চুক্তি স্থাপন করে। এরপর ব্রিটিশ সরকার রাশিয়ার দিকে মিত্রতার হাত বাড়ালেও রাশিয়া মিউনিখ্ সম্মেলনের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ব্রিটিশদের বিশ্বস্ততায় সন্দিহানবশতঃ তাদের ডাকে সাড়া দিল না। বরং হিটলার সাম্যবাদী রাশিয়ার সঙ্গে আদর্শগত সংঘাত ভুলে মিত্রতার হাত বাড়ালে রুশ সরকার তাদের মিত্রতার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। এর ফলে ১৯৩৯ খ্রীঃ ২৩শে আগস্ট উভয় দেশের মধ্যে দশ বছরের জন্য রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তির ফলে উভয় দেশ দশ বছরের জন্য পারস্পরিক অনাক্রমণ এবং পারস্পরিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই চুক্তির গোপন শর্ত ছিল, প্রভাবের আন্তর্জাতিক ভাগাভাগি (spheres of influence)। আর্নস্ট নিয়েখ্ (Ernst Niekisch) এই চুক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'সোভিয়েত স্বার্থ বিরোধী ইঙ্গ-জার্মান সম্পর্ক নষ্ট করা ছিল সোভিয়েতের অপরিহার্য প্রয়োজন, সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি ছিল নিঃসন্দেহে এক বলিষ্ঠ বেপরোয়া অঙ্গীকার।" এই চুক্তি করে হিটলার পশ্চিম ফ্রন্টকে বাগে আনতে চেয়েছিলেন। এই চুক্তির কিছুদিনের মধ্যেই (১লা সেপ্টেম্বর), হিটলার পোল্যান্ড আক্রমণ করলে শুরু হয়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। (১৯৩৯ খ্রীঃ-১৯৪৫ খ্রীঃ)।

প্রশ্ন

১। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি কবে হয়?

২। মিউনিখ চুক্তি কাদের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল?

২.৩.২.৯ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় — আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস

(২) অলক কুমার ঘোষ — আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব (১৮৭০-২০০৪)

(৩) নীহারেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় — আধুনিক ইউরোপ সমীক্ষা (১৭৮৯-১৯৩৯)

(৪) E.H. Carr — International Relations between Two World War.
(বঙ্গানুবাদ-প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়)

(৫) A.J.P Taylor — The Course of German History

(৬) Roger Eatwell — Fascism, A History.

(৭) Philip Morgan — Italian Fascism

(৮) Robert Boyce — The origins of World War Two.

২.৩.২.১০ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) ইতালিতে ফ্যাসিবাদের উদ্ভবের কারণ বিশ্লেষণ কর।

(২) ইতালিতে কিভাবে মুসোলিনী ক্ষমতা দখল করেন?

(৩) ফ্যাসিবাদ বলতে কি বোঝায়? এর মূল নীতিগুলি আলোচনা কর।

(৪) দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে ইতালির পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা কর।

(৫) মুসোলিনী কেন আবিসিনিয়া আক্রমণ করেন? এর ফলাফল কি হয়েছিল ?

(৬) জার্মানীতে নাৎসি আন্দোলনের উদ্ভব ও অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

(৭) হিটলার জার্মানীতে কিভাবে ক্ষমতা দখল করেন? এই ক্ষমতা দখলের পশ্চাতের উপাদান বা কারণগুলি বিশ্লেষণ কর।

(৮) নাৎসি মতবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

(৯) হিটলারের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য কি ছিল? কিভাবে তিনি এই লক্ষ্য পূরণ করেন ?

২.৩.১.২ ঃ পুঁজিবাদ/ধনতন্ত্রের সংকট ঃ বিশ্ব অর্থনৈতিক বিপর্যয়

বিংশ শতকের ত্রিশের দশক পরিচিত সংকটের যুগ নামে। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংকটে পাশ্চাত্য জগৎ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। বিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং গণতান্ত্রিক রাজনীতি -- দুই ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতা পরিলক্ষিত হলেও ঐ দশকের শেষ বছরে এবং ত্রিশের দশকের শুরু থেকে গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ সংকটের জালে নিমগ্ন হয়। সংকটের প্রথম অভিব্যক্তি হল বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা বা বিপর্যয়।

রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী নিষ্ক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক দিকে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে। বিশের দশকে পাশ্চাত্য জগতে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ক্ষতিপূরণ সমস্যা সমাধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উদ্যোগ নেয়। ডয়েজ পরিকল্পনা, ইয়ং পরিকল্পনা -- এই দুই ক্ষেত্রে মার্কিন বিশেষজ্ঞদের মতামত চূড়ান্তভাবে বিবেচিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের প্রধানতম উৎপাদক ও সরবরাহকারী দেশে পরিণত হয় এবং বিভিন্ন দেশে পুঁজি বিনিয়োগে তাঁর স্থান ছিল সর্বাগ্রে। মার্কিনী ঋণের সুবাদে জার্মান ক্ষতিপূরণ সমস্যা ও আন্তঃমিত্র ঋণ পরিশোধ সমস্যা প্রভৃতি জটিল বিষয়গুলির কার্যকর মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে ইউরোপের অর্থনীতির স্থিতিশীলতা মার্কিন পুঁজির ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ১৯২৯ খ্রীঃ থেকে ১৯৩২ খ্রীঃ পর্যন্ত যে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল, তার মূলে ছিল পাশ্চাত্য অর্থনীতির এই মার্কিন কেন্দ্রিকতা কারণ মার্কিন অর্থনীতির গতিশীলতা ব্যাহত হওয়ায় পাশ্চাত্য জগতের অর্থনীতিতে বিপর্যয় নেমে এসেছিল।

ইউরোপে মার্কিন ঋণের সম্পূর্ণ স্থগিত-করণ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংকটের দিক নির্দেশ করে, সমগ্র বিশ্ব জুড়ে ক্রয়ক্ষমতা একেবারে শুকিয়ে যায় এবং সর্বনাশা মুদ্রামূল্য হ্রাস হয়।

১৯২৯ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে নিউইয়র্কে স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারমূল্যের অবনমন দিয়ে ইউরোপে অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক মন্দার সূত্রপাত ঘটে। ইউরোপে মার্কিন ঋণের সম্পূর্ণ স্থগিতকরণ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংকটের দিক নির্দেশ করে, সমগ্র বিশ্বজুড়ে ক্রয়ক্ষমতা একেবারে শুকিয়ে যায় এবং সর্বনাশা মুদ্রামূল্য হ্রাস হয়। ১৯২৯ খ্রীঃ থেকে

প্রশ্ন

১। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মহামন্দার প্রধান কারণ কি ছিল?

২। অর্থনৈতিক মহামন্দা কতবছর স্থায়ী হয়েছিল?

১৯৩৩ খ্রীঃ পর্যন্ত বিদেশে বে-সরকারী মার্কিন পুঁজি বিনিয়োগ রুদ্ধ হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মন্দা শুরু হওয়ায় আমদানি বাণিজ্যের মাত্রা সংকুচিত হয়। মার্কিন বাণিজ্যের সংকোচন বিশ্ব বাণিজ্যের ওপর চরম আঘাত হানে। কয়েক বছর ধরে চলতে থাকা এই মন্দার ফলে ইউরোপের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও ভারসাম্য নষ্ট হয়েছিল, মানুষের দৈন্যন্দিন জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল, পুঁজিবাদ ধ্বংস হওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল।

মহামন্দার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিদেশে ঋণদান স্থগিত করায় অর্থনৈতিক সমস্যা আন্তর্জাতিক চরিত্র ধারণ করে। জার্মানীতে সংকটের মাত্রা ছিল সবচেয়ে তীব্র, কেননা জার্মানী ছিল মার্কিন ঋণের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল, ১৯২৪ খ্রীঃ ডয়েজ পরিকল্পনার পরবর্ত্তী পাঁচ বছরে জার্মানী বিদেশ থেকে ৯০০ মিলিয়ন পাউন্ড অর্থ ঋণ হিসেবে সংগ্রহ করেছিল, ৫০০ মিলিয়ন পাউন্ড ক্ষতিপূরণ বাবদ পরিশোধ করেছিল। উদ্বৃত্ত অর্থ বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যয় করা হয়েছিল, কিন্তু পুঁজি বৃদ্ধির দিকে কোন নজর দেওয়া হয় নি। এই অবস্থায় বিদেশীয় পুঁজির সমাগম বন্ধ হওয়ায় জার্মান অর্থনীতি সংকটে নিমজ্জিত হল। জার্মানীর আমদানি ও রপ্তানী দুই ধরনের বাণিজ্য ধাক্কা খেল, কলকারখানা অচল হয়ে পড়ল, বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। জার্মানী ক্ষতিপূরণের কিস্তি পরিশোধ করতে অস্বীকার করল। জাতিসংঘের উদ্যোগে হাঙ্গেরী, গ্রীস ও বুলগেরিয়া যে আর্থিক ঋণ পেয়েছিল সেগুলিও পরিশোধ করতে ব্যর্থ হল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক কাঠামো ভেঙে পড়ায় ব্রিটেন বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ ব্রিটেন পরিবহন ও পণ্যের ব্যবসায়ে অর্থলগ্নী করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতো। ১৯৩১ খ্রীঃ জুলাইয়ে ব্রিটিশ বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১০০ মিলিয়ান পাউন্ড। ব্রিটিশ মুদ্রা স্টার্লিং-এর দ্রুত অবনমন শুরু হল।

১৯২৪ খ্রীঃ ডয়েজ পরিকল্পনার পরবর্তী পাঁচ বছরের জার্মানী বিদেশ থেকে ৯০০ মিলিয়ন পাউন্ড অর্থ ঋণ হিসেবে সংগ্রহ করেছিল; ৫০০ মিলিয়ন পাউন্ড ক্ষতিপূরণ বাবদ পরিশোধ করেছিল।

প্রশ্ন

১। ডয়েজ পরিকল্পনা কত সালে হয়?
২। অর্থনৈতিক মহামন্দায় সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ দেশ কোনটি?
৩। ব্রিটিশ মুদ্রার নাম কি?

মহামন্দার ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। উদার পুঁজিবাদ, অবাধ অর্থনীতি ও গণতন্ত্রের প্রচলিত মূল্যবোধের বিনষ্টি ইউরোপকে হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছিল। অর্থনৈতিক সংকট যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করেছিল, পশ্চিমের নেতৃবর্গ বহুদিন পর্যন্ত তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি। একদিকে ইউরোপের সাধারণ মানুষের গরিষ্ঠ অংশ উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক চরমপন্থার মধ্যে সমাধানের পথ খুঁজেছিল, অন্যদিকে বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্তমহল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে হতাশ হয়ে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের পথ অবলম্বন করতে চেয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার দিকে আগ্রহের যুক্তি ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার অগ্রগতিতে। একমাত্র রাশিয়াই মহামন্দার গ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করে উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখতে পেরেছিল। বলা যেতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে মহামন্দা

একদিকে ইউরোপের সাধারণ মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ রাজনৈতিক চরমপন্থার মধ্যে এই অবস্থা সমাধানের উপায় খুজছিল। অন্যদিকে বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত মহল সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের পথ অবলম্বন করতে চেয়েছিল।

প্রশ্ন

১। ইউরোপের বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্তরা কেন সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল?
২। ১৯৩২ খ্রীঃ কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন?

সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছিল। মহামন্দা পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিকে অন্ধ রুশ-বিরোধী নীতি বর্জনে বাধ্য করেছিল। বিপ্লবোত্তর রাশিয়া প্রাক্-বিপ্লব যুগে জারের গৃহীত বিদেশী ঋণ অস্বীকার করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখে নি। কিন্তু ১৯৩২ খ্রীঃ ক্ষমতায় এসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মহামন্দা কবলিত রাষ্ট্রগুলির পক্ষ থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। রাশিয়া পশ্চিমী অর্থনৈতিক জগতে আর অস্পৃশ্য ছিল না। রাজনৈতিক ও আদর্শগত দিক থেকে বিরোধীগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক দুর্দশা রাশিয়াকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছিল।

জার্মানীর সাধারণ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, পেশাদার শ্রেণী বা শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও রাজনৈতিক ক্ষোভের সদ্ব্যবহার করেছিল হিটলারের নেতৃত্বাধীন ন্যাৎসী দল। আর্থিক সংকটজনিত নৈরাশ্যের সময়ে নূতন অর্থব্যবস্থার লোভ দেখিয়েও জার্মান পুঁজিপতিদের কমিউনিষ্ট ভীতিকে কাজে লাগিয়ে ১৯৩২ খ্রীঃ হিটলার ক্ষমতা দখল করেছিলেন। মহামন্দার মোকাবিলা করতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিল, সেগুলি ছিল আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিপন্থী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় পণ্য যাতে সেদেশে প্রবেশ করতে না পারে, তার জন্য বাধার প্রাচীর তুলে দিয়েছিল। ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি আত্মরক্ষামূলক নীতি গ্রহণ করেছিল। শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণে তাদের অনীহা ছিল। বিচ্ছিন্ন ও স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থনীতি আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছিল। এই স্বতন্ত্র জাতীয় সচেতনতা, এই ক্ষয়িষ্ণু কাঠামোর সুযোগকে সদ্ব্যবহার করে হিটলার গোটা ইউরোপকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছিল। অধ্যাপক ই. এইচ. কার মন্তব্য করেছেন, ১৯৩৩ খ্রীঃ যখন অর্থনৈতিক দুর্যোগের মেঘ কেটে যেতে শুরু করে, ঠিক সেই মুহূর্তে রাজনৈতিক পরিবেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। বিভিন্ন দেশ যখন অর্থনৈতিক সংকটে নিমগ্ন, তখনই জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করার সময় হিসেবে বেছে নেয় এবং জাতিসংঘ থেকে বেরিয়ে আসে। জার্মানী একইভাবে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন থেকে প্রতিনিধি প্রত্যাহার করে নেয় এবং সমরসজ্জার দিকে দৃষ্টি দেয়। এইভাবে যৌথ নিরাপত্তা ব্যাহত হয়।

আর্থিক সংকটজনিত সময়ে নতুন অর্থব্যবস্থার লোভ দেখিয়ে ও জার্মান পুঁজিপতিদের কমিউনিষ্ট ভীতিকে কাজে লাগিয়ে ১৯৩২ খ্রীঃ হিটলার ক্ষমতা দখল করেছিলেন।

প্রশ্ন

১। হিটলার কোন পরিস্থিতিতে ক্ষমতা দখল করেছিলেন?
২। হিটলার কিভাবে জার্মানীর ক্ষমতা দখল করেছিলেন?

২.৩.১.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) David Thomson – *Europe Since Napoleon.*

(২) A.J.P. Taylor – *Origins of the Second World War.*

(৩) E.H. Carr – *International Relations Between the Two World Wars.*

(৪) প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় -- *আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস।*

(৬) অলক কুমার ঘোষ -- *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব (১৮৭০-২০০৬)।*

(৭) গৌরীপদ ভট্টাচার্য্য -- *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।*

২.৩.১.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) উনবিংশ শতকে ত্রিশের দশকে জাতিসংঘের যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার পতন কিভাবে হয়েছিল?

(২) জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখলের পিছনে কি কি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল? মাঞ্চুরিয়া সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘ কি ভূমিকা পালন করেছিল?

(৩) বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার উৎপত্তির কারণ কি? ইহা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল?

রুশ- চিন সম্পর্ক

রুশ-মার্কিন সম্পর্কের মতোই রুশ-চিন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কয়েকটি পর্যায় লক্ষনীয়। যে রুশ-চিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা সমালোচনার সম্পর্কের কথা ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে, তা প্রধানত দ্বিতীয় পর্যায়ের ঘটনা। প্রথম পর্যায়ে, অর্থাৎ স্তালিনের সময়ে রুশ-চিন সম্পর্ক ছিল সম-মনোভাবের বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। স্তালিনের পর রাশিয়ার ক্রুশ্চেভ থেকে গর্বাচভের আমল পর্যন্ত ঐ সম্পর্ক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আবৃত ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পরবর্তী পর্যায়ের রুশ-চিন সম্পর্ককে দূরত্বের লক্ষণ দিয়ে বোঝা সম্ভব।

রুশ-চিন সম্পর্কের প্রথম পর্যায় সম্পর্কে কয়েকটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। ১৯৪৯ সালের আগে থেকেই রুশ-চিন তিক্ততার সূত্রপাত, এটাই হল ভুল ধারণাগুলোর মূল কথা। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব চালানোর সময়ে চিনা কমিউনিস্ট পার্টি নাকি রুশ পার্টির কাছে সাহায্য চাওয়া সত্ত্বেও স্তালিন কোনও সাহায্য করেননি এবং সেই থেকেই তিক্ততা এইরকম একটি কথা অনেক বইতেই লেখা হয়েছে। জাতীয় কুয়োমিনটাং দলের প্রতি স্তালিনের সহানুভূতি বেশি ছিল, তাই ১৯৪৯ সালের পরেও চিন পুনর্গঠনের কাজে স্তালিনের সহযোগিতা পায়নি, এরকম কথাও শোনা যায়। কিন্তু এই সবই পরে ভুল প্রতিপন্ন হয়েছে এবং দেখা গেছে, এগুলো ছিল কুটনৈতিক প্রচারের পরিকল্পিত ভ্রান্তি।

১৯৪০-এর দশকের গোড়া থেকেই সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান স্তালিন জার্মান বিপদ নিয়ে অনেক বেশি বিব্রত ছিলেন, চৈনিক আন্দোলনের দিকে একনিষ্ঠ নজর দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। চিনা কমিউনিস্ট পার্টিও পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, চিনের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব তারা নিজেরাই সম্পূর্ণ করতে সক্ষম। সুতরাং চিন-বিপ্লবের প্রতি সোভিয়েত সহানুভূতির অভাবের কথা ঠিক নয়। একটা যুক্তি এই স্তালিন ব্রৎস্কির বিশ্ববিপ্লবের তত্ত্ব নস্যাৎ করে 'এক দেশ এক সমাজতন্ত্র'র নীতি গ্রহণ করেছিলেন বলে চিনের প্রতি নিস্পৃহ ছিলেন। কিন্তু ১৯৪০-এর দশকে ব্রৎস্কি বা স্তালিন কারও বিপ্লব-তত্ত্বই রুশ নীতির ক্ষেত্রে প্রধান ছিল না। প্রধান বিষয় ছিল হিটলারকে ঠেকানোর ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মান বিপদ কেটে যাওয়ায় রুশ নীতি আবার গঠনমূলক হয়ে যায় এবং সোভিয়েত রাশিয়া চিনের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং ১৯৪৯ সালের পরও স্তালিন চিনের ব্যাপারে নির্লিপ্ত ছিলেন, এই যুক্তি ধোপে টেকে না।

একথা ঠিক যে, চিন বিপ্লবের সময়ে দুটি পর্যায়ে মাও জে দং-এর মতের সঙ্গে স্তালিনের মতের বিরোধ হয়েছিল। ১৯৩০-এর দশকে ওয়াং মিং চিনা কমিউনিস্ট পার্টিতে মাও জে দং-এর বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন, তখন স্তালিন-এর সমর্থন ছিল ওয়াং মিং-এর দিকেই। আবার ১৯৪৫ সালে জাপানকে পর্যুদস্ত করে মাও যখন কুয়োমিনটাং-এর সঙ্গে সংঘাতের পথে যেতে চান, তখনও স্তালিন তার বিরোধিতা করেন। কিন্তু এই বিরোধিতা কখনোই তিক্ততায় পরিণত হয়নি। পরে মাও জে দং-ই

ঠিক প্রতিপন্ন হন এবং ১৯৪৯ সালে মস্কোয় স্তালিন মাও-এর কাছে ভুল স্বীকার করে নিয়ে আত্মসমালোচনা করেন।

১৯৪৯ সালে মাও জে দং মস্কোয় গিয়ে অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য স্তালিনের সঙ্গে কথা বলেন। তাছাড়াও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মঙ্গোলিয়া, পোর্টআর্থার ও দাইরেন বন্দর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং চাইনিজ ইস্টার্ন রেলওয়ের ওপর চিনা কর্তৃত্ব নিশ্চিত করা। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ সব ব্যাপারে চিনের বক্তব্যকে গুরুত্ব দেন এবং সাহায্য করতে রাজি হন। তবে ১৯৫০ সালে কোরিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, রাশিয়া ও চিন উভয়েই আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং সাহায্যের বিষয়টি অনেকটা স্থগিত হয়ে যায়। এর পেছনে সোভিয়েত ইউনিয়নের অনিচ্ছা কোনওভাবেই দায়ী ছিল। না এবং মাও জে দং তার জন্য স্তালিনকে কোনওভাবেই দোষী করেননি।

অবস্থার আমূল বদল ঘটে ১৯৫৪ সালে। ১৯৫৩ সালে স্তালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েত ক্ষমতায় এসেছিল ক্রুশ্চেভ গোষ্ঠী, অপসারিত হয়েছিল মালেনকভ গোষ্ঠী। স্তালিন চিনকে দেখেছিলেন ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে। সুতরাং বিশ্ব-কূটনীতি নয়, আদর্শগত সহানুভূতি তাঁর চিন-নীতির ভিত্তি ছিল। কিন্তু ক্রুশ্চেভ সম্পূর্ণ কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চিন-নীতি নির্ধারণ করেছিলেন, তাই তাঁর ছিল কূটনৈতিক দরাদরির মনোভাব। চিন সফরে গিয়ে তিনি কূটকৌশলে বন্দর অঞ্চলগুলির ওপর রুশ আধিপত্যের বিষয়ে চিনের আপাতসম্মতি আদায় করে এসেছিলেন। চিন তার সামরিক কৌশল হিসেবে সেইসময়ে বিষয়টি মেনে নেয়, কিন্তু রুশ-চিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সেটাই সূত্রপাত।

১৯৫৬ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২০ তম সম্মেলনে ক্রুশ্চেভ শুরু করেন নিস্তালিনীকরণ(de-Stalinisation)। তিনি স্তালিনের অন্ধ পুঁজিবাদ-বিরোধিতাকে অযৌক্তিক আখ্যা দেন এবং ব্যক্তিপুজোর বিরোধিতার নামে স্তালিন বিশ্লেষিত মার্কসবাদ- লেনিনবাদকেই আক্রমণ করেন। তাঁর মত এইরকম ঃ (ক) অব-ঔপনিবেশিক পরে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল ও কোণঠাসা, সুতরাং তার সক্রিয় বিরোধিতার আর দরকার নেই, বরং তাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক রেখে প্রাধান্যের দরাদরি করাই যুক্তিযুক্ত; (খ) অধিকাংশ অব-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং সশস্ত্র বিপ্লবের তত্ত্ব প্রচারও এখন অপ্রাসঙ্গিক। ক্রুশ্চেভের এই আদর্শগত পরিবর্তিত অবস্থানের প্রভাব সোভিয়েত বিদেশনীতিতে পড়েছিল। একদিকে যেমন আশ্বস্ত বোধ করেছিল। মার্কিনি পুঁজিপতি পক্ষ, অন্যদিকে তেমনি গুরুত্ব পেয়েছিল মার্কসবাদ-বিচ্যুত সমাজতান্ত্রিক যুগোস্লাভগোষ্ঠী। যুগোস্লাভিয়ার মার্শাল টিটো ক্রুশ্চেভের সঙ্গে যোগ দেন, আলবানিয়ার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সুযোগে সেখানে সামরিক হামলা শুরু করেন, মদত পেয়ে যান সোভিয়েতের কাছ থেকে। ক্রুশ্চেভও চেষ্টা করতে থাকেন 'ওয়ারশ চুক্তি'কে একটি নিছক

সামরিক জোটে পরিণত করতে। সোভিয়েত রাশিয়ায় এই মতবদলের কড়া সমালোচনা করে চিন, তাকে ‘সংশোধনপন্থী' ‘সামাজিক-সাম্রাজ্যবাদী' বিশ্লেষণে চিহ্নিত করে, শুরু হয় ‘আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত মহাবিতর্ক'। রুশ-চিন প্রত্যক্ষ বিরোধের সূত্রপাত এখানে থেকেই।

১৯৫৮ সালে চিনে খরা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। চিন রাশিয়ার কাছে সাহায্য আশা করে, কিন্তু সাহায্য আসেনি। ক্রুশ্চেভ পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশে সাহায্য পাঠিয়ে সেখানে রুশ আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হন আর পূর্ব ইউরোপে সাহায্য পাঠানোর অজুহাতে চিনকে সাহায্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সোভিয়েতের অক্ষমতার কথা জানিয়ে দেন চিন এতে ক্ষুণ্ন হয় বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করে। একটি হল 'Policy of Communisation' আর অন্যটি 'Policy of Grea Leap Forward' |

রাশিয়া চিনের এই দ্বিমুখী নীতিকে হাস্যকর বলে তাচ্ছিল্য করে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই চিন প্রমাণ করে যে রাশিয়ার সাহায্য ছাড়াই আর একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংগঠিত হতে পারে। যেহেতু ১৯৫০ সালে মাও জে দং উদারনীতি গ্রহণ করেছিলেন সেই কারণে ক্রুশ্চেভ মাও জে দং-কে এই অভিযোগ অভিযুক্ত করেন যে চিন সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে তরলীকৃত করে দিচ্ছে। চিন এই অভিযোগকে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু এর ফলে রুশ-চিন সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ততর হয় এবং পারস্পরিক মনোভাব কঠোর হয়ে ওঠে

রাশিয়া এই সময়ে সামরিক প্রযুক্তিতে উন্নতি করে। চিন এই সামরিক প্রযুক্তিবে গোটা সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োগ করার জন্য সোভিয়েত রাশিয়া প্রতি আহ্বান জানায়। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া চিনের এই প্রস্তাবে রাজি হয়নি যুগোস্লাভিয়ার প্রশ্নেও রুশ-চিন সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ১৯৫৯ সালে চিন বিপ্লবের দশম পূর্তি উৎসবে যোগ দিতে এসে ক্রুশ্চেভ চিন নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। চিনের সমাজতান্ত্রিক প্রয়াসকে তিনি শিশুসুলভ প্রয়াস আখ্যা দেন। তাঁর এই মন্তব্য চিনকে আহত করে এবং চিন ঘোষণা করে যে, রাশিয়া নিজেই সমাজতান্ত্রিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলে এই ধরনের বিভ্রান্তিকর ধারণার প্রচার করছে। রুশ-চিন সম্পর্ক চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছায় ১৯৬০ সালে রুমানিয়ার কমিউনিস্ট দলের বুখারেস্ট (Bucharest) সম্মেলনে। এই সম্মেলনে ক্রুশ্চেভ ঘোষণা করেন, পুঁজিবাদ তার নিজের দুর্বলতার কারণেই ধ্বংস হয়ে যাবে। চিন স্পষ্টতই বুঝতে পারে আসলে পুঁজিবাদী দুনিয়ার সঙ্গে সমঝোতার সম্পর্কে যাওয়ার এটা ছিল রাশিয়ার অপকৌশল।

১৯৭০ সালের দশকে চিনের এই আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হয়। সংশোধনপন্থী সোভিয়েত নেতৃত্ব ক্রমশ মার্কিনি সমঝোতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। যদিও বেশ কয়েকটি প্রশ্নে আমেরিকার সঙ্গে তখনও রাশিয়ার বিরোধ ছিল, কিন্তু সেই বিরোধ মোটেই আদর্শগত ছিল না এবং রুশ-মার্কিন সৌহার্দ্যের পথে সেই বিরোধ খুব বেশি বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তিব্বতের প্রশ্নে সোভিয়েত রাশিয়া চিনের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। এটা ছিল চিনের কাছে খুবই অস্বস্তিকর। অন্যদিকে ১৯৬২

সালের চিন-ভারত যুদ্ধের সময়ে রাশিয়া চিনের সমালোচনা করেছিল। তেমনি ১৯৭০ সালের পরও ভরত- পাকিস্তান সংঘাতের সময় চিন ভারতের পক্ষ না নেওয়ার চিনকে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করেছিল। এই দুটি বিষয় চিনের কাছে অত্যন্ত আপত্তিকর বলে মনে হয়েছিল। ক্রুশ্চেভ পরবর্তী সময়ে বিশেষত গর্বাচভের জমানায় রুশ-মার্কিন সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠ হয় রুশ-চিন সম্পর্ক ততই তিক্ত হয়ে যায়।

১৯৮০-র দশকে কিন্তু বিষয়টির আবার সম্পূর্ণ বদল ঘটে। ১৯৮৭ নাগাদ গর্বাচভ ই রুশ-চিন সম্পর্কে উন্নতি ঘটাতে সচেষ্ট হন। ১৯৮৮ সালের সেপ্টেম্বরে সাইবেরিয়ার ক্রাসনোইয়ারস্ক-এ দলীয় সভায় গর্বাচভ রুশ-চিন শীর্ষ আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে সোভিয়েত বিদেশমন্ত্রী এদুয়ার্দ শেভাদনাদজে এবং মে মাসে গর্বাচভ চিনে এসেছিলেন। রুশ-চিন সম্পর্কের বিষয়টি আর দুটি ভিন্নমুখী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সম্পর্কের ব্যঞ্জনায় আটকে থাকেনি। এই সময়ে দুটি দেশেরই দেহে-মনে যে পরিবর্তন এসেছিল, তাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ওপর তার প্রভাব ছিল। গভীর। দশকের শেষে সোভিয়েত ইউনিয়ন যেমন তার রাষ্ট্রীয় কাঠামো নষ্ট করতে শুরু করেছিল, তেমনি চিনও অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে ইউরোপীয় ধরনে গড়ে উঠতে চাইছিল। গর্বাচভের পর খণ্ডিত-বিখণ্ডিত পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়ার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব যথেষ্ট হ্রাস পায় এবং রাশিয়া ইয়েলৎসিনের আমলে সম্পূর্ণভাবেই মার্কিন মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। চিনের ক্ষেত্রে বিষয়টি অন্যরকম ছিল। চিন অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে ক্রমশ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার অংশীদার হয়ে পড়ে এবং রাশিয়ার মার্কিন নির্ভরতার বিপরীতে আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে চিনের প্রতি রুশ বিদেশ নীতির কোনও বাস্তব কার্যকরতাই আর ছিল না।

একুশ শতকের গোড়ায় রুশ-চিন সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করছে দুটো সমান্তরাল সংগঠন। একটি হল সাংহাই কো-অপারেটিভ অর্গানাইজেশন (SCO), আর অন্যটি হল কালেক্টিভ সিকিউরিটি ট্রিটি অর্গানাইজেশন (CSTO)। প্রথমটির সদস্য রাশিয়া, চিন, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, কিরঘিস্তান এবং তাজিকিস্তান। দ্বিতীয়টির সদস্য রাশিয়া, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, কিরঘিস্তান, তাজিকিস্তান, আর্মেনিয়া এবং বেলারুশিয়া। তফাৎ এই যে, প্রথম সংগঠনটিতে চিন আছে কিন্তু দ্বিতীয়টিতে নেই। এই পার্থক্য ঘোচানোর জন্য ২০০৭ সালের নভেম্বরে দুটো সংগঠন পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি চুক্তি সই করে। বিশেষজ্ঞরা একে রুশ-চিন ন্যাটো বলে অভিহিত করেছেন। মার্কিন সামরিক আস্ফালনের প্রতিক্রিয়াতেই সম্ভবত এই রুশ-চিন বোঝাপড়া। ২০০৮ সালের জুলাই ও নভেম্বরের রুশ-চিন সীমান্ত চুক্তি এরই অংশ। ২০০৯ থেকে ২০২০-র মধ্যে রাশিয়া ও চিন আরও বেশি কাছাকাছি চলে এসেছে। চিন একদিকে ভারত থেকে রাশিয়ার নেক নজর সরিয়ে আনতে চায় আর অন্যদিকে আমেরিকা সম্পর্কে রাশিয়ার ক্ষোভের সুযোগে তাকে পুরোপুরি মার্কিন-বিরোধী রাষ্ট্রে পরিণত করার কথা ভাবে। এর নিট ফল, ওয়াশিংটনের সঙ্গে মস্কো ও বেজিং, উভয়ের সম্পর্কেরই দ্রুত অবনতি।

গ্রন্থনির্দেশ

David K. Shipler, Russia-Broken Idols. Edmund O. Clubb, China and Russia-the Great Game. Edward Crankshaw, Khrushchev - A Career. Harold C. Hinton, China's Turbulent Quest.

Maurice Meisner, Mao's China and After

পর্যায় গ্রন্থ - ৪
Second World War and the New Political Order

একক - ২
জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও অব-উপনিবেশায়ন
Nationalist Movements and Decolonization

বিন্যাস ক্রম ঃ

২.৪.২.১ ঃ ভূমিকা (Introduction)

২.৪.২.২ ঃ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও অব-উপনিবেশায়ন (Nationalist Movement and Decolonization)

২.৪.২.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী (Suggested Readings)

২.৪.২.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Probable Questions)

২.৪.২.১ ঃ ভূমিকা (Introduction)

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের অধিকাংশই কতকগুলি পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে অথবা অবশিষ্ট দেশগুলি অপ্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসনাধীনের আওতায় এসেছিল। উক্ত 'ধনতান্ত্রিক উপনিবেশবাদ' বিশ্বের শিল্পায়িত রাষ্ট্রসমূহের এবং কৃষিভিত্তিক ঔপনিবেশিক অঞ্চলসমূহের মধ্যস্থ বাণিজ্যিক শর্তাবলীর (terms of trade) উপর নির্ভরশীল ছিল, যার দ্বারা প্রথমোক্ত দেশসমূহ (শিল্পায়িত দেশসমূহ) তার উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য শেষোক্ত অঞ্চলসমূহের স্বল্পমূল্যের খাদ্যদ্রব্য, কাঁচামাল ও খনিজসম্পদের সঙ্গে বিনিময় করত। এর বহিঃপ্রকাশ পাশ্চাত্য দেশসমূহে বসবাসকারী বিশ্বের সম্পদশালী এক-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠীর গড়পড়তা ব্যক্তিগত আয়ের সঙ্গে পূর্বের ও দক্ষিণের দেশগুলির দারিদ্র্যপীড়িত বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠীর গড়পড়তা ব্যক্তিগত আয়ের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধানের দরুন ঘটেছিল। সাম্রাজ্যবাদীরা ঔপনিবেশিক জনগোষ্ঠীর দাসত্বকরণকে চিরস্থায়ী করার আশায় তাদের কতকগুলি ক্ষুদ্র ও শ্লথগতিসম্পন্ন কনসেশন বা ছাড় প্রদান করেছিল যা তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসমূহের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করত না।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 'ধনতান্ত্রিক উপনিবেশবাদ' বিশ্বের শিল্পায়িত রাষ্ট্রসমূহের এবং কৃষিভিত্তিক উপনিবেশিক অঞ্চলগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

প্রশ্ন

১। শিল্পায়িত দেশ বলতে কি বোঝ?

২। ঔপনিবেশিক শাসন চিরস্থায়ী করতে সাম্রাজ্যবাদীরা কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল?

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের নিজস্ব কবর খোঁড়ার ভূমিকাও পালন করেছিল, কারণ ঔপনিবেশিক জগতে আগ্নেয়াস্ত্র, শাসকবর্গ ও পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের ধ্যানধারণাসহ অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রবাহিত হয়েছিল। এশিয়ান ও আফ্রিকানগণ পাশ্চাত্যের সম্পদের বৈপরীত্যে তাদের নিজস্ব দারিদ্র্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণের ও নিজেদের রাজনৈতিক ভাগ্য নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার দাবি করেছিল। সেখানকার ঔপনিবেশিক সমাজগুলির উচ্চবর্গীয় শ্রেণীদের (এলিট শ্রেণীভুক্ত) পাশ্চাত্য শিক্ষিত সন্তানসমূহকে নিয়ে গঠিত একটি ক্ষুদ্র কিন্তু অসন্তুষ্ট বুদ্ধিজীবী শ্রেণীই ঔপনিবেশিকতা বিরোধী জাতীয়তাবাদের প্রথম ধারক ও বাহকে পরিণত হয়। উপরোক্ত বাস্তব ও বাধ্যবাধকতাযুক্ত পরিস্থিতিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, ঔপনিবেশিকতা বিরোধী বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধসমূহের সৃষ্টি হয়েছিল। সেগুলিকে বর্বর দমনপীড়নমূলক পরিস্থিতির সঙ্গে এবং কখনও অনিচ্ছানির্ভর অথবা কখনও সদয় কনসেশন বা ছাড় প্রদানপূর্বক মোকাবিলা করা হত। মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব ও শ্রেণীদ্বন্দ্বসমূহকে বুলেট, ব্যালট ও উৎকোচ প্রদানপূর্বক মোকাবিলা করা হত। এছাড়া সেখানে বৃহৎ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতাসমূহ জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত হয়।

এশিয়া ও আফ্রিকার এলিট সম্প্রদায় জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক ভাগ্য নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার দাবী করে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সূচনা করেছিল।

প্রশ্ন

১। 'এলিট' কাদের বলা হয়?

২। তৃতীয় বিশ্বের আন্দোলনগুলি কিভাবে মোকাবিলা করা হয়েছিল?

২.৪.২.২ ঃ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও অব-উপনিবেশায়ন (Nationalist Movement and Decolonization)

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী আন্দোলনসমূহ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দশক থেকে বিকাশশীল ছিল, কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনার অর্ধশতকের মধ্যে পাশ্চাত্যের ও জাপানী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যসমূহের প্রায় পুরোপুরি নিশ্চিহ্নকরণের আলোকে উক্ত আন্দোলনসমূহ যতটা উল্লেখযোগ্য আকার ধারণ করবে ভাবা হয়েছিল, ততটা সম্ভবপর হয়নি। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অধিকতর জটিলতম ঔপনিবেশিক দেশসমূহে ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী আন্দোলনসমূহের বিকাশের সূচনা হয়, কিন্তু পারস্যের ন্যায় সে দেশগুলিতে শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য প্রভাবিত এলিট শ্রেণীভুক্তদের ও প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহকদের মধ্যে রাজনৈতিক শক্তির জন্য প্রয়োজনীয় মৈত্রীজোট গড়ে তোলা যায়নি। বৃহৎ ঔপনিবেশিক শক্তিদের মধ্যে কেবলমাত্র প্রাচীনতম ও বৃহত্তম শক্তি ব্রিটেনকেই ১৯১৪ সালের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ বসতি অধ্যুষিত উপনিবেশসমূহ, যাদের ১৯০৭ সাল থেকে ডোমিনিয়ন আখ্যা দেওয়া হয়, যেমন কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা — এদের কার্যত স্বাধীনতা মেনে নিতে হয়। এদের মধ্যে একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গরা সংখ্যাগরিষ্ঠ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অর্ধশতকের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী আন্দোলন আশানুরূপ হয়নি। তথাপি ১৯১৪ সালের মধ্যে প্রাচীনতম ও ব্রিটেনকে শেতাঙ্গ অধ্যুষিত উপনিবেশসমূহের স্বাধীনতা স্বীকার করে নিতে হয়। এ সময় ভারতে একটি প্রকৃত ঔপনিবেশিকবাদ বিরোধী আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।

জনগোষ্ঠী হলেও শাসনক্ষমতা শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশকারীদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। আয়ারল্যাণ্ড যা ইউরোপের একটি ব্রিটিশ উপনিবেশ এবং সম্পূর্ণরূপে শ্বেতাঙ্গদের দেশ, তা সর্বদাই সমস্যা জর্জরিত ছিল। যাইহোক, ১৮৯০ পরবর্তীকালে ল্যাণ্ডলীগ ও পার্নেল এর বিস্ফোরক গোলযোগপূর্ণ বছরগুলি আইরিশদের রাজনৈতিক বিবাদজনিত কারণেও ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর একই সঙ্গে গৃহীত নিষ্ঠুর দমনপীড়নমূলক পদ্ধতি ও সুদূরপ্রসারী কৃষিভিত্তিক ভূমিসংস্কার নীতির সমাহারের দরুন কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল।

উক্ত সময়কালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কোথাও দৃশ্যত বিপন্ন প্রতীয়মান হয়নি। যাইহোক, একটি প্রকৃত ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী আন্দোলন ভারতে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায়, যেখানে একটি প্রভাবশালী বুর্জোয়াশ্রেণী (যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল বাণিজ্যিক, আর্থিক, শিল্পকেন্দ্রিক ও পেশাদার শ্রেণী)- ভারতীয়দের অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক ক্লীবত্ব ও সামাজিক হীনতার দরুন ক্রমবর্ধমান মাত্রায় অসন্তোষ প্রকাশ করতে থাকে। ওইরূপ অসন্তোষ ইংরাজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী কর্তৃক উচ্চারিত হতে দেখা যায়। ইতিমধ্যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের (১৮৮৫ সালে স্থাপিত) উদ্যোগে একটি স্বশাসনের আন্দোলনের সূচনা হয়, যে দল পরে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের দলে পরিণত হয়।

প্রশ্ন

১। ডোমিনিয়ন দেশগুলি কি কি?

২। ভারতে জাতীয় কংগ্রেস কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

বিংশ শতাব্দীর প্রাথমিক পর্বের মধ্যে কংগ্রেস একটি ক্রমবর্ধমান শক্তি হয়ে উঠলেও তা মূলত ভারতের প্রশাসনিক সংস্কার ও অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণের জন্য আন্দোলনকারী একটি এলিট তথা উচ্চবর্গীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্যকর ছিল। ভারতীয় জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ উক্ত প্রক্রিয়ার বাইরে ছিল, কারণ এলিট তথা উচ্চবর্গীয়দের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল ভারতীয় জনগণের ব্যাপক অংশ যারা মূলত অশিক্ষিত শ্রেণীভুক্ত, যারা চিরাচরিত বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও মতাদর্শকেন্দ্রিক সমাজের অঙ্গ। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান কর্তব্য ছিল কিরূপে এর আধুনিকতাবাদী কর্মসূচিকে ব্যাহত না করেও মূলত ঐতিহ্যবাদী ও আধুনিকতাবাদ বিরোধী জনগণকে গতিশীল করে তোলা যায়। বাংলাকে মূলত মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গ (আসামসহ) ও হিন্দুঅধ্যুষিত পশ্চিমবাংলায় (বিহার-উড়িষ্যাসহ) বিভক্ত করবার ব্রিটিশ পরিকল্পনার দরুন সর্বপ্রথম ১৯০৫-১৯০৯ সালে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন একটি ব্যাপক গণআন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যা এর সূচনাকাল থেকে কংগ্রেস আন্দোলনের বামদিকে অবস্থিত ছিল এবং যা কখনই এর সঙ্গে পুরোপুরি সংহতিসাধন করেনি, তা উক্ত পর্যায়ে গণসমর্থন আদায়ের জন্য ধর্মীয় মতাদর্শকেন্দ্রিক আবেদন রাখে। উক্ত আন্দোলনে আইরিশ জাতীয়তাবাদী (মূলত ক্যাথলিক) ও রাশিয়ান নারদনিক আন্দোলনের ন্যায় পাশ্চাত্য বিপ্লবী আন্দোলনগুলির অনুকরণপ্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। উক্ত আন্দোলন ভারতের সর্বপ্রথম বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের জন্ম দেয়, যা পরে জনপ্রিয় আন্দোলনের সূতিকাগারে পরিণত হয়।

১৯০৫-০৯ সালের মধ্যে কংগ্রেস ভারতের প্রশাসনিক সংস্কার এবং অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণের জন্য আন্দোলনকারী এলিট তথা উচ্চবর্গীয় প্রতিষ্ঠান থেকে একটি ব্যাপক গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।

পশ্চিমভারতে ইতিমধ্যেই চিরাচরিত ঐতিহ্যমন্ডিত ধর্মকেন্দ্রিক আবেদনসম্ভূত আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে যার

মূল উদ্দেশ্য ছিল অশিক্ষিত নিরক্ষর জনগণকে এর অঙ্গীভূত করা। সেখানে বালগঙ্গাধর তিলক গো-জাতির পবিত্রতারক্ষা, দশমবর্ষীয়া বালিকাবিবাহের বিরুদ্ধে বিদেশি মনোভাবাপন্নদের আক্রমণের বিরোধিতা করে বেশ কিছুটা জনসমর্থন আদায়ে সক্ষম হন। এর ফলে ভারতের উপর ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণকে নাড়া না দেওয়া গেলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রকগণ সর্বপ্রথম ভারতীয়দের কিছুটা পরিমাণে স্বায়ত্বশাসন দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই সময়েই

প্রশ্ন

১। কত সালে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়?
২। স্বায়ত্বশাসন বলতে কি বোঝায়?

কংগ্রেস সর্বপ্রথম ১৯০৬ সালে স্বশাসনের (স্বরাজ) দাবি তোলে।

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মহামন্দা ও রুশ অক্টেবর বিপ্লবের প্রভাবে মিশরের ওয়াফদ আন্দোলন ব্রিটিশ শাসন থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলস্বরূপ অনুসৃত বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মহামন্দা (the Great Depression) এবং রুশ অক্টোবর বিপ্লবের (১৯১৭) প্রভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিশাল প্রবাহ দেখা দেয় যা ঔপনিবেশিক পদ্ধতিকে আন্দোলিত করবার সূচনা করে। মিশরে ওয়াফদ (Wafd) নামে পরিচিত স্বশাসনের আন্দোলন/প্রতিষ্ঠান/দল ব্রিটিশ শাসন থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে। সেখানে তিনবছরের সংগ্রামের দরুন ব্রিটিশ শক্তি প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসন পরিত্যাগ করে কমমাত্রায় প্রত্যক্ষ পরিচালন

প্রশ্ন

১। মিশরের মুক্তি আন্দোলনের নাম কি?
২। ওয়াফদ আন্দোলন কত বছর ধরে চলেছিল?

পদ্ধতি গ্রহণ করে, যার অন্তর্নিহিত অর্থ ছিল প্রশাসনের কিছু পরিমাণ মিশরীয়করণ।

ভারতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে গণ-জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ব্যাপক রূপান্তরসাধন অনুষ্ঠিত হয়। যার আংশিক কারণ ছিল রক্তপানকারী ব্রিটিশ জেনারেল ডায়ারের নৃশংসতা, যিনি জালিয়ান ওয়ালাবাগের বাহিরপথহীন বেষ্টিত মাঠে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলিচালনাপূর্বক গণহত্যা করেন, কিন্তু এর মূল কারণ শ্রমিক আন্দোলনের প্রবাহ, গান্ধী আহুত গণ অসহযোগ আন্দোলন ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী কংগ্রেস প্রভৃতির একত্র সমাহার। মুহূর্তের জন্য সেখানে মুক্তি আন্দোলন গগনচুম্বী উচ্চতায় পৌঁছেছিল। গান্ধীজি ঘোষণা করেছিলেন যে ১৯২১ সালের মধ্যে স্বরাজ অর্জন করা সম্ভবপর হবে। আন্দোলন শহরাঞ্চল থেকে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সেইসময় থেকে ভারতে প্রায়ই সাময়িক বিরতিপূর্ণ অশাসনযোগ্য পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ব্রিটেনের শাসকশ্রেণী উপলব্ধি করে যে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ জাতীয়তাবাদীসহ ভারতীয় এলিট শ্রেণীর সহিত বোঝাপড়ার মধ্যে নিহিত আছে। ১৯৩০-এর প্রথমার্ধে আইন-অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় প্রবাহ, ব্রিটিশ কর্তৃক প্রদত্ত ১৯৩৫ সালের বোঝাপড়ামূলক ভারত শাসন আইন-যার ফলাফলস্বরূপ ১৯৩৭

গান্ধীজি ঘোষণা করেন ১৯২১ সালের মধ্যে স্বরাজ অর্জন করা হবে। সেই সময় থেকে প্রায়ই— সাময়িক বিরতিপূর্ণ অশাসন যোগ্য পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

প্রশ্ন

১। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের রূপক কে ছিলেন?
২। কত সালে ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়?

সালে অনুষ্ঠিত প্রথম ভারতব্যাপী সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের দেশব্যাপী সমর্থন পরিলক্ষিত হয়।

গণ বিপ্লবী আন্দোলনগুলি ১৯৩৫ ও ৩৮ সালের মধ্যে সুস্পষ্টরূপ আত্মপ্রকাশ করে। কেবলমাত্র, সাব-সাহারান আফ্রিকা তখনও শান্ত ছিল। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'কৃষ্ণাঙ্গ আন্দোলন', ফ্রান্সের পপুলার ফ্রন্ট ও কম্যুনিস্ট আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত ভবিষ্যত জাতীয়তাবাদী নেতাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

গণ বিপ্লবী আন্দোলনসমূহ ঔপনিবেশিক জগতের অন্যান্য অঞ্চলেও আত্মপ্রকাশ করে। আফ্রিকার ফরাসী ইসলামিক উপনিবেশসমূহ যথা টিউনিশিয়া, আলজিরিয়া এবং এমনকি মরক্কোতে আধুনিকতাবাদী ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী আন্দোলন দেখা দেয়। এছাড়া সর্বপ্রথম ফরাসী ইন্দোচীন অর্থাৎ বর্তমানকালের ভিয়েতনাম, লাওস এবং কাম্বোডিয়াতে গণপ্রতিবাদী আন্দোলন উল্লেখযোগ্য মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের নিয়ন্ত্রণ ইন্দোনেশিয়াতে মূলত এইজন্য বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল; কারণ সেখানে ইসলামিক, কম্যুনিস্ট ও ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী ইত্যাদি বিভিন্ন ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী শক্তিসমূহ নিজেদের মধ্যে বিভক্ত ছিল ও একে অপরের বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল। ব্রিটিশ ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে তখনও পর্যন্ত অস্বীকৃত গণঅসন্তোষ ট্রিনিদাদ-এর তেলের খনিতে ও জামাইকার আবাদী (plantation) খামারগুলিতে কতকগুলি ধর্মঘটের মাধ্যমে ১৯৩৫ ও ৩৮ সালের মধ্যে সুস্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করে যা শেষপর্যন্ত দাঙ্গায় ও দ্বীপব্যাপী সংঘাতে পর্যবসিত হয়।

কেবলমাত্র সাব-সাহারান আফ্রিকা তখনও পর্যন্ত শান্ত ছিল যদিও ১৯৩৫-৪০ সালের মধ্যে শ্রমিকদের গণ-ধর্মঘট-এর প্রবাহ আফ্রিকাতে দেখা দেয়। তবে সেখানেও পাশ্চাত্য শিক্ষিত আফ্রিকানদের অসন্তুষ্ট একটি শ্রেণী বিকাশশীল রাজনৈতিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রশাসন ও পুলিশ এর বিরুদ্ধে প্রচার চালায়, সামাজিক পুনর্গঠনের দাবি করে ও অর্থনৈতিক সংকটদ্বারা পীড়িত বেকারশ্রেণী ও আফ্রিকান কৃষকশ্রেণীর স্বপক্ষে দাঁড়ায়। ইতিমধ্যেই সেখানে কেনিয়ার জোমোকেনিয়াট্টা, নাইজিরিয়ার ডঃ নামদি আজিকিউয়ের ন্যায় আফ্রিকার ভবিষ্যৎ জাতীয়তাবাদের নেতাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ আন্দোলন, ফ্রান্সের পপুলার ফ্রন্ট আন্দোলন ও এমনকি কম্যুনিস্ট আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

প্রশ্ন

১। ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক শক্তি কেন তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল?

২। ডঃ নামদি কে ছিলেন?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পূর্বেই ঔপনিবেশকতাবাদের পতন অনিবার্য হয়ে উঠছিল ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের নায়কদের নিকট দুটি মাত্র পথ উন্মুক্ত ছিল, প্রথমত স্বাধীনতার দাবিকে সন্মানজনকভাবে মেনে নিয়ে সেখানে কিছুটা প্রভাব বজায় রাখা অথবা প্রচন্ডভাবে লড়াই করে শেষপর্যন্ত চূড়ান্তভাবে পরাজিত হওয়া।

ইরানে ডঃ মোহাম্মদ মোসাদেক-এর নেতৃত্বে জনপ্রিয় সরকার গঠন এবং মিশরে জামাল আবদেল নাসেরের নেতৃত্বে সংগঠিত বিপ্লব ব্রিটিশ ও ফরাসীদের পূর্বোক্ত রূপান্তরসাধন প্রক্রিয়াকে বানচাল করার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে।

১৯৪০ ও '৫০ এর দশকে ব্রিটেন প্রথমোক্ত পথ অনুসরণ করে ও এইভাবে প্রাক্তন উপনিবেশগুলি বা বর্তমানে স্বাধীন, তার অধিকাংশ দেশকে কমনওয়েলথ-এর মধ্যে রাখতে সমর্থ হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ল্যাটিন আমেরিকা ও ফিলিপাইন্স-এ অনুরূপ পথ অনুসরণ করে।

ওলন্দাজরা শক্তি প্রয়োগ করে ও ইন্দোনেশিয়ার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ধরে রাখবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে ফরাসী ঔপনিবেশিক শক্তি প্রথমে ব্রিটিশ ও পরে মার্কিন সমর্থনে হো-চি-মিন এর নেতৃত্বে ভিয়েতনামে ইতিমধ্যেই মুক্তিপ্রাপ্ত অঞ্চলসমূহকে পুনরায় অধিকার করে ধরে রাখবার মরীয়া প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু তারা সেখানে পরাজিত হয় ও ১৯৫৪ সালে ভিয়েতনাম থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামের ঐক্যসাধনকে বাধাদানের উদ্দেশ্যে ভিয়েতনামের দক্ষিণ প্রান্তে তাদের এক তাবেদার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। শেষপর্যন্ত দীর্ঘ দুই দশকব্যাপী ব্যাপক যুদ্ধ চালিয়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ১৯৭৫ সালে পরাজয় স্বীকার করে ভিয়েতনাম থেকে চলে যেতে হয় ও ভিয়েতনামের ঐক্যসাধন সম্পূর্ণ হয়।

পারস্য থেকে মরক্কো পর্যন্ত পশ্চিমের ইসলামিক অঞ্চলভুক্ত দেশসমূহে কতকগুলি জনপ্রিয় আন্দোলনসমূহ, বিপ্লবী অভ্যুত্থান ও বিদ্রোহের মাধ্যমে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়, যার সূচনা হয়েছিল ১৯৫১ সালে ইরানে পাশ্চাত্যের তেল কোম্পানিগুলির জাতীয়করণ, তৎকালীন শক্তিশালী তুদে কম্যুনিস্ট পার্টির সমর্থনে ডঃ মোহাম্মদ মোসাদেক এর জনপ্রিয় সরকার গঠন প্রভৃতি প্রক্রিয়ার দ্বারা। এরপর মিশরে কর্নেল গামাল আবদেল নাসের এর

প্রশ্ন

১। ইরাকে তেল কোম্পানীগুলির জাতীয়করণ কবে করা হয়?
২। মিশর বিপ্লবের নেতা কে ছিলেন?

নেতৃত্বে সংগঠিত বিপ্লব ও তারপর ইরাক ও সিরিয়ার পাশ্চাত্যের তাবেদার সরকারকে উৎখাত করে বিপ্লব সফল হলে তা ব্রিটিশ ও ফরাসীদের পূর্বোক্ত রূপান্তরসাধন প্রক্রিয়াকে বানচাল করবার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে।

কেনিয়াতে উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় বিদ্রোহ ও গেরিলা যুদ্ধ দেখা দিলেও তা মূলত সেখানকার একটি আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল যার নাম ছিল মৌ মৌ/ মাউমাউ আন্দোলন (১৯৫০-৫৬)। ব্রিটিশ আফ্রিকাতে পূর্বতন গোল্ড কোষ্ট এ (বর্তমান ঘানা) এক প্যান আফ্রিকান বুদ্ধিজীবী কওয়ামে নক্রুমার নেতৃত্বে একটি গণ দলের অধীনে গণআন্দোলন দেখা দেয়।

১৯৬০ এর বছরটি ছিল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের গোধুলিলগ্ন। বর্তমানে ঔপনিবেশিকতাবাদ মৃত, কারণ এর প্রধান সম্পদ বর্তমানে অবলুপ্ত।

১৯৬০-এর বছরটি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের গোধুলিলগ্ন ছিল এবং ঔপনিবেশিকতাবাদের অবসান সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছিল। পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক দেশসমূহ তাদের বিশ্বজয়ের প্রচেষ্টায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শক্তিসমূহ দ্বারা চূড়ান্তরূপে পরাজিত হয়।

প্রশ্ন

১। কোন সময়কে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের গোধূলিলগ্ন বলা হয়?
২। কোরিয়ার আঞ্চলিক আন্দোলনের নাম কি ছিল?

ঔপনিবেশিকতাবাদ বর্তমানে মৃত; কারণ এর প্রধান সম্পদ বর্তমানে অবলুপ্ত হয়েছে, অর্থাৎ ঔপনিবেশিক জনগোষ্ঠির আবার বিজিত হবার পর কতিপয় দখলদারগণ কর্তৃক নীরবে শাসিত হওয়ার মনোভাবের আমূল পরিবর্তন জনিত কারণেই ঔপনিবেশিকতাবাদের অবসান ঘটেছে।

২.৪.২.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Suggested Readings)

1. McWilliams, W. C. and Piotrowski, Harry — The World Since 1945.
2. Calvocarresi, Peter — World Politics since 1945.
3. Eugeno Kim, C. I. and Ziring Lawrence — An Introduction to Asian Politics.
4. Kennedy, P. — The Rise & Fall of the Great Powers.
5. Kedourie, Elie, (ed.) — Nationalism in Africa and Asia.
6. Thomas, C. — In search of security. The Third World in International Relation.
7. Vadney, T. E. — The World since 1945.

২.৪.২.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Probable Questions)

1. How was the post-war bi-polar World politics affected by the rise of the decolonised Third World Countries ?

   (তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অব-উপনিবেশায়নের উদ্ভব কিভাবে দ্বিমেরু বিশ্ব রাজনীতিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে প্রভাবিত করেছিল?)

2. How did the process of post-second world war decolonisation give rise to the 'Third World' in South and South East Asia ?

   (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালের অব-উপনিবেশায়নের প্রক্রিয়া কিভাবে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তৃতীয় বিশ্বের উদ্ভব ঘটিয়েছিল?)

3. How do you explain the end of Imperialism and Colonialism after the end of the second world war ?

   (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর তুমি সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদের অবসান কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?)

4. How do you account for the rise of the anti-colonial revolution andthe process of de-colonization in Asia, Africa and Latin America in the aftermath of the World War II ?

   (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকায় ঔপনিবেশিকতা বিরোধী বিপ্লব এবং অব-উপনিবেশায়নের আন্দোলনের প্রক্রিয়া তুমি কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?)

5. Why and how national liberation movements emerged in the colonised countries of the third world leading to the twilight of the empires and the end of colonialism ?

   (তৃতীয় বিশ্বের ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে কেন এবং কিভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের উদ্ভব ঘটেছিল যার ফলে সাম্রাজ্যবাদের গোধুলি (সন্ধ্যালোক) এবং ঔপনিবেশিকতাবাদের অবসান সূচিত হয়েছিল?)

———————

পর্যায় গ্রন্থ - ৫

একক - ১

ঠাণ্ডা লড়াই-এর আদর্শগত এবং রাজনৈতিক ভিত্তি ঃ সন্ধি এবং চুক্তিসমূহ ঃ উত্তেজনা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা

Ideological and Political Basis of Cold War; Pacts and Treaties; Tensions and Rivalries

---

বিন্যাস ক্রম ঃ

২.৫.১.০ ঃ উদ্দেশ্য (Objective)

২.৫.১.১ ঃ ভূমিকা (Introduction)

২.৫.১.১.১ ঃ ঐতিহ্যমণ্ডিত গোঁড়া মনোভাব (Traditional Orthodox View)

২.৫.১.১.২ ঃ সংশোধনবাদী মতামত (Revisionist View)

২.৫.১.১.৩ ঃ তৃতীয় মতামত (Third View)

২.৫.১.১.৪ ঃ বিভিন্ন মতামতের মূল্যায়ণ (Assessment of different views)

২.৫.১.২ ঃ ঠাণ্ডা লড়াই-এর উদ্ভব ও প্রসারের বিভিন্ন পর্যায় (Origin of Cold War and different Phases of Development)

২.৫.১.৩ ঃ উপসংহার (Conclusion)

২.৫.১.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী (References)

২.৫.১.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Probable Questions)

২.৫.১.০ ঃ ভূমিকা (Introduction)

১৯৪৫ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে ব্যাপক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত যা সাধারণত Cold War বা ঠাণ্ডা লড়াই বলে অভিহিত হয়ে থাকে , তা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল। মার্কিন পণ্ডিতগণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক জগতে সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্ক যে বৈরিতাপূর্ণ নীতি দ্বারা চিহ্নিত, তার কারণসমূহের বহুবিধ ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। উক্ত ব্যাখ্যাসমূহকে মূলতঃ দুভাগে করা যায় — যথা Traditional বা ঐতিহ্যবাদী এবং Revisionist বা সংশোধনবাদী।

২.৫.১.১.১ ঃ ঐতিহ্যমণ্ডিত গোঁড়া মনোভাব (Traditional Orthodox View)

ঐতিহ্যমণ্ডিত অথবা গোঁড়া মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি যা মূলতঃ মার্কিন সরকার কর্তৃক উপস্থাপিত হয়েছিল এবং সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত অধিকাংশ মার্কিন পণ্ডিতবর্গ কর্তৃক যার যাথার্থ্য পুনসমর্থিত হয়েছে, তা ছিল এই যে, ঠাণ্ডা লড়াই কমিউনিস্ট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মুক্ত জনগণের (Free men) সাহসিকতাপূর্ণ অপরিহার্য প্রতিক্রিয়া। উক্ত মতে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং বিশেষতঃ তার রাষ্ট্রনায়ক স্টালিনের অনুসৃত নীতিসমূহ যা তিনি যুদ্ধের শেষ মাসগুলিতে ও যুদ্ধ পরবর্তী অব্যবহিত পর্বে গ্রহণ করেছিলেন তাকে প্রধানত অথবা সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধকালীন মিত্রশক্তির সহযোগিতার ভাঙ্গন ও ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উদ্ভব এর জন্য দায়ী করা হয়েছে। গোঁড়া লেখকগণের অভিমতে কমিউনিস্ট মতাদর্শ যা ধনতন্ত্রবাদকে ধ্বংস করতে চায়, তার মহান প্রবক্তা জোসেফ স্টালিন ইয়াল্টা সম্মেলনে (১৯৪৫) তার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গপূর্বক কমিনফর্ম (Cominform) স্থাপন করে পূর্ব ইয়োরোপে সোভিয়েটের দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন; চেকোস্লোভাকিয়াতে অভ্যুত্থান ঘটান এবং ফ্রান্স ও ইটালীর কমিউনিস্ট পার্টিদের তাদের সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক কার্যকলাপে প্ররোচিত করেন। ইয়োরোপ জুড়ে সোভিয়েট সম্প্রসারণের উক্ত পরিকল্পনা, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কমিউনিস্ট নেতৃবর্গের মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি ও আকাঙ্ক্ষাসমূহ — এই সকলের সম্মিলিত ফলাফলে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূচনা হয়েছিল।

ঐতিহ্যমণ্ডিত গোঁড়া মনোভাব মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং বিশেষতঃ তার রাষ্ট্রনায়ক স্টালিনের অনুসৃত নীতিসমূহকে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উদ্ভব এর জন্য দায়ী করেছেন।

প্রশ্ন ১। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উদ্ভবের পিছনে Traditionalist ঐতিহাসিকদের মতবাদ কি?

২.৫.১.১.২ ঃ সংশোধনবাদী মতামত (Revisionist View)

গোঁড়া (Orthodox) মতামতের বিরোধিতা করে সংশোধনবাদী (Revisionist) লেখকরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মূল কারণ। এছাড়া তাঁরা বলেন যে ১৯৪৫-৪৭ সালের মধ্যে অবাস্তব এবং কিছু সময়কালব্যাপী অতীব দুর্দমনীয় মার্কিন কূটনীতিই সোভিয়েট ইউনিয়নের বিকল্প নীতি (alternative policy) উন্মুক্ত রাখার বিষয়টিকে সঙ্কুচিত করে অত্যন্ত কঠোর নীতি (hardline policies) গ্রহণে প্ররোচিত করেছিল। উদাহরণস্বরূপ সকল পূর্ব ইউরোপের অনুগতকরণ/উপগ্রহকরণ (Satellisation), যা হয়ত সে অন্য অবস্থায় গ্রহণ করত না। কেনেথ ডব্লিউ থমসন (Kenneth W. Thomson) কে অনুসরণ করে সংশোধনবাদী লেখকদের দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যায়, নরমপন্থী (soft) এবং কঠোর (hard) সংশোধনবাদী (Revisionist).

প্রথমোক্ত মতে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উদ্ভবকে পূর্বতন রাষ্ট্রপতি ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট-এর (Francklin d. Roosevelt) নীতি অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তদানীন্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান (Truman) এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতাদের ব্যর্থতাকেই দায়ী করেছেন। নরমপন্থী সংশোধনবাদী লেখকদের মতে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের মৃত্যু এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত যুদ্ধকালীন সহযোগিতার নীতি

পরিত্যাগ করেন এবং আণবিক বোমার একচেটিয়া অধিকারে উল্লসিত হয়ে পূর্ব ইউরোপ থেকে সকল সোভিয়েট প্রভাব মুক্ত করার ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে কমিউনিস্ট বিরোধী পাশ্চাত্যপন্থী সরকারসমূহ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কঠোরনীতি গ্রহণ করেন। উক্ত আমূল পরিবর্তিত নূতন মার্কিন নীতি অর্থাৎ কমিউনিজম বিরোধী নীতি সোভিয়েট সীমান্তসমূহ রক্ষার বিষয়ে কোন বিকল্প পথ খোলা না পেয়ে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য করে। সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহে বিশেষতঃ পোল্যান্ডে বন্ধুত্বপূর্ণ সরকার প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক ছিল এবং উক্ত সোভিয়েত স্বার্থকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ স্বীকৃতি দিতে পারেনি। এইরূপে দেখা যায় যে রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের অধীনে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির আমূল পরিবর্তন স্টালিনের ১৯৪৭-৪৮ সালে গৃহীত নীতিসমূহের কারণ ছিল — যথা মার্শাল পরিকল্পনার বাতিলকরণ, কমিনফর্ম (Cominform) এর প্রতিষ্ঠা, চেকোস্লোভাকিয়ার অভ্যুত্থান এবং বার্লিন (পশ্চিম) অবরোধ।

সংশোধনবাদীদের মতে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের মৃত্যু এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত যুদ্ধকালীন সহযোগিতার নীতি পরিত্যাগ করেন এবং আণবিক বোমার একচেটিয়া অধিকারে উল্লসিত হয়ে পূর্ব ইউরোপ থেকে সকল সোভিয়েট প্রভাব মুক্ত করার যে নীতি নিয়েছিলেন তাঁরই ফলশ্রুতি হল ঠান্ডা লড়াই।

কঠোর সংশোধনবাদীরা (hardline revisionists) ঠাণ্ডা লড়াইয়ের কারণকে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ও বর্ধিত উৎপাদন সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিদেশিবাজার ধরার জন্য মার্কিন পুঁজিবাদের প্রয়োজনীয়তার উপর ব্যাখ্যা করেছেন। জয়েস্ ও গ্যাব্রিয়েল কোলকো (Joyce & Gabriel Kolko) লিখেছেন রাজনৈতিক দিক থেকে বিশ্বস্ত ও স্থিতিশীল ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ দ্বারা গঠিত আন্তর্জাতিক জগৎ যেখানে অত্যাবশ্যকীয় কাঁচামালের অবাধ সরবরাহ থাকবে, কেবলমাত্র সেখানেই মার্কিন বাণিজ্যকে পরিচালনা করা যাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলস্বরূপ পরিবর্তন, অভ্যুত্থান ও বিপ্লবের শক্তিসমূহ দ্বারা প্রবাহিত বিশ্বে উক্ত অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্থিতাবস্থার পুনঃস্থাপনে বদ্ধপরিকর ছিল। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের যে কোন জায়গায় যে কোন আন্দোলন যা মার্কিন সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমূল পরিবর্তনকামী তাকে ধ্বংস করবার প্রতি-বিপ্লবীনীতি (Counter-Revolutionary Policy) গ্রহণ করে। ওইরূপ আমূল পরিবর্তন প্রতিরোধ করবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপে কমিউনিজমের সংযতকরণ নীতি (Containment of Communism Policy) ও এশিয়া ও ল্যাটিন অ্যামেরিকায় মার্কিন শক্তি ও দায়বদ্ধতা সম্প্রসারিত করবার প্রচেষ্টা চালায়। সুতরাং কঠোর সংশোধনবাদী (hard revisionist)-দের মতে ঠাণ্ডা লড়াই ততটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল না, যতটা সামগ্রিক জগতে মার্কিন সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা ছিল — যে জগৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণও করেনি ও সৃষ্টিও করেনি।

প্রশ্ন

১। ঠান্ডা লড়াই সম্বন্ধে সংশোধনবাদীদের মতবাদ কি?

২.৫.১.১.৩ ঃ তৃতীয় মতামত (Third View)

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উপর কয়েকজন লেখক গোঁড়া অথবা সংশোধনবাদী (Orthodox or revisionist) মতের কোনটাই পুরোপুরি গ্রহণ করেননি। তাঁদের মতে নেতৃত্বের ব্যক্তিত্ব (Personalities of leaders) অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এর আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতিসমূহ — এর কোনটিই দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধোত্তর দ্বন্দ্বের জন্য দায়ী ছিল না। তাঁরা দ্বন্দ্বের কারণসমূহকে মূলত রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির প্রকৃতি (Nature of the state system) এবং যুদ্ধপরবর্তী দুটি অতি-শক্তির (Two Super-Powers) বিষয়গত বাস্তব পরিস্থিতি (Objective situation) অর্থাৎ দ্বি-মেরুবিশিষ্ট শক্তির-বণ্টনের আত্মপ্রকাশ (Emergent bi-polar distribution of power)-এর মধ্যে এবং সোভিয়েট ও মার্কিন রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির কিছু ঐতিহাসিক পদ্ধতি, আদর্শ ও পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে নির্দেশ করেছেন। ১৯৪৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রত্যেকেই অর্ধ পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তারকারী শক্তিরূপে একে অপরের সহিত সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিল; ঠিক যেরূপ ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির ইতিহাসে সব সময় অন্যান্য প্রতিযোগী শক্তিকেন্দ্রসমূহ একে অপরের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হত। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও পূর্বতন রাশিয়া যা ইয়োরোপ থেকে ক্রমাগত আগ্রাসনের সম্মুখীন হয়েছিল, স্বাভাবিকভাবেই একটি রক্ষামূলক বলয় প্রতিষ্ঠার জন্য মধ্য ও পূর্ব ইয়োরোপে অগ্রসর হয়ে নিরাপত্তার অন্বেষণ করেছিল। অন্যদিকে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র যা উক্ত শতাব্দীতে ইয়োরোপের প্রতিরক্ষার জন্য দুবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল, তা পশ্চিম ইয়োরোপের দিকে (পূর্ব ও মধ্য ইয়োরোপের মাধ্যমে) সোভিয়েট অগ্রগতিকে নিজ নিরাপত্তার প্রতি বিঘ্নস্বরূপ দেখেছিল। এইরূপে ইয়োরোপেই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূচনা হয়। একটি রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে দেখলে বলা যায় দ্বন্দ্বই ছিল ঠাণ্ডা লড়াইয়ের কারণ। একথা সত্য যে দ্বন্দ্ব কমিউনিস্ট মতাদর্শ ও মার্কিন জাতীয়নীতির দ্বারা গতিশীল ও প্রবলতর হয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির প্রকৃতি (Nature of the state system) ও যে ভীতিপূর্ণ ও সন্দেহজনক পথে প্রতিদ্বন্দ্বী উভয়পক্ষই একে অপরের পদক্ষেপকে ব্যাখ্যা করত, তার মধ্যেই দ্বন্দ্ব অন্তর্নিহিত ছিল। কেনেথ ডব্লিউ থমসন বলেছেন যে ওইরূপ ধারণাই বিকল্প মতকে (alternative view) গোঁড়া ও সংশোধনবাদী, এই উভয়শ্রেণীর মতামত থেকে পৃথক করেছে।

বিপ্লবোত্তর সেভিয়েট রাশিয়াতে ১৯১৮-১৯ সালে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপে মার্কিন অংশগ্রহণের পীড়িত স্মৃতি ও ১৯৩৩ এর পূর্ব পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়নের কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদানে মার্কিন ব্যর্থতা প্রভৃতি কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সোভিয়েট সন্দেহ দূরীকরণে যুদ্ধকালীন সহযোগিতার অভিজ্ঞতা খুব একটা কার্যকরী হয়নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে মার্কিন দীর্ঘসূত্রিতা, আণবিক বোমা তৈরির পরিকল্পনা সোভিয়েটদের অবহিত করার ক্ষেত্রে মার্কিন অস্বীকৃতি, প্রতিশ্রুত লেণ্ড-লীজ সরবরাহ প্রেরণে দেরী, দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার ব্যাপারে মার্কিন ব্যর্থতা, জাপানের বিরুদ্ধে আণবিক বোমার ব্যবহার প্রভৃতি মার্কিন অভিসন্ধি সম্পর্কে সোভিয়েটদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে মার্কিন অধিকৃত অঞ্চলসমূহে বিশেষতঃ ইটালীতে প্রাক্তন নাৎসী সহযোগীদের সমর্থনের মার্কিন ইচ্ছা সোভিয়েট জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলসমূহে 'অবাধ ও মুক্ত নির্বাচন' ('Free elections') অনুষ্ঠানের বিষয়ে পূর্ব প্রদত্ত সোভিয়েট প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য মার্কিন চাপ, যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য মার্কিন প্রতিশ্রুত লেণ্ড-লীজ সহায়তা যা সোভিয়েট ইউনিয়নের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল, তার আকস্মিক বাতিলকরণ — প্রভৃতি কারণে সোভিয়েট সন্দেহ ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন এর আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতি সমূহ — এর কোনটিই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দ্বন্দ্বের জন্য দায়ী ছিল না। বিকল্প মতামত অনুসারে ঠাণ্ডা লড়াই ছিল উভয়পক্ষের অভিসন্ধি সমূহের পারস্পরিক অবিশ্বাসজনিত ফলাফল।

অপরদিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি মার্কিন বৈরিতা বৃদ্ধির কারণসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল সোভিয়েটদের মার্কিন-বিরোধী প্রচার ও ধনতন্ত্রবাদ ধ্বংসের প্রতিশ্রুতি, পূর্ব ও মধ্য ইয়োরোপ থেকে লাল ফৌজ প্রত্যাহারে

সোভিয়েট অনিচ্ছুকতা প্রভৃতি। মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গিতে সোভিয়েট ইউনিয়নকে পশ্চিম ইয়োরোপ আক্রমণে বদ্ধপরিকর একটি সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দেখা হয়। উক্ত ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি, অবিশ্বাস ও তার ফলাফলস্বরূপ আশঙ্কা — দ্বন্দ্বের মূল ভিত্তি ছিল।

১৯৫২ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত জর্জ কেনান (George Kennan) উল্লেখ করেছেন যে ভ্রান্ত পাঠকৃত সঙ্কেতসমূহের (misread signals) বিষয়টি উভয়পক্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে মার্শাল পরিকল্পনা যা এমনভাবে রচিত হয়েছিল যে তা সোভিয়েট ইউনিয়নের তাতে অংশগ্রহণ না করাকে (non-participation) সুনিশ্চিত করে, এছাড়া পশ্চিম জার্মান সরকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি এবং ন্যাটো (NATO, North Atlantic Treaty Organisation) প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ সমূহ প্রভৃতিকে সোভিয়েট ইউনিয়নকে ঘিরে ফেলবার (encircle) প্রচেষ্টার সূচনাসমূহ বলে সোভিয়েটরা ব্যাখ্যা করে। অপরদিকে ১৯৪৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়ার উপর সোভিয়েট দৃঢ় হস্তক্ষেপ, (প:) বার্লিন অবরোধ (Berlin Blockade), উভয় পদক্ষেপই মূলতঃ পাশ্চাত্য পদক্ষেপের আত্মরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়া মাত্র ছিল, তাকে তখন অনুরূপভাবে পাশ্চাত্য দিক থেকে ভ্রান্তভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এর ঠিক অল্প সময় পরে কোরিয়া যুদ্ধজনিত সংকট উপস্থিত হয়, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্ভাব্য বিশ্ববিজয়ের আনুমানিক সোভিয়েট অগ্রগতিকে ব্যর্থ করার জন্য সামরিক দিক থেকে হস্তক্ষেপ করে; এবং উত্তর মার্কিন পদক্ষেপ মাঞ্চুরিয়া ও পূর্ব সাইবেরিয়াতে সোভিয়েট অবস্থানের উপর আপাতদৃষ্টিতে একটি বিপদ বলে মস্কোতে ধরে নেওয়া হয়। অতএব সংক্ষেপ বলা যায় যে বিকল্প মতামত (alternative view) অনুসারে ঠাণ্ডা লড়াই উভয়পক্ষের অভিসন্ধিসমূহের পারস্পরিক অবিশ্বাসজনিত ফলাফল ছিল।

প্রশ্ন

১। ঠাণ্ডা লড়াই সম্পর্কে বিকল্প মতবাদটি কি?

২.৫.১.১.৪ ঃ বিভিন্ন মতামতের মূল্যায়ণ (Assessment of different views)

যাইহোক ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উদ্ভব সম্পর্কে উপরোক্ত তিনটি ব্যাখ্যা আংশিকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল। এর কারণ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উদ্ভব বা উৎসসমূহ অত্যন্ত জটিল ছিল। যাকে কোন একটি একক মতামত দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। দ্বন্দ্বের সূত্রসমূহ বিভিন্ন ধরণের ও জটিল ছিল। প্রকৃতপক্ষে ঠাণ্ডা লড়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের বহির্বিষয়ক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিসমূহের জটিল মিথস্ক্রিয়ার (Complicated interaction) ফলাফল ছিল বলা যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি সংক্ষিপ্ত সময়কালে একটি অসম্ভাব্য স্বপ্ন (an impossible dream) আপাতদৃষ্টিতে সম্ভবপর বলে মনে হয়েছিল। নাৎসী অভিযানের মোকাবিলা করতে গিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরস্পরের মিত্র হয়েছিল। তাদের উক্ত সহযোগিতা অস্বাভাবিক বাধ্যবাধকতাপূর্ণ ছিল, যা জার্মানীর পরাজয়ের পরে আর বেশী দিন টিকে থাকতে পারেনি। হিটলারের শাসনাধীন জার্মানী তাদের সহযোগিতার ভিত্তি সৃষ্টি করে দিয়েছিল, এবং তৃতীয় রাইখ্ (Third Reich) এর পতন উক্ত অস্তিত্বের (সহযোগিতার) কারণকেই অপসারিত করে। এইরূপে দেখা যায় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে লাল ফৌজ ও মার্কিন নেতৃত্বাধীন পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সেনাবাহিনী পদানত ইউরোপ জুড়ে

পরস্পরের সম্পুখীন হয়। এটা ছিল এমন একটি পরিস্থিতি যা উভয় শক্তির কোনটিরই নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে সোভিয়েট ইউনিয়নের আভ্যন্তরীণ প্রভাব-পরিস্থিতিসমূহ — যথা মুক্ত পূর্ব ইউরোপে বন্ধুত্বপূর্ণ সরকারসমূহ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিরাপত্তার অন্বেষণ, মতাদর্শের ভূমিকা (the role of ideology), দেশে যুদ্ধোত্তর ব্যাপক পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা সমূহ, জোসেফ স্টালিনের ব্যক্তিত্ব — প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ প্রভাব-পরিস্থিতিসমূহ যথা — কমিউনিজম্-এর ভীতি, মার্কিন স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটি আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দ্বার নীতি (international open door policy) প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা, মার্কিন অর্থনৈতিক শক্তি ও আণবিক বোমা আবিষ্কারের দরুন আণবিক অস্ত্রের উপর একচেটিয়া প্রাধান্যজনিত কারণে মার্কিন সর্বশক্তিমত্তার (Omnipotence) বিভ্রান্তি — প্রভৃতি কারণসমূহের ফলাফল ছিল উভয়পক্ষের মধ্যে বৈরিতাপূর্ণ দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। উভয় অতিশক্তির (Super-Powers) নেতৃবৃন্দ শান্তির অন্বেষণ করলেও এবং তাদের কার্যাবলী যুদ্ধ অনিবার্য না করে তুললেও উভয়পক্ষের মতপার্থক্যসমূহের মীমাংসা অসম্ভব করে তুলেছিল।

সোভিয়েট ইউনিয়নের আভ্যন্তরীণ প্রভাব পরিস্থিতি সমূহ জোসেফ স্টালিনের ব্যক্তিত্ব, কমিউনিজম্ ভীতি মার্কিন স্বার্থসিদ্ধ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির কারণ সমূহের ফলাফল ছিল উভয় পক্ষের মধ্যে বৈরিতাপূর্ণ দ্বন্দ্ব ও সংঘাত।

২.৫.১.২ ঃ ঠাণ্ডা লড়াই-এর উদ্ভব ও প্রসারের নানা পর্যায় (Origin of Cold War and different phases of development)

কিভাবে এবং কখন ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূচনা হয়েছিল সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কিছু কিছু ঐতিহাসিকদের মতে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূচনা রাশিয়াতে অক্টোবর বিপ্লব ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবেশের মধ্য দিয়ে হয়েছিল বলা যায়। ১৯১৭ সালের ২রা এপ্রিল মার্কিন কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতি উইলসনের ঘোষণা যে "শান্তি" রাজনৈতিক মুক্তির পরীক্ষিত ভিত্তির উপর স্থাপিত হবে — তা বিপ্লব পরবর্তী রাশিয়ায় সোভিয়েত কংগ্রেসে লিওন ট্রটস্কীর ঘোষণা যে "হয় রুশ বিপ্লব ইয়োরোপে বিপ্লবী আন্দোলন সৃষ্টি করবে অথবা ইয়োরোপীয় শক্তিগুলি রুশ বিপ্লবকে ধ্বংস করবে — এই উভয় ঘোষণার মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ১৯১৮ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য সশস্ত্র হস্তক্ষেপের সূচনা হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল উইনস্টন চার্চিল এর বিখ্যাত উক্তি অনুযায়ী 'তার জন্মস্থানে, কমিউনিজমকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা।' অন্যান্য ঐতিহাসিকরা ১৯৩৯-৪০ সালের উপর জোর দিয়েছেন, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে ও যাতে আসন্ন পূর্ব-পশ্চিম সংকটের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

প্রথম পর্যায় (First Phase) ঃ যাইহোক সকল খ্যাতনামা ঐতিহাসিকদের মতে ১৯৪৫ সালটিই ছিল বৃহৎ বিভাজিকা যখন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সম্ভাব্য পদ্ধতির নির্ধারকরূপে ঠান্ডা লড়াইয়ে প্রথম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে হাতাহাতি, লড়াই বা দাঙ্গা বাঁধে। এর মধ্যে ইয়োরোপের বিভাজন মূলত নির্ধারিত হয়েছে। পূর্ব ইয়োরোপে সোভিয়েট ইউনিয়নের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্নমুখী লক্ষ্যসমূহের বিষয়টি এই সময়ই সরাসরিভাবে প্রকাশ্যে আসে।

১৯৪৪ এর শেষের দিকে সোভিয়েত লাল ফৌজ পশ্চাৎগামী নাৎসীবাহিনীকে ধাওয়া করে পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে প্রবেশ করে এবং প্রায় সেই সময় ১৯৪৪ এর মাঝামাঝি যে মার্কিন বাহিনী ইউরোপ অভিযান করেছিল তা রাইন নদী অতিক্রম করে। ১৯৪৫ সালের ২৫শে এপ্রিল সোভিয়েট ও মার্কিন বাহিনী জার্মান শহর টোর্গান (Torgan) এর নিকটে এলব নদীর ধারে পরস্পরের মুখোমুখি হয়। মিত্র শক্তির তিন যুদ্ধকালীন নেতৃবর্গ রুজভেল্ট,

চার্চিল এবং স্টালিন যখন ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইয়াল্টাতে সম্মেলন করছিলেন তখন ইয়োরোপ বিভাজন একটি বাস্তব ঘটনা। পূর্ব ও মধ্য ইয়োরোপ সোভিয়েট অথবা কমিউনিস্ট আধিপত্যাধীন হয়। রুজভেল্ট ও চার্চিল উক্ত অবিসম্বাদিত বাস্তবের সম্মুখীন হন যা তাঁরা ইয়াল্টায় পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন ও যেখানে পোলিশ প্রশ্নটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সোভিয়েট ইউনিয়ন মূলতঃ তার নিরাপত্তার স্বার্থে পোল্যান্ডে একটি সোভিয়েট ঘেঁষা সরকার চাইলে অন্য দুটি শক্তি সেখানে কমিউনিষ্ট বিরোধী পাশ্চাত্য ঘেঁষা সরকার চায়। এইরূপে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ন্যায় পোল্যান্ডের 'রক্ত ও মাংস' (Flesh & Blood)-কে নিয়ে হয়। কেনেথ ডব্লিউ থমসন (Keneth W. Thomson)-ও মন্তব্য করেছেন, মূলতঃ কিন্তু কেবলমাত্র পোলিশ প্রশ্নটিকে নিয়ে না হলেও ইয়াল্টা সম্মেলন যুদ্ধকালীন সহযোগিতার যুগ এবং ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রথম অবরোধকালীন অভিযানের (first sorties) মধ্যে জল বিভাজিকার (watershed) ন্যায় ছিল।

১৯৪৫ সালটিই ছিল বৃহৎ বিভাজিকা যখন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সম্ভাব্য পদ্ধতির নির্ধারকরূপে ঠান্ডা লড়াইয়ে প্রথম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে হাতাহাতি, লড়াই বা দাঙ্গা বাঁধে। এর মধ্যে ইয়োরোপের বিভাজন মূলত নির্ধারিত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন মনে করেছিল যে ইয়াল্টার অর্থ ছিল পূর্ব ইয়োরোপে পাশ্চাত্য ধাঁচের গণতন্ত্রে সোভিয়েট অনুমোদন, অপরদিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন উক্ত ঐক্যমতকে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ সরকার প্রতিষ্ঠায় তাদের দাবির স্বীকৃতি প্রদান বলে মনে করে।

এইরূপে যখন সোভিয়েট ইউনিয়ন সাতটি পূর্ব ইয়োরোপীয় দেশসমূহ যথা আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, পূর্বজার্মানী, যুগোশ্লাভিয়া ও রুমানিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে সকল ইয়োরোপকে কমিউনিস্ট করার একটি চক্রান্ত বলে ব্যাখ্যা করে। রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান তখন সোভিয়েট চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য দুটি নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেন : প্রথমতঃ লোহার পর্দাকে (Iron curtain, চার্চিলের ভাষায়) তার পুরাতন সীমান্তসমূহে গোটানো (roll back) এবং দ্বিতীয়তঃ কমিউনিস্ট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পশ্চিম ইয়োরোপের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও সামরিক পুনঃসশস্ত্রকরণ (military rearmament)।

১৯৪৭ এর মার্চে ট্রুম্যান মতবাদ (Truman Doctrine)-এর মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রীস ও তুরস্ককে কমিউনিস্ট আন্দোলন থেকে রক্ষা করবার দায়িত্ব ব্রিটেন-এর নিকট হতে গ্রহণ করে। ১৯৪৭-এর জুনে মার্শাল পরিকল্পনা (Marshall Plan) ঘোষিত হয়। ইয়োরোপের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারকরণের সহায়তা কর্মসূচী সোভিয়েট ইউনিয়নকেও দেবার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন এই যুক্তি দেখিয়ে তা প্রত্যাখান করে যে মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী কেবলমাত্র সহায়তা কর্মসূচীর ব্যবহার করবার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিদর্শনের অধিকার গ্রহণ করা সহায়তাপ্রাপক দেশগুলির উপর বাধ্যতামূলক ছিল শুধু তাই নয়, এছাড়া সাধারণভাবে তাদের অর্থনৈতিক নীতিসমূহের উপরও উক্ত পরিদর্শনের অধিকার গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক ছিল।

সোভিয়েট ইউনিয়ন উক্ত মার্কিন পদক্ষেপ মোকাবিলা করবার উদ্দেশ্যে ফ্রান্স ও ইটালীসহ পূর্ব ইয়োরোপের সকল কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে নিয়ে ১৯৪৭ সালে কমিনফর্ম বা কমিউনিস্ট ইনফর্মেশান ব্যুরো (Cominform or Communist Information Bureau) গঠন করে। কমিনফর্ম গঠনের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব ইয়োরোপের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পরিকল্পনাকে সহায়তা করা ও মার্শাল পরিকল্পনা যা ধনতন্ত্রবাদী ইয়োরোপের পুনর্জীবন সঞ্চার করার লক্ষ্যে গঠিত হয়েছিল, তার বিরোধিতা করা। এর অব্যবহিত পরেই ১৯৪৮ এর ফেব্রুয়ারিতে চেকোস্লোভাকিয়ায় কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করে।

মার্কিন নেতৃত্বাধীন পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ বিশ্বাস করে যে উক্ত সোভিয়েট পদক্ষেপসমূহ বিশ্ববিপ্লবের জন্য সোভিয়েট লক্ষ্যের নির্দেশক ছিল। এর পাল্টা প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৯ সালে ইউরোপে সোভিয়েট সম্প্রসারণবাদ-এর গতিরোধ করার জন্য নর্থ অ্যাটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশান বা ন্যাটো (North Atlantic Treaty Organisation or NATO) গঠন করে।

এরপর উভয় অতি-শক্তির (both the Super Powers) শক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্র হয়ে উঠে জার্মানী। প্রাক্তন জার্মান রাজধানী বার্লিনে ঠাণ্ডা লড়াই কঠোরতম বিন্দুতে পৌঁছায়। ১৯৪৮ এর ৭ই জুন একটি পশ্চিম জার্মানরাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের ঘোষণার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জার্মানীর পূর্বাঞ্চলের সোভিয়েট প্রশাসন পশ্চিম বার্লিন, যা সোভিয়েট নিয়ন্ত্রিত পূর্ব জার্মানী দ্বারা বেষ্টিত ছিল, এবং পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ নিয়ন্ত্রিত পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। উক্ত বিষয়টি বার্লিন অবরোধ (Berlin Blockade) রূপে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে খ্যাত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রশক্তিবর্গ উক্ত অবরোধকে ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে পশ্চিম বার্লিন-এ বিমানপথে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের ব্যাপক সরবরাহ প্রেরণ করতে থাকে। পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের অবরোধ ব্যর্থ করবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখে ১৯৪৯ এর ১২ই মে সোভিয়েট ইউনিয়ন শেষপর্যন্ত অবরোধ তুলে নেয়। এইভাবে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রথম পর্যায়ের (First phase of the cold war)-অবসান ঘটে।

এইরূপে দেখা যায় যে ঠাণ্ডা লড়াই, যার সূচনা ইউরোপে হয়েছিল, ফ্র্যাঙ্কেল (Frankel)-এর ভাষায় তা ছিল দুটি দৈত্যাকার রাষ্ট্রের মধ্যে একটি মুষ্টিযুদ্ধের খেলা বা ম্যাচ এবং তাদের মধ্যে পদক্ষেপসমূহ এবং পাল্টা পদক্ষেপসমূহের সমাহার। উক্ত দ্বন্দ্বে প্রত্যেক পক্ষই এমন নীতিসমূহ গ্রহণে বাধ্য হয় যা অন্য পক্ষ পারত না, কিন্তু তাকে নিজস্ব নিরাপত্তা এবং বিশ্বশান্তির পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ বলে মনে করত। তারপর প্রত্যেক পক্ষই প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপসমূহ গ্রহণে বাধ্য হত। এর ফলে সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে পূর্ব ইয়োরোপে তার নিরাপত্তা শক্তিশালী করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব ইয়োরোপকে পশ্চিম ইয়োরোপের পক্ষে প্রথম পদক্ষেপরূপে বর্ণনা করে এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যে সমস্ত এলাকাসমূহ সোভিয়েট ইউনিয়ন নিজ নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য বলে মনে করত সেগুলিতে নিজ স্বার্থসমূহ দাবি করে। এর ফলে সোভিয়েটরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ তার চার পাশে ধনতান্ত্রিক বেষ্টনীর (Capitalist encirclement) পুরাতন পথ গ্রহণ করবার চেষ্টা করছে এবং সোভিয়েটদের টিকে থাকবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসমূহে সোভিয়েটবিরোধী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্দেশ্যমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। প্রত্যেক পক্ষই একান্তভাবে বিশ্বাস করত যে ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা, বিশ্বব্যবস্থা (world Order) সম্পর্কে তার নিজস্ব ধ্যানধারণার সাফল্যের উপর নির্ভরশীল। এছাড়া প্রত্যেক পক্ষই নিজ উদ্দেশ্য এবং তীব্রভাবে আকাঙ্ক্ষিত নীতিসমূহ অনুসরণ করতে গিয়ে কেবলমাত্র অপর পক্ষের এই আশঙ্কাকে প্রতিপন্ন করত যে সে আগ্রাসনে বদ্ধপরিকর। এইরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন এমন একটি প্রবল সংগ্রামে পরস্পরের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয় যা প্রথমে ইয়োরোপে সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু ধীরে ধীরে অন্যান্য মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলসমূহ যথা এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে।

প্রশ্ন

১। এ ঠাণ্ডা লড়াইয়ে প্রথম পর্যায়টি কি আলোচনা কর?

দ্বিতীয় পর্যায় (Second phase) ঃ ১৯৪৯ সালে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা হয় যখন সোভিয়েট ইউনিয়ন সফলতার সঙ্গে আণবিক বোমার ক্ষেত্রে মার্কিন একচেটিয়া প্রাধান্য ভেঙ্গে ফেলে আণবিক বোমা তৈরি করে মার্কিন পরমাণুশক্তির সঙ্গে সমতা স্থাপনের পথে অগ্রসর হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে এশিয়াতে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের দ্বিতীয় পর্যায়-এর সূচনা হয়। ১৯৫০-এর ২৫শে জুন যখন কোরিয়াতে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে রাষ্ট্রসংঘকে (United Nations) কোরিয়া আক্রমণ করে। এরপর যখন মার্কিন বাহিনী ইয়ালু নদী অতিক্রম করে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের বা কমিউনিস্ট চীনের (Peoples Republic of China) নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে, তখন শেষোক্ত পক্ষ (চীন) কোরিয়ার পক্ষে হস্তক্ষেপ করে। এইরূপে কোরিয়ার পরিস্থিতি অত্যন্ত বিস্ফোরক হয়ে ওঠে। যাইহোক শেষপর্যন্ত কোরিয়ার যুদ্ধ একটি যুদ্ধ বিরতির দ্বারা অবসান হয় ও কোরিয়ার পুনঃ-ঐক্যসাধনের (reunification) সমস্যা অমীমাংসিত থাকে।

যখন সোভিয়েট ইউনিয়ন সফলতার সঙ্গে আনবিক বোমার ক্ষেত্রে মার্কিন একচেটিয়া প্রাধান্য ভেঙ্গে ফেলে মার্কিন পরমানু শক্তির সঙ্গে সমতা স্থাপনের পথে অগ্রসর হয়, তখন ঠাণ্ডা লড়াইয়ের দ্বিতীয় পর্যায় এর সূচনা হয়।

তৃতীয় পর্যায় (Third phase) ঃ এরপর ঠাণ্ডা লড়াইয়ের তৃতীয় পর্যায়ের (third phase) সূচনা হয় যখন মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার (Eisenhower) এবং তাঁর পররাষ্ট্রসচিব জন ফস্টার ডালেস ট্রুম্যানের 'Containment of Communism'-এর বা 'কমিউনিজম এর সংযতকরণ'-এর নরম নীতি (soft policy) বাতিল করে পূব ইয়োরোপে কমিউনিজমকে গোটানোর (rolling back) নীতি গ্রহণ করে। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৫৪র ফেব্রুয়ারিতে সিয়াটো (SEATO or South-East Asia Treaty Organization) এবং ১৯৫৫র ফেব্রুয়ারিতে 'মিডল ইস্ট ডিফেন্স ট্রিটি অর্গানাইজেশন' (Middle East Defence Treaty Organisation) গঠন করে। এর উদ্দেশ্য ছিল এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে জাতীয় মুক্তির আন্দোলনসমূহ (National liberation movements) দমন করা। উক্ত পর্যায়েই ভিয়েৎনামে মার্কিন হস্তক্ষেপের পরিকল্পনা রচিত হয়।

এরপর যখন পশ্চিম জার্মানী ন্যাটো (Nato)-এর সদস্য হয় তখন সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে বেষ্টনী দেবার (encircle) মার্কিন চক্রান্তসমূহের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপরূপে ১৯৫৫ সালের ১৪ই মে পূর্ব ইয়োরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন ওয়ারশ চুক্তি ব্যবস্থা (Warsaw Treaty System) গঠন করে। এছাড়া সোভিয়েট ইউনিয়ন পশ্চিম ইউরোপের অখণ্ডতাকরণের আন্দোলন (Integration movement)-এর মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে পূর্ব ইয়োরোপের অখণ্ডতাকরণের (Integration) জন্য ১৯৫৯-এর ১৪ই ডিসেম্বর 'চার্টার অফ দি কাউন্সিল অফ মিউচুয়াল ইকনমিক অ্যাসিসট্যান্স' বা 'কোমেকন' (Charter of the Council of Mutual Economic Assistance, COMECON)

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের তৃতীয় পর্যায়ের সূচনা হয় যখন মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইজেন-হাওয়ার এবং তাঁর পররাষ্ট্রসচিব জন ফস্টার ডালেস ট্রুম্যানের 'কমিউনিজম এর সংযতকরণ'-এর নরম নীতি গ্রহণ করে পূর্ব ইয়োরোপে কমিউনিজমকে গোটানোর নীতি গ্রহণ করে।

গঠন করে; যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয় — পূর্ব জার্মানী বা জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (German Democratic Republic or G.D.R.)। এইরূপে জার্মানীর বিভাজন চূড়ান্ত হয়।

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের তৃতীয় পর্যায় কঠোর বক্তব্য (Tough Talk) কিন্তু সমন্বয়বিধায়ক (accommodative) কার্যকলাপ দ্বারা চিহ্নিত ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমনভাবে বক্তব্য রাখছিল যেন যুদ্ধ আসন্ন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বিশেষতঃ কোরিয়ার যুদ্ধের পর অত্যন্ত সতর্কতা ও সংযমের পরিচয় দেয়। এছাড়া পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত করবার প্রচেষ্টাজনিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়; কারণ উভয় পক্ষই উপলব্ধি করে যে ঠাণ্ডা লড়াই একটি বিপদজনক অচলাবস্থায় উপনীত হয়েছে যাকে মিটিয়ে ফেলতে হবে। এইরূপে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের বরফ গলতে শুরু করে।

চতুর্থ পর্যায় (Fourth phase) ঃ এরপর সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ (Khruschev) ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার (Eisenhower) এর মধ্যে ক্যাম্প ডেভিড বৈঠক (Camp David meeting)-এর পর ঠাণ্ডা লড়াইয়ের চতুর্থ পর্যায়-এর সূচনা হয়। উক্ত পর্যায়ে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিবর্গ প্রেরণ এবং পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের ও সোভিয়েট ইউনিয়ন-এর সরকারসমূহের প্রধানদের পারস্পরিক পরিদর্শন (Mutual visits) প্রভৃতির সূচনা হয়। কিন্তু ঠাণ্ডা লড়াই পুনরায় নতুন করে শুরু হয় যখন ইউ-টু-ঘটনা (U-2 Incident) দ্বারা ১৯৬০-এর প্যারিস সম্মেলনের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতির আশা শেষ হয়ে যায়। এরপর পুনরুত্থিত ঠাণ্ডা লড়াই ১৯৬২ সালের কিউবায় মিসাইল সংকট (Cuban Missile Crisis) জনিত কারণে উত্তেজক হয়ে ওঠে। যাইহোক শেষপর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি ঐক্যমত দ্বারা বিশ্ব একটি পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কামুক্ত হয়। উক্ত ঐক্যমত অনুযায়ী কিউবাকে কখনই আক্রমণ না করবার মার্কিন গ্যারান্টী প্রদানের বিনিময়ে কিউবা থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন মিসাইল ঘাঁটি প্রত্যাহার করে নেয়। এইরূপে দুটি অতি-শক্তির (two Super Powers) মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গঠনের প্রক্রিয়ার সূচনা হয়, যা ২০শে জুন, ১৯৬৩-র জেনিভা হটলাইন ঐক্যমত (Geneva Hotline Agreement), জুলাই ১৯৬৩র পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা আংশিক নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (Partial Nuclear Test Ban Treaty) এবং ১৯৬৮ সালের নিউক্লিয়ার নন-প্রোলিফারেশান ট্রিটি (Nuclear Non-Proliferation Treaty) প্রভৃতির মাধ্যমে তার প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়।

১৯৬২ সালের কিউবায় মিসাইল সংকটজনিত কারণে উভয় পক্ষই উত্তেজক হয়ে ওঠে।

শেষ পর্যায় (Last phase) ঃ এরপর আন্তর্জাতিক জগৎ ঠাণ্ডা লড়াই থেকে দ্যাঁতাত (Detenté)-এর যুগে বা সমঝোতার যুগে প্রবেশ করে। -- এই যুগে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সন 'একটি সংঘাতের যুগ' (an era of confrontation)-এর পরিবর্তে আলাপ আলোচনার নূতন যুগ (A New era of Negotiations) ঘোষণা করেন। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের শেষ পর্বকে বেশীরভাগ লেখকই দ্যাঁতাত-এর পর্ব বলে থাকেন। ফরাসী শব্দ দ্যাঁতাত (Detenté) বলতে বোঝায় উত্তেজনা কমিয়ে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ককে স্বাভাবিক করে তোলা। ১৯৫০-এর দশকে তৎকালীন ফরাসী রাষ্ট্রপতি দ্য গল (DéGaul) প্রথম কূটনৈতিক অর্থে শব্দটির প্রয়োগ করেন। সোভিয়েট-মার্কিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর

ব্যবহার শুরু করেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সনের নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরী কিসিঞ্জার (Henry Kissinger) সত্তরের দশকে। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতি নিক্সন ও সোভিয়েট নেতা ব্রেজনেভ এর মধ্যে মস্কো বৈঠক (Moscow Summit) অনুষ্ঠিত হয়। এটা একটি রাজনৈতিক ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করে যা অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের মূলনীতিগুলি নির্ধারিত হয়। এছাড়া সামরিক ঐক্যমত যার নাম ছিল SALT-I-(Strategic Arms Limitation Treaty) প্রতিষ্ঠিত হয় ও বাণিজ্যসংক্রান্ত চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। এরপর ১৯৭৩ এ নিক্সন ও ব্রেজনেভ পারমাণবিক যুদ্ধ প্রতিরোধ করবার জন্য ঐক্যমত (Agreement on the Prevention of Nuclear War) স্বাক্ষর করেন, যাতে উভয় অতি-শক্তি (Super-Powers) উস্কানিমূলক ভীতি প্রদর্শন (threat) অথবা শক্তির-ব্যবহার (Use of force) করা থেকে বিরত থাকতে রাজী হয়। ১৯৭৪ সালের শীর্ষবৈঠকে তাঁরা ABM Sites (Atomic Ballistic Missiles Sites) বা পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্রগুলির অনুমোদনযোগ্য সংখ্যা সঙ্কুচিত করেন।

দুটি অতি-শক্তির (Two Super Powers) মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পরিণতিস্বরূপ ১৯৭৫ সালে ৩৩টি ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র নিরাপত্তা ও সহযোগিতার উপর হেলসিঙ্কি সম্মেলনে (Helsinki Conference on Security and Co-operation)-এ স্বাক্ষরদান করেন। উক্ত সম্মেলনে স্বাক্ষরদানকারী রাষ্ট্রসমূহ ইয়োরোপের সকল রাষ্ট্রের অঞ্চলগত অখণ্ডতাকে (territorial integrity) তাঁদের বর্তমান সীমান্ত অনুযায়ী মেনে চলবার প্রতিশ্রুতি দান করে। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় (different social and political system) রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।

যাইহোক দ্যাঁতাত (Detenté) এ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ঠিক বিপরীতধর্মী কোন বিষয় ছিল না। অতি-শক্তিদের মধ্যে উত্তেজনা ও স্বার্থসমূহের দ্বন্দ্ব এর পরেও বিদ্যমান থাকে। কিন্তু অতি-শক্তিদ্বয় পারস্পরিক সাধারণ স্বার্থসমূহের ব্যাপক বৈচিত্র্য সম্পর্কে সচেতনতার দরুন সংঘাতের পরিবর্তে আলাপ আলোচনা ও ঐক্যসমূহের ভিত্তিতে মতপার্থক্যগুলি মেটাবার চেষ্টা করত। তা সত্ত্বেও দ্যাঁতাত স্বল্পস্থায়ী ছিল। ১৯৮০ সালের মধ্যে অতিশক্তিদ্বয় নূতন ঠাণ্ডা লড়াই বা New Cold War যাকে দ্বিতীয় ঠাণ্ডা লড়াই বা Second Cold War-ও বলা হয় তার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। দ্বন্দ্বের উক্ত পর্যায় তৃতীয় বিশ্বে আঞ্চলিক সংঘাত ও যুদ্ধসমূহের সমাহার দ্বারা সূচিত হয়েছিল।

এরপর ১৯৭৮-৮০ সাল নাগাদ সোভিয়েত মার্কিন সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং ১৯৮০ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সামরিক অভিযান, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের গ্র্যানাডায় মার্কিন আগ্রাসন, ১৯৮৬ সালে লিবিয়ার উপর মার্কিন নৌ ও বিমান বাহিনীর ব্যাপক আক্রমণ, ১৯৮৯ তে পানামার উপর অধিকতর ব্যাপক ও উদ্দেশ্যহীন মার্কিন অভিযান প্রভৃতি এর উদাহরণ। রিগ্যানের নতুন ঠাণ্ডা লড়াই নিকারাগুয়া ও এল স্যালভাডোর-এর বামপন্থী শাসনব্যবস্থার উপর ধাবিত হয়। কিন্তু রিগ্যান কখনই ব্রেজনেভ-এর সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে অবতীর্ণ হননি। ১৯৮০-৮১ সালের পোলিশ সংকট (The Polish Crisis) ১৯৬৮র চেক সংকট অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হলেও কোন সময়ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব

ইয়োরোপে সোভিয়েট শাসনাধীন বৃত্তকে (Soviet spheres of influence)-কে চ্যালেঞ্জ জানায়নি। এছাড়া ইরান-ইরাক যুদ্ধ যার সূচনা ১৯৮০ সাল থেকে হয়েছিল তাতেও অতিশক্তিদ্বয় যথেষ্ট সংযম দেখিয়েছিল। সুতরাং নতুন ঠাণ্ডা লড়াইয়ের তিক্ততা ছিল সাময়িক।

১৯৮৩ সালে 'ইন্টার মিডিয়েট নিউক্লিয়ার ফোর্স টক্স্' 'আই.এন.এফ.টি.', এবং 'স্ট্র্যাটেজিক আর্মস রিডাকশান টক্স্', 'স্টার্ট' (Intermediate Nuclear Force Talks (INFT), & Strategic Arms Reduction Talks, Start) থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন বেরিয়ে এলেও ১৯৮৫ সালে তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আপস রফায় এগিয়ে আসে। মিখাইল গর্বাচেভ ১৯৮৫ সালে সোভিয়েট রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরে এই প্রক্রিয়া নতুন মাত্রা পেয়ে যায়। গ্লাসনস্ট ও পেরেস্ত্রৈকার প্রবক্তা গর্বাচেভ কট্টর সমাজতন্ত্রবাদের সমালোচনা করে বিশ্বব্যবস্থায় ধনতন্ত্রের সাথে আপসের ইঙ্গিত দেওয়ায় আমেরিকা স্বস্তি বোধ করে। তার আরও সুবিধা হয়ে যায় সোভিয়েট ইউনিয়নে অন্তর্দ্বন্দ্ব, জাতিসমস্যা প্রভৃতি সেই দেশের সামরিক শক্তিকে দুর্বল করে দেওয়ায়। ১৯৮৫তে জেনিভায় গর্বাচেভ ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিগানের বৈঠক, ১৯৮৬তে রিকজাভিকে, ১৯৮৭তে ওয়াশিংটনে, ১৯৮৮তে মস্কোয় গর্বাচেভ ও মার্কিন উপরাষ্ট্রপতি জর্জ বুশ (সিনিয়র)-এর বৈঠক, ১৯৮৯ তে মাল্টায়, ১৯৯০-৯১ তে ওয়াশিংটনে গর্বাচভের সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বুশের (সিনিয়র) বোঝাপড়া নয়া দ্যঁতাত-এর পটভূমি তৈরি করে দেয়।

মার্কিন কূটনৈতিক বিগনিউ ব্রেজিনস্কি (Bigniew Brezinski) অবশ্য দ্যঁতাত-এর ব্যাপারে আমেরিকার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল মার্কিন প্রতিপত্তি কমে গিয়ে সোভিয়েট প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ব্রেজেনস্কির ধারণা যে ঠিক ছিলনা, পরের কয়েক দশকে তা প্রমাণ করে দিয়েছে। ১৯৯০-৯১তে ইরাকে মার্কিন আক্রমণের সময়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়েছিল। পূর্ব জার্মানীর ন্যাটোর সদস্যপদ মেনে নিয়েছিল। ১৯৯১তে ওয়ারশ চুক্তিব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং কোমেকন (Comecon)-এর অবলুপ্তি ঘোষণা করেছিল। এছাড়া এর আগেই সরে এসেছিল আফগানিস্তান থেকে। এসব সোভিয়েট অবক্ষয়েরই প্রমাণ। এর চূড়ান্ত পরিণতি ছিল ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে - গর্বাচেভের আমলে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি। যার ফলে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগের সম্পূর্ণ অবসান ঘটে এবং বিশ্বব্যবস্থায় একমেরুকরণের (Unipolarisation) মার্কিন সর্বাধিনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

২.৫.১.৩ ঃ উপসংহার (Conclusion)

উপসংহারে বলা যায় যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগকে 'ঠাণ্ডা শান্তির যুগ' (an era of cold peace) বলে বর্ণনা করা যায়। এটা ঠিক যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইয়োরোপের ইতিহাসে চিরাচরিত অর্থে রাজনৈতিক শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ন্যায় ছিল না ঠাণ্ডা লড়াই। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মধ্যে মতাদর্শগত উপাদানের তীব্রতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। উভয়পক্ষই একে

অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিশাল বাহিনী তৈরি করে রেখেছিল, যদিও পারমাণবিক নিবৃত্তির কারণে (Nuclear Deterrence) তা কখনই ব্যবহৃত হয়নি।

২.৫.১.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী (References)

1. Fleming, D.F. – The Cold War & its Origins, 1917-1960, New York, 1961.
2. Feis, Herbert – From Trust to Terror – The Onset of the Cold War, 1945-50.
3. Ulam, Adam, The Rivals, America & Russia since World War II.
4. Sherwin, Martin – A World Destroyed.
5. Calvocorresi, Peter – World Politics since 1945.
6. La Faber, W. – America, Russia & the Cold War.
7. Halle, L.J. – The Cold War as History.
8. Horowitz, David – From Yalta to Vietnam.
9. Gaddis, John, The Long Peace, Inquiries into the History of Cold War.
10. Ross, Robert, S. & Changbin, Jiang – Reexamining the Cold War.
12. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় — আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস।
13. প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, সিদ্ধার্থ গুহরায় — আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস।

২.৫.১.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Probable Questions)

1. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উত্তেজনাসমূহ কেন প্রসার লাভ করেছিল? ঠান্ডা লড়াই কি অবশ্যম্ভাবী ছিল?
2. ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উদ্ভবে ঐতিহ্যমন্ডিত গোঁড়া এবং আধুনিক ধারণাগুলি ব্যাখ্যা কর। এটি কি 'সমাজতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র' এবং 'পশ্চিমী গণতন্ত্র'র মধ্যে সংঘাত?
3. তুমি কি মনে কর যে ঠান্ডা লড়াই এর পেছনে আমেরিকা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ভ্রান্ত মূল্যায়ণ প্রাথমিক ভাবে দায়ী ছিল?

4. ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আগমন কতখানি আমেরিকার ডলার কূটনীতির ফল? ঠাণ্ডা লড়াই কি 'দীর্ঘ শান্তি' নিশ্চিত করেছিল?

5. 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' এবং দ্যঁতাতের দ্বারা প্রভাবিত নীতিসমূহ বজায় থাকা সত্ত্বেও ১৯৭০ এর দশকের পর ঠাণ্ডা লড়াই চলার কারণ ব্যাখ্যা কর।

———————

পর্যায় গ্রন্থ - ৫
একক - ৩

রাষ্ট্রসংঘ, বিশ্বশান্তির ধারণা এবং আঞ্চলিক উত্তেজনা
UNO and the Concept of World Peace and Regional Tensions

বিন্যাসক্রম ঃ

২.৫.৩.০ ঃ উদ্দেশ্য

২.৫.৩.১ ঃ কোরিয়া সমস্যা

২.৫.৩.২ ঃ কিউবা সংকট

২.৫.৩.৩ ঃ কাশ্মীর সমস্যা

২.৫.৩.৪ ঃ প্যালেস্টাইন সমস্যা

২.৫.৩.৫ ঃ ভিয়েতনাম সমস্যা

২.৫.৩.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থ

২.৫.৩.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

২.৫.৩.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংকট সমাধানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘ কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।

(২) আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইকে কেন্দ্র করে কিভাবে কোরিয়ার সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল এবং তার কিভাবে সমাধান করা হয়েছিল।

(৩) ঠাণ্ডা লড়াইকে কেন্দ্র করে কিভাবে কিউবা সংকট-এর সৃষ্টি হয়েছিল এবং তার সমাধান কিভাবে করা হয়েছিল।

(৪) ভারত বিভাগের পর কাশ্মীর রাজ্যটিকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কিভাবে বিরোধ ও সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই সমস্যা সমাধানের জন্য কি কি প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছিল।

(৫) দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় আমেরিকার সাম্যবাদ বিরোধী নীতি কিভাবে ভিয়েতনাম সংকটের সৃষ্টি করেছিল এবং আমেরিকার পরাজয়ের ফলে কিভাবে ভিয়েতনামের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সাফল্যমন্ডিত হয়েছিল।

(৬) মধ্যপ্রাচ্যে আরব ও ইজরাইল এর মধ্যে বিরোধকে কেন্দ্র করে কিভাবে প্যালেস্টাইন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই সমস্যা সমাধানের জন্য রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা কি ছিল।

২.৫.৩.১ ঃ কোরিয়া সমস্যা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর প্রথম বড় যুদ্ধ হল কোরিয়ার যুদ্ধ। ঠান্ডা লড়াইকে কেন্দ্র করে এটিই প্রথম আন্তর্জাতিক যুদ্ধ। এই যুদ্ধেই সর্বপ্রথম সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৈন্যবাহিনী আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। মহাযুদ্ধের পর অর্থাৎ ১৯৪৫ সালে রাশিয়া উত্তর কোরিয়া দখল করে। অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়া মার্কিন সৈন্যবাহিনীর অধীনে আসে। কিন্তু কিছুদিন পর সিংগম্যান রী এর নেতৃত্বে দক্ষিণ কোরিয়াকে একটি 'গণতান্ত্রিক' দেশ-এ পরিণত করে আমেরিকানরা দক্ষিণ কোরিয়া ত্যাগ করে। অন্যদিকে রাশিয়া উত্তর কোরিয়ার 'পিপলস ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক' গঠন করে। ৩৮ ডিগ্রী সমান্তরাল রেখাকে দুই কোরিয়ার মধ্যে বিভাজন রেখা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১৯৫০ সাল পর্যন্ত পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ ছিল। কিন্তু এই বছরে দুই কোরিয়ার মধ্যে হঠাৎই সংঘর্ষ শুরু হয়। এই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ কি ছিল তা খুঁজে বের করা খুবই কঠিন। কোন্ দেশ প্রকৃত আক্রমণকারী তাও স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। যাই হোক শেষপর্যন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সাম্যবাদী উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী হিসাবে সাব্যস্ত করে। অন্যদিকে উত্তর কোরিয়া দাবী করে যে দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী প্রথম ৩৮ ডিগ্রী সমান্তরাল রেখা লঙঘন বা অতিক্রম করে। সোভিয়েত বিদেশমন্ত্রী বলেন যে, এই ঘটনা হল জনগণতান্ত্রিক কোরিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে দক্ষিণ কোরিয়ার সৈন্যবাহিনীর পূর্বপরিকল্পিত আক্রমণ।

যাইহোক ১৯৫০ সালের ২৫শে জুন কোরিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল-এর কাছে ঘটনাটি জানায়। আমেরিকা অভিযোগ করে যে উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করেছে এবং এর মাধ্যমে শান্তি ভঙ্গ করা হয়েছে। সেই দিনই নিরাপত্তা পরিষদ আলোচনায় বসে। প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে, অবিলম্বে সংঘর্ষ বন্ধ করতে হবে এবং উত্তর কোরিয়ার সেনাবাহিনীকে পশ্চাদ অপসরণ করে ৩৮ ডিগ্রি সমান্তরাল রেখায় ফিরে আসতে হবে। পরের দিন কোরিয়া সংক্রান্ত জাতিপুঞ্জ কমিশন জানায় যে উত্তর কোরিয়ার সেনাবাহিনীর অগ্রগমন এক বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। ২৭শে জুন নিরাপত্তা পরিষদ একটি প্রস্তাবে উত্তর কোরিয়া কর্তৃক জাতিপুঞ্জের প্রস্তাবে সাড়া না দেওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং উত্তর কোরিয়ার আক্রমণকে বাধা দেবার জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে আহ্বান জানায়।

বস্তুত পক্ষে আমেরিকা দূর প্রাচ্যে কমিউনিস্ট প্রগতি রোধ করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। দক্ষিণ কোরিয়ার সিংগম্যান রী-র সরকারকে সাহায্য করার জন্য আমেরিকা বিমান ও নৌবাহিনী পাঠায়। ফরমোজাকে রক্ষা করার জন্য আমেরিকা তার সপ্তম নৌবহরকে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। অন্যদিকে ৭ই জুলাই নিরাপত্তা পরিষদ উত্তর কোরিয়ার সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ খ্যাত মার্কিন সেনাপতি ডগলাস ম্যাক আর্থারকে এই বাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আমেরিকা ছাড়া আরও পনেরটি রাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের বাহিনীতে যোগ দেয়।

চীন তৎক্ষণাৎ তার 'স্বেচ্ছাসেবক' বাহিনী উত্তর কোরিয়ায় পাঠায়। এদের সংখ্যা ছিল প্রায় সাত লক্ষ। এরা উত্তর কোরিয়ার পক্ষে যুদ্ধ করে। এই চীনাবাহিনী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল যার অধিকাংশই রাশিয়া কর্তৃক পাঠানো হয়েছিল। দক্ষিণ কোরিয়াকে ধ্বংস করার জন্য রাশিয়ার বিমান পাঠানো হয়। সুতরাং দুপক্ষই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিল। দুবছর ধরে যুদ্ধ চলার পরও কিন্তু যুদ্ধের কোন নিষ্পত্তি হয়নি। উভয়েই একে অপরের এলাকায় বারবার প্রবেশ করতে থাকে। চীনাবাহিনী রাষ্ট্রসংঘের বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওল অধিকার করে। জাতিপুঞ্জ বাহিনী

আবার তা পুনরুদ্ধার করে। জেনারেল ম্যাক আর্থার চীনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার হুমকি দেন। আমেরিকা তাকে সরিয়ে নেন। যাই হোক ১৯৫১ সালের ১১ই জানুয়ারী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যুদ্ধ বিরতি ঘোষণার প্রস্তাব করে। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট সমগ্র কোরিয়ার ঐক্য ও কমিউনিস্ট বিরোধী সরকার গঠন সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে অস্ত্র ত্যাগ করতে রাজি হলেন না। শেষ পর্যন্ত আমেরিকা কমিউনিস্ট আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা এবং দক্ষিণ কোরিয়ার পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব নিলে তিনি যুদ্ধ বিরতিতে সম্মতি দেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর প্রথম বড় যুদ্ধ হল কোরিয়ার যুদ্ধ। ১৯৫০ সালের ২৫শে জুন রাশিয়া অধিকৃত উত্তর কোরিয়া ও আমেরিকা অধিকৃত দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যেও এই যুদ্ধ শুরু হয়। দু বছর ধরে যুদ্ধ চলার পরেও কিন্তু যুদ্ধের কোন নিস্পত্তি হয়নি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপ সত্বেও শেষ পর্যন্ত দুই কোরিয়ার মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব হয়নি।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, উত্তর কোরিয়া ও চীনের মধ্যে বেশ কয়েকটি বৈঠকের পর পান্‌মুন্‌জন নামক স্থানে ১৯৫৩ সালের ২৭শে জুলাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৩৮ ডিগ্রী দ্রাঘিমা রেখা বরাবর উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া বিভক্ত হল। উভয় পক্ষই যুদ্ধ বন্দীদের ফিরিয়ে নিতে রাজী হন এবং তা ৬০ দিনের মধ্যে কার্যকরী হবে বলে স্থির হয়। ভারতের সভাপতিত্বে একটি নিরপেক্ষ কমিশনের উপর বন্দী বিনিময়ের ভার দেওয়া হল। এই কমিশনের অন্যান্য সদস্যরা ছিল পোল্যান্ড, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া। তবে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে পারস্পরিক বিবাদে কমিশনের কাজে ব্যাঘাত ঘটতে থাকে। কিন্তু ভারত ও অন্যান্য সদস্যদের ধৈর্য ও উদারতার ফলে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ বিনিময়ের কঠিন কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছিল। যুদ্ধ বিরতি চুক্তি অনুযায়ী উভয়পক্ষের প্রতিনিধিরা বিদেশী সৈন্য অপসারণ ও কোরীয় সমস্যার সমাধানের জন্য একটি অধিবেশনে বসবে। এই অধিবেশন ১৯৫৪ সালে জেনেভা শহরে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এতে কোরিয়ার ঐক্যের প্রশ্নের কোন মীমাংসা করা হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধ ছিল ফলাফল শূন্য। দুই কোরিয়ার মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। চীনেরও লাভ কিছু হয়নি। বরং জাতিপুঞ্জের সদস্যলাভে তারা বঞ্চিত হয়। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সীমানা ইউরোপ ছাড়িয়ে এশিয়ায় বিস্তৃত হয়। যুদ্ধে চীনের যোগদানের ফলে আমেরিকার সোভিয়েত বিরোধিতা সাম্যবাদ বিরোধিতায় রূপান্তরিত হয়। আমেরিকা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাম্যবাদ প্রতিহত করার জন্য ব্যবস্থা নিতে শুরু করে।

প্রশ্ন

১। কোরিয়া যুদ্ধ কবে শুরু হয়?

২। কোরিয়া যুদ্ধের উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল?

২.৫.৩.২ ঃ কিউবা সংকট

কিউবা দ্বীপটি ক্যারিবিয়ান সাগরে অবস্থিত। স্পেন যখন ল্যাটিন আমেরিকা থেকে তার উপনিবেশগুলি ত্যাগ করতে থাকে সেই সময় কিউবাও স্পেনের অধীনতা পাশ থেকে মুক্ত হয়। কিন্তু কিউবা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হতে পারেনি। সেখানে স্পেনের পরিবর্তে আমেরিকার রাজনৈতিক প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৩ সালে প্লাট চুক্তি অনুসারে আমেরিকা কিউবার আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার লাভ করে। ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত কিউবাতে আমেরিকার প্রভাব বলবৎ ছিল।

কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভল্টে ল্যাটিন আমেরিকার প্রতি 'Good Neighbour Policy' অনুসরণ করার ফলে কিউবা ও আমেরিকার সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। কিউবায় মার্কিন প্রভাব হ্রাস পায়। ১৯৪৭ সালে আমেরিকা ও ল্যাটিন

আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে দুটি পারস্পরিক নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিউবাও এতে স্বাক্ষর করে। কিউবা ও আমেরিকা পরস্পর নিরাপত্তার ব্যাপারে সংযুক্ত হয়। ১৯৫২ সালে বাতিস্তা আমেরিকার সহায়তায় এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে কিউবার রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি কিউবার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই অর্থনৈতিক অব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিউবায় সাম্যবাদী বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৫৯ সালে ফিডেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে কিউবায় আভ্যন্তরীণ বিপ্লব ঘটে। কাস্ত্রো কিউবায় শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু নানা কারণে কাস্ত্রোর সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের অবনতি ঘটে।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই অর্থনৈতিক অব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিউবায় সাম্যবাদী প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৫৯ সালে ফিডেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে কিউবায় আভ্যন্তরীণ বিপ্লব ঘটে। বাতিস্তা পরিচালিত সরকারের পতন ঘটে। কাস্ত্রো কিউবার শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু নানা কারণে কাস্ত্রোর সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। কারণগুলি হল ঃ (১) সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে কাস্ত্রোর মৈত্রী নীতি, (২) কিউবার স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা (৩) বৈদেশিক শিল্প ও বাণিজ্যের জাতীয়করণ, (৪) কিউবার অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে মার্কিন নির্ভরতা কমানো; (৫) সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন (৬) রাশিয়ার উপর অর্থনৈতিক ও সামরিক নির্ভরতা স্থাপন ইত্যাদি। এইসব কারণে আমেরিকা কাস্ত্রোর উপর অসন্তুষ্ট হয়। আমেরিকা নানাভাবে কিউবার অর্থনীতি ধ্বংস করার চেষ্টা করে। কিন্তু কাস্ত্রো তা ব্যর্থ করে দেন। ১৯৬০ সাল থেকে আমেরিকা কিউবায় রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। ১৯৬১ সালে দেশত্যাগী কাস্ত্রো-বিরোধীরা আমেরিকার সাহায্যে কিউবা আক্রমণ করে। কিন্তু কাস্ত্রোতা ব্যর্থ করে দেন। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে আমেরিকা কিউবাকে আগের দুটি চুক্তি এবং O.A.S. (Organisation of American States) থেকে বহিষ্কার করে।

এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিউবা নিজের নিরাপত্তা ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়ে। কিউবা আত্মরক্ষার জন্য রাশিয়ার দ্বারস্থ হয়। কিউবার ভয় ছিল Rio Pact এর অন্যান্য ল্যাটিন আমেরিকার সদস্যরা কিউবা আক্রমণ করতে পারে। সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট ক্রুশ্চেভ কিউবাকে অস্ত্র সাহায্য করেন। কিউবা রাশিয়ার সাহায্যে একটি ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি নির্মাণ করে। তবে কাস্ত্রো প্রচার করেছিলেন এটি একটি মৎস্য ধরার ঘাঁটি। আমেরিকার ভয় ছিল এই ঘাঁটি থেকে আমেরিকা ও সমগ্র পশ্চিম গোলার্ধের নিরাপত্তা ব্যাহত হবে। কিউবা রাশিয়ার সাহায্যে তার বিমান বাহিনীকেও শক্তিশালী করার চেষ্টা করে।

এইসব ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি ১৯৬২ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর দেড় লক্ষ সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন। ক্রুশ্চেভ আমেরিকার নিন্দা করেন এবং সোভিয়েত বাহিনীও প্রস্তুত থাকবে বলে ঘোষণা করেন। কেনেডি ঘোষণা করেন যে কিউবা থেকে কোন ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হলে তার জন্য রাশিয়া দায়ী থাকবে। তাছাড়া তিনি ক্রুশ্চেভকে কিউবা থেকে আক্রমণাত্মক অস্ত্রশস্ত্র অপসারণ করার জন্য অনুরোধ করেন। কেনেডি কিউবার চারদিকে নৌ-অবরোধ সৃষ্টি করেন এবং ঘোষণা করেন যে কিউবা গামী সমস্ত জাহাজগুলিতে অনুসন্ধান করা হবে। ১৯৬২ সালের ২৪শে অক্টোবর কেনেডি মার্কিন বাহিনীকে নির্দেশ দেন যে রাশিয়া কর্তৃক কিউবায় প্রেরণ করা অস্ত্রশস্ত্র রাস্তায় আটক করা হবে। সোভিয়েত রাশিয়া একটি পাল্টা ঘোষণায় জানায় যে কিউবাগামী কোন জাহাজ বাধাপ্রাপ্ত হলে গুলিবর্ষণ করা হবে। ২৫শে অক্টোবর পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। আমেরিকা রাশিয়ার একটি তৈলবাহী জাহাজ ও লেবাননের একটি সামগ্রীবাহী জাহাজ তল্লাসী করে। কিন্তু কোনটিতেই আক্রমণাত্মক অস্ত্র ছিল না। জাহাজ দুটি ছেড়ে দেওয়া হয়।

এই পরিস্থিতিতে কিউবা, রাশিয়া ও আমেরিকা তিন পক্ষই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে বিষয়টি উত্থাপন করেন। রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট ও জোট নিরপেক্ষ দেশগুলি শান্তিরক্ষার জন্য কেনেডি ও ক্রুশ্চেভের কাছে আবেদন করেন।

উ থান্ট দুপক্ষকে যুদ্ধাত্মক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করেন। উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য উ থান্ট আমেরিকা ও রাশিয়ার কাছে দুটি প্রস্তাব পাঠান। প্রথমতঃ উ থান্ট ক্রুশ্চেভকে অনুরোধ করেন যে সোভিয়েত জাহাজ যেন মার্কিন প্রহরারত জাহাজ থেকে দূরে থাকে। দ্বিতীয়তঃ উ থান্ট আমেরিকাকে জানান যে রাশিয়া কিউবা থেকে আক্রমণাত্মক সামরিক সাজ-সরঞ্জাম সরিয়ে নেবে। তবে আমেরিকাকেও তুরস্ক থেকে অনুরূপ জিনিস সরাতে হবে। কেনেডি জানান যে আমেরিকা কিউবা থেকে নৌ-অবরোধ তুলে নেবেন। কিন্তু একই সঙ্গে রাশিয়াকেও কিউবা থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিগুলিকে তুলে নিতে হবে। ১৯৬২ সালের ২৮শে অক্টোবর ক্রুশ্চেভ কিউবা থেকে সমস্ত ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি সরিয়ে নেবার আদেশ দেন এবং কেনেডিকে তা জানানো হয়। রাশিয়া প্রকৃতই কিউবা থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি গুলি তুলে নেয়। ১৯৬২ সালের ২০শে নভেম্বর আমেরিকা ও কিউবা থেকে নৌ অবরোধ তুলে নেয়। এইভাবে বিশ্বের দুই শক্তিশালী নেতা কেনেডি ও ক্রুশ্চেভের মনে শুভবুদ্ধির উদয় হওয়ার ফলেই কিউবা সমস্যার আপাতত সমাধান হয় এবং ১৯৬২ সালে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা দূর হয়।

রাষ্ট্রসংঘ কেনেডি ও ক্রুশ্চেভের দূরদর্শিতার প্রশংসা করে। পৃথিবী আসন্ন মানবিক যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা পায়। ক্রুশ্চেভ যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির পক্ষপাতী তা প্রমাণিত হয়। কেনেডি ক্রুশ্চভের এই দূরদর্শিতার প্রশংসা করেন। এরপর রুশ-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। ১৯৬৩ সালে মস্কোয় আনবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধকরণের জন্য উভয়ের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু আলবানিয়া ও চীন ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি তুলে নেবার জন্য ক্রুশ্চেভের নিন্দা করে। চীন আমেরিকাকে 'Paper Tiger' নামে অভিহিত করে। ক্রুশ্চেভ এর উত্তরে বলেন যে, এই বাঘের 'মানবিক দন্ত' আছে। যা হোক এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে আদর্শগত সংঘাত দেখা দেয় এবং উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে। তবে কিউবা সংকটের সময়ে লাতিন আমেরিকার কিছু রাষ্ট্র মার্কিন নীতি সমর্থন করলেও অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি বাধ্য হয়েই আমেরিকাকে সমর্থন করতে সম্মত হয়। তারা তাদের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট ছিল। তারা কিউবা অবরোধের প্রস্তাব অনিচ্ছা সত্বেও গ্রহণ করেছিল। পরবর্তীকালে আমেরিকা লাতিন আমেরিকাকে সাম্যবাদী প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হয়। তবে লাতিন আমেরিকায় কমিউনিষ্ট বিরোধিতাকে শক্তিশালী করতে গিয়ে আমেরিকা যে সব প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলিকে সমর্থন করেছিল, তার ফলে এই অঞ্চলের জনগণ আরও বেশী মাত্রায় মার্কিন বিরোধী হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন

১। কিউবা সংকট কি? কিভাবে এই সমস্যার সমাধান হয়?

২.৫.৩.৩ ঃ কাশ্মীর সমস্যা

১৯৪৭ সালের পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উদ্ভূত কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের জন্য রাষ্ট্রসংঘ উদ্যোগী হয়। ভারত ও পাকিস্তান এই দুটি রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই উভয়ের মধ্যে যে তিক্ত ও বৈরী সম্পর্ক তৈরী হয় তার মূলে ছিল কাশ্মীর সমস্যা। ভারত বিভাগের আগে কাশ্মীরের শাসক ছিলেন রাজপুত রাজা হরি সিং। তিনি ছিলেন হিন্দু। কিন্তু কাশ্মীর উপত্যকার অধিকাংশ অধিবাসী ছিল মুসলমান। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় হরি সিং ভারত বা পাকিস্তান কোন দেশের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়নি। দুই দেশের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে একটি স্বাধীন রাজ্য হিসাবে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান মনে করেছিল কাশ্মীরের পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। কারণ ভারত বিভাগ ধর্মের ভিত্তিতেই হয়েছিল। অন্যদিকে

ভারত হিন্দু রাজা হরি সিংকে ভারতের অন্তর্ভক্ত হবার জন্য আবেদন জানায়। যাই হোক ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট কাশ্মীরকে ভারত বা পাকিস্তান কারও অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

কিন্তু কিছুদিন পর উত্তর পশ্চিম সীমান্তের জঙ্গী উপজাতিরা কাশ্মীর আক্রমণ করলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। আক্রমণকারীরা দুদিক থেকে সাহায্য পায়। প্রথমতঃ পুঞ্চ অঞ্চলের হরি সিং বিরোধী মুসলমানরা তাদের সাহায্য করে। দ্বিতীয়তঃ, ছুটিতে থাকা পাক সৈন্যরা আক্রমণকারীদের সাহায্য করে। হরি সিং ভারতের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানায়। ভারত সম্মত হয়। তবে ভারতীয় সেনাবাহিনী কাশ্মীরে প্রবেশের আগে হরি সিং-এর সঙ্গে ভারতের একটি দলিল স্বাক্ষরিত হয়। এটি ছিল অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত দলিল। এই দলিল অনুযায়ী কাশ্মীর সরকার পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ এই তিনটি ক্ষেত্রে ভারতের কর্তৃত্ব মেনে চলতে রাজী হয়। ভারতীয় বাহিনী কাশ্মীরে পৌঁছানোর ফলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

ভারত ও পাকিস্তান এই দুটি রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই উভয়ের মধ্যে যে তিক্ত ও বৈরী সম্পর্ক তৈরী হয় তার মূলে ছিল কাশ্মীর সমস্যা। ১৯৪৮-১৯৫৭ সালের মধ্যে রাষ্ট্রসংঘ গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে চাইলেও তা শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি। ফলে বর্তমানেও কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাক সম্পর্কের মাঝখানে একটি তীক্ষ্ণ কাঁটায় পরিণত হয়ে রয়েছে।

১৯৪৭ সালের ২রা নভেম্বর নেহরু এক বেতার ভাষণে ঘোষণা করেন যে কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা তা কাশ্মীরের মানুষদের গণভোটের মাধ্যমে স্থির করা হবে। তারপর ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী নেহরু কাশ্মীর সমস্যাটি রাষ্ট্রসংঘের এক্তিয়ারে নিয়ে আসেন। তিনি সমগ্র বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদের কাছে পাঠান। নিরাপত্তা পরিষদ পাঁচজন সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে। যুদ্ধ বিরতি ও গণভোটের উদ্দেশ্যে কমিশনের সদস্যরা ভারতে আসেন। কমিশন কতকগুলি প্রস্তাব দেয়। সেগুলি হল ঃ (ক) পাকিস্তান কাশ্মীর থেকে উপজাতি আক্রমণকারীদের সরিয়ে নেবে ও যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করবে। (খ) একটি চুক্তির মাধ্যমে ভারত কাশ্মীর থেকে তার সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেবে। (গ) কাশ্মীরের ভবিষ্যত কাশ্মীরের জনগণই নির্ধারণ করবে। (ঘ) গণভোটের জন্য দুই দেশের প্রতিনিধিরা কমিশনের সঙ্গে আলোচনায় বসবে।

রাষ্ট্রসংঘের কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে। গণভোট পরিচালনা করার জন্য কমিশন একজন প্রশাসক নিযুক্ত করে। তবে যুদ্ধ বিরতির পর কাশ্মীর পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও পাক বহির্ভূত কাশ্মীর এই দুই অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু কমিশন গণভোটের কাজে ব্যস্ত থাকার সময়ই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পুনরায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। উভয় রাষ্ট্র উভয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে কাশ্মীর থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়নি। এই উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে গণভোটের পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। কিন্তু কমিশন তাদের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। রাষ্ট্রসংঘ আরও একজন প্রতিনিধিকে ভারতে পাঠায়। তিনি ঘুরে এসে নিরাপত্তা পরিষদের কাছে তাঁর সুপারিশ পেশ করেন যে কাশ্মীরকে যেন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তান কেউই এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজী হয়নি। এরপর রাষ্ট্রসংঘ আরও একজন প্রতিনিধিকে পাঠায় গণভোট বাস্তবায়িত করার জন্য। কিন্তু তিনিও সফল হননি। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে রাষ্ট্রসংঘ গণভোট কার্যকরী করার জন্য অনেকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি।

ভারত গণভোটের প্রস্তাবে রাজী হয়নি এই কারণে যে পাকিস্তান আমেরিকার কাছ থেকে অস্ত্র সাহায্য পাচ্ছে। ভারত কাশ্মীরে সৈন্য রাখার দাবী জানায়। ভারত সরকার জম্মু-কাশীরের প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাকে গ্রেপ্তার করলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। গণভোটের বিষয়টি আরও দূরে চলে যায়। এই অবস্থায় রাষ্ট্রসংঘ আলাপ-আলোচনার

মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী হয়। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর কাশ্মীর সমস্যা ঠান্ডা লড়াই-এর রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। নিরাপত্তা পরিষদ গণভোট সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করলে রাশিয়া প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ভেটো প্রয়োগ করে তা বন্ধ করে দেয়। রাশিয়ার এই ভূমিকায় ভারত খুশী হয়। ১৯৬৪ সালে নিরাপত্তা পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি জানান যে ভারত কোন অবস্থাতেই কাশ্মীরে গণভোটে রাজী হবে না। অন্যদিকে পশ্চিমী রাষ্ট্রজোট পাকিস্তানের পক্ষে কাশ্মীরে গণভোটকে সমর্থন করে।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান কচ্ছ সীমান্তে কয়েকটি জায়গা দখল করলে দুই দেশের মধ্যে আবার বিরোধ দেখা দেয়। পাক-বাহিনী কাশ্মীরের ছাম্ব এলাকায় প্রবেশ করে। দুপক্ষে সংঘর্ষ শুরু হয়। নিরাপত্তা পরিষদ উভয় পক্ষকেই যুদ্ধবিরতি পালন করার জন্য নির্দেশ দেয়। ১৯৬৬ সালে রাশিয়ার মধ্যস্থতায় তাসখন্দ ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে ভারত-পাক বিরোধের সাময়িক অবসান ঘটে। ১৯৭২ সালে সিমলা চুক্তির মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তান কাশ্মীর সমস্যা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করতে রাজী হয়। তবে পাক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জঙ্গীরা ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে ক্রমাগত অনুপ্রবেশ করার ফলে কাশ্মীর সমস্যা ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠেছে।

তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রাষ্ট্রসংঘ গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীরের জনগণের প্রকৃত আকাঙ্খার যে প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছিল, তা ভারত ও পাকিস্তানের পারস্পরিক রাজনৈতিক স্বার্থ দ্বন্দ্বের আবর্তে দূরে সরে যায়। কাশ্মীর ভারত-পাক সম্পর্কের মাঝখানে একটি তীক্ষ্ণ কাঁটায় পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন

১। কাশ্মীর সমস্যার উদ্ভব কিভাবে হয়ে ছিল?

২.৫.৩.৪ ঃ প্যালেস্টাইন সমস্যা

প্যালেস্টাইন হল মধ্যপ্রাচ্যের জটিল রাজনৈতিক আবর্তের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। ইজরাইল রাষ্ট্রের উদ্ভব প্যালেস্টাইন সমস্যাকে জটিল করেছে। আরব ও ইজরাইলের মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধের প্রধান কেন্দ্রস্থল হল প্যালেস্টাইন। রাষ্ট্রসংঘ প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধান করার জন্য সবসময় উদ্যোগী হয়েছে। আরব ও ইহুদী উভয়েই সেমিটিক জাতির অন্তর্গত। সেজন্য উভয়েরই ইজরাইলের প্রতি গভীর আকর্ষণ ও আবেগ রয়েছে। প্যালেস্টাইনের একই এলাকার উপর এই দুটি জাতির দাবির ফলেই প্যালেস্টাইন সমস্যার উদ্ভব হয়। প্যালেস্টাইনের অধিকাংশ জনগণই ছিল আরবীয় মুসলমান। তা সত্ত্বেও ইহুদিরা প্যালেস্টাইনে একটি স্বতন্ত্র ইহুদি রাষ্ট্র গঠন করার দাবী জানায় ও সচেষ্ট হয়। তারা জিওনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলে।

১৯২০ সালের পর থেকে প্রচুর সংখ্যক ইহুদি প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করতে শুরু করলে প্যালেস্টাইনবাসী আরবরা প্রচন্ড বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। দুপক্ষের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্যালেস্টাইন সমস্যা কিছুটা দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। হিটলারের ইহুদি-ঘৃণার জন্য ইহুদিরা মিত্রপক্ষকে হিটলারের বিরুদ্ধে সাহায্য করে। তবে নাৎসী অত্যাচারের ফলে বহু ইহুদি উদ্বাস্তু প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করতে থাকে। এর ফলে আরবরা আরও ক্ষুব্ধ হয়। সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে। প্যালেস্টাইন দীর্ঘদিন ব্রিটিশ ম্যানডেটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইনে ব্রিটিনের মেয়াদ শেষ হবার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই ১৯৪৭ সালে ব্রিটেন প্যালেস্টাইন সমস্যাটিকে রাষ্ট্রসংঘে উত্থাপিত করে। এগারোজন সদস্যবিশিষ্ট

রাষ্ট্রসংঘের একটি বিশেষ কমিটি প্যালেস্টাইনকে দুভাগে বিভক্ত করার প্রস্তাব দেয়। সাধারণ সভা তা পাশ করে। ইজরাইল খুশী হয়। কিন্তু আরব রাষ্ট্রগুলি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কিছুদিন পর আরব লীগের সঙ্গে ইহুদিদের লড়াই শুরু হয়ে যায়। ইতিমধ্যে ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে ব্রিটেন প্যালেস্টাইন থেকে তার ম্যানডেট প্রত্যাহার করে নেয়। সেদিনই নতুন ইহুদি রাষ্ট্র ইজরাইল জন্মলাভ করে। ফলে আরব ও ইহুদিদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়। আরবরা পরাস্ত হয়। প্যালেস্টাইনে ইহুদি এলাকার সীমানা বর্ধিত হয়। রাষ্ট্রসংঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বন্ধ হয়। প্যালেস্টাইন বিভাগের জন্য নিযুক্ত কমিশন রাষ্ট্রসংঘের কাছে সামরিক সাহায্য চায়। রাশিয়া ও আমেরিকা এই সাহায্য দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ব্রিটেনের ভেটোতে এই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। এর ফলে কমিশন সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারেনি।

*আরব ও ইজরাইলের মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধের প্রধান কেন্দ্রস্থল হল প্যালেস্টাইন। প্যালেস্টাইনের একই এলাকার উপর এই দুটি জাতির দাবির ফলেই প্যালেস্টাইনের সমস্যার উদ্ভব হয়। ফলে দুপক্ষের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয়। রাষ্ট্রসংঘ এই সমস্যা সমাধানের এগিয়ে আসলেও তার এর কোন সঠিক মিমাংসা করতে সক্ষম হননি। অবশেষে ১৯৬৪ সালে **P.L.O** বা প্যালেস্টাইন সংঘের উৎপক্তি প্যালেস্টাইন সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছিল।*

১৯৫৬ সালে সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করা হলে ক্রুদ্ধ ইজরাইল মিশর আক্রমণ করে। ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্য মিশরে অবতরণ করে। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের প্রচেষ্টায় শান্তি স্থাপিত হয়। ১৯৬৭ সালে আবার ইজরাইল-সিরিয়া সীমান্ত যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশে পুনরায় যুদ্ধবিরতি হয়। তবে রাষ্ট্রসংঘ ইজরাইলকে বিজিত এলাকা ফিরিয়ে দেবার জন্য রাজী করাতে পারেনি। ১৯৭০ সালে রাষ্ট্রসংঘ নতুন যুদ্ধবিরতি রেখার ব্যবস্থা করে। কিন্তু আরবরা ইজরাইলের কাছ থেকে হারানো এলাকা পুনরুদ্ধার করার জন্য সচেষ্ট হয়। ১৯৭৩ সালে মিশর ও সিরিয়ার সঙ্গে ইজরাইলের সংঘর্ষ শুরু হয়। রাষ্ট্রসংঘ আবার যুদ্ধবিরতিতে রাজী করায়।

১৯৬৪ সালে P.L.O. বা প্যালেস্টাইন মুক্তিসংঘের উৎপত্তি প্যালেস্টাইন সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছিল। প্যালেস্টাইনবাসী আরব গেরিলাদের এই সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্যালেস্টাইনকে ইজরাইলের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করা। আরব নেতাদের সম্মতি নিয়েই এই সংগঠন তৈরী করা হয়। ১৯৭৩ সালে আরব-ইজরাইল যুদ্ধের পর প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগঠন দারুণ বিপর্যয়ের সামনে পড়ে। তবে ১৯৭৪ সালের ১৪ই অক্টোবর এই সংগঠন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। রাষ্ট্রসংঘ একটি বক্তৃতায় যোগদানের জন্য সংগঠনটিকে আমন্ত্রণ জানায়। সংগঠনের নেতা আরাফত সাধারণ সভায় ভাষণ দেন। সাধারণ সভা এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে প্যালেস্টাইনবাসীদের প্যালেস্টাইনে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে। ইজরাইল মুক্তি সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে রাজী হয়নি। P.L.O. র সঙ্গে ইজরায়েলের ক্রমাগত সংঘর্ষ মধ্য প্রাচ্যের রাজনীতিকে অগ্নিকুন্ডে পরিণত করেছে।

প্রশ্ন

১। প্যালেস্টাইন সমস্যা কি? এই সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা কি ছিল?

২.৫.৩.৫ ঃ ভিয়েতনাম সমস্যা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে ভিয়েতনাম সমস্যা একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। উপনিবেশ বিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন ও ঠাণ্ডা লড়াই-এই দুইয়ের সংমিশ্রণ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক অন্য মাত্রা যোগ করেছিল।

ফরাসীদের অধিগৃহীত ইন্দো-চীনে উপনিবেশ বিস্তারকে কেন্দ্র করে ভিয়েতনামে জাতীয় আন্দোলন শুরু হয় এবং পরবর্তীকালে ভিয়েতনাম ঠান্ডা লড়াই-এর আবর্তে জড়িয়ে পড়ে। ঊনিশ শতকে সমগ্র ইন্দো-চীন উপদ্বীপে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্দোচীন তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল — (১) আন্নাম, (২) টংকিং, (৩) কোচিন চীন। ইন্দোচীনে ধীরে ধীরে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হো-চি-মিন। তিনি কৃষক ও শ্রমিকদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সামিল করতে পেরেছিলেন। হো-চি-মিন আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।তিনি ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে তার নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালনা করেন। তিনি যে জাতীয়তাবাদী সংগঠন গড়ে তোলেন তার নাম হয় ভিয়েতমিন। আমেরিকা ভিয়েতনামের জাতীয় আন্দোলনকে সুনজরে দেখেনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করেছিল। তখন ভিয়েতনাম হো চি মিনের নেতৃত্বে জাপানী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে জাপানের আত্মসমর্পনের পর হো চি মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনাম মুক্তিবাহিনী হ্যানয়ে প্রবেশ করে। তার নেতৃত্বে একটি অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বযুদ্ধের পর ভিয়েতনাম থেকে ব্রিটিশবাহিনী চলে যাবার পর ফ্রান্স পুনরায় ভিয়েতনামে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। ভিয়েতনামের জনগণ তার বিরোধিতা করে। ১৯৪৬ সালে ফ্রান্স ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণ করলে ভিয়েতনামী জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়। গ্রামাঞ্চলে ভিয়েতমিন বাহিনীর কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রান্স এর সামরিক বিপর্যয় দেখা দেয়। ফ্রান্স কূটনীতির মাধ্যমে ভিয়েতনামে তার কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে। আমেরিকা ফ্রান্সের সাহায্যে এগিয়ে আসে। ১৯৫৪ সালে ফ্রান্সের সঙ্গে ভিয়েতমিন বাহিনীর দিয়েন বিয়েন ফুর বিখ্যাত যুদ্ধ সংগঠিত হয়। ফরাসী সেনাপতি ভিয়েতনামের সেনাপতি জেনারেল গিয়াপের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ফ্রান্সের পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৪ সালে জেনেভা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে সপ্তদশ সমাক্ষরেখার উত্তরে ভিয়েতনাম বাহিনী এবং দক্ষিণে ফরাসী বাহিনী থাকবে। উত্তর ভিয়েতনামে 'ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অফ ভিয়েতনাম' নামে একটি নতুন সরকার গঠিত হবে এবং দক্ষিণে অকমিউনিস্ট সরকার আগের মতই থাকবে। রাষ্ট্রসংঘের তদারকিতে দুবছর পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। একটি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠিত হয়। ভারত তার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়।

ফরাসীদের অধিগৃহীত ইন্দো-চীন উপনিবেশ বিস্তারকে কেন্দ্র করে ভিয়েতনামে জাতীয় আন্দোলন শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান যখন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করেছিল। তখন ভিয়েতনাম হো-চি-মিনের নেতৃত্বে জাপানী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কিন্তু ফ্রান্স পুনরায় কুটনীতির মাধ্যমে ভিয়েতনামে তার কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করলে, আমেরিকা ফ্রান্সের সাহায্যে এগিয়ে আসে। ১৯৫৪ সালে ফ্রান্সের সঙ্গে ভিয়েতমিন বাহিনীর দিয়েন বিয়েন ফুর বিখ্যাত যুদ্ধ সংগঠিত হয়। ফরাসী সেনাপতি জেনারেল গিয়াপের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ফ্রান্সের পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৪ সালে জেনেভা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বস্তুতপক্ষে জেনেভা সম্মেলন ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। এই সম্মেলনে দীর্ঘদিনের ফরাসী আধিপত্যের অধ্যায় শেষ হয়েছিল মাত্র। আর একটি নতুন অধ্যায় শুরু হয় -- যার কেন্দ্রস্থলে ছিল আমেরিকা। আমেরিকা ভিয়েতনাম তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে সাম্যবাদের প্রসারে উদ্বিগ্ন ছিল। ভিয়েতনামে সাম্যবাদ প্রতিহত করার জন্য আমেরিকা বেষ্টনীনীতি চালু করে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে একটি তাঁবেদার সরকার গঠন করা হয়। এই সরকারের নেতৃত্বে বসানো হয় নগোদিন দিয়েমকে । আমেরিকা এই সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। দিয়েম জেনেভা চুক্তির শর্ত মানতে রাজি ছিলেন না। এরফলে ১৯৫৬ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। আমেরিকা দিয়েম সরকারকে সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দিতে

থাকে। এই সময় ভিয়েতনাম কার্যত রাজনৈতিক দিক থেকে ১৭°তে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৫৪ সালে আমেরিকা SEATO নামে এক সামরিক গোষ্ঠী গঠন করে। এই গোষ্ঠী ভিয়েতনামকে এর আওতার মধ্যে নিয়ে আসে।

ভিয়েতনাম দুভাগে ভাগ হয়ে গেলেও দক্ষিণ ভিয়েতনামে অসংখ্য ভিয়েনমিন গেরিলা রয়ে গিয়েছিল। তারা দিয়েমের দূনীর্তিপরায়ণ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গড়ে উঠে। এই মুক্তি সেনাদের বলা হত ভিয়েতকং বা ভিয়েতনামী কমিউনিষ্ট। ১৯৬২ সালে মার্কিন বিমানবাহিনী দক্ষিণ ভিয়েতনামে প্রবেশ করে। দিয়েম সরকারের পতন ঘটিয়েজেনারেল দং ভ্যান মিন থিউ-এর উপর দক্ষিণ ভিয়েতনামের ভার দেওয়া হয়। এই পর্যায়ে আমেরিকা তার পরোক্ষ ভূমিকা থেকে এগিয়ে এসে প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আমেরিকা সরাসরি ভিয়েতনাম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। একটি পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ১৯৬৫ সালে ভিয়েতনামে ৫০৪২০০ মার্কিন সৈন্য ছিল। ১৯৬৮ সালে ভিয়েত কং ও উত্তর ভিয়েতনামের সেনাবাহিনী যৌথভাবে ৪৪টি রাজধানীর উপর আক্রমণ চালায়। আমেরিকা ক্রমশঃ পিছু হঠতে থাকে। ১৯৭৩ সালে আমেরিকান ও ভিয়েতমিন বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধবিরোধী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আমেরিকা দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভিয়েতনাম-এর উপর জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট আধিপত্য বিস্তার করে। ১৯৭৫ সালে জেনারেল ভ্যান মিন সায়গনে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করে।

ভিয়েতনামের যুদ্ধে আমেরিকার শোচনীয় বিপর্যয় বিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসে এবং উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই যুদ্ধে ৫৮০০০ মার্কিন সেনা নিহত হয় এবং ২০ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটে। আমেরিকা ভিয়েতনামে অজস্র্য বোমাবর্ষণ করেও তার উদ্দেশ্য সফল করতে পারেনি। ভিয়েতনামে সাম্যবাদ প্রতিহত করার আমেরিকার স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায়। আমেরিকার ভিয়েতনাম নীতির ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় কারণ হল ভিয়েতনামে মার্কিন নীতি ছিল স্ববিরোধিতায় পরিপূর্ণ। আমেরিকার নীতি ছিল ভ্রান্ত। আমেরিকার পক্ষে এই যুদ্ধ নিষ্ফলতারই নামান্তর। সমগ্র পৃথিবীতে আমেরিকার ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়। সাম্যবাদ প্রতিহত করার জন্য আমেরিকার বেষ্টনী নীতির শোচনীয় পরিণতি ঘটে। যুদ্ধে ভিয়েতনামের জয় এশিয়া তথা পৃথিবীর মুক্তিকামী জনগনের কাছে এক উজজ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল।

প্রশ্ন

১। ভিয়েতনাম সমস্যা বলতে কি বোঝ?

২। এই যুদ্ধে আমেরিকা কেন ব্যর্থ হয়েছিল?

২.৫.৩.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থ

1. A Columbus & J. Walfe — Introduction to International Relations.
2. C. Kegley & E. Wittkopf — World Politics : Trends and Transformations.
3. David Horowitz — From Yalta to Vietnam.
4. Peter Calvocoressi — World Politics since 1945.
5. David A Kay — The U N Political System.

6. George Lenchowski — The Middle East in World Affairs.
7. Radharaman Chakraborti — The UNO : A Study in Essentials.
8. Russel D. Buhite — Major Crisis in Contemporary American Foreign Policies.
9. Maxim Rodinson — Israel and the Arabs.
10. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় -- আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস।
11. অসিত কুমার সেন -- আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস
12. রাধারমন চক্রবর্তী ও সুকল্পা চক্রবর্তী - সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।

২.৫.৩.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোরিয়ার সমস্যার উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল? এই সমস্যার সমাধানে রাষ্ট্রসংঘ কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিল?

২। আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই কিভাবে কিউবার সংকটের সৃষ্টি করেছিল? কিভাবে এই সমস্যার সমাধান হয়?

৩। কাশ্মীর সমস্যার উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল? এই সমস্যার সমাধানের জন্য রাষ্ট্রসংঘ কি কি প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল?

৪। আরব-ইজরায়েল বিরোধ কিভাবে প্যালেস্তাইন সংকটের সৃষ্টি করেছিল? এই সংকটের সমাধানের জন্য রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা আলোচনা কর।

৫। ভিয়েতনাম সমস্যা বলতে কি বোঝ? কিভাবে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল?

৬। ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার ভূমিকা আলোচনা কর। আমেরিকা কেন ব্যর্থ হয়েছিল?

পর্যায়- ৩

একক-৯

তেল, জল ও পরমাণু কূটনীতির নতুন ধারা

৩১২.৩.৯.০ উদ্দেশ্য

৩১২.৩.৯.১ তেল কূটনীতি

৩১২.৩.৯.২ জল কূটনীতি

৩১২.৩.৯.৩ পরমাণু কূটনীতি

৩১২.৩.৯.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩১২.৩.৯.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৩১২.৩.৯.০ উদ্দেশ্য

বর্তমান এককটি ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ব কূটনীতির নব রূপ সম্পর্কিত ধারণার আলোচনা করেছে। যার উদ্দেশ্য হল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তেল, জল ও পরমাণু কূটনীতি সম্পর্কে ধারণা করা। কিভাবে খনিজ তেলের চাহিদা বিশ্ব রাজনিতীর নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠল এবং সমুদ্রপথের অধিকার নিয়ে যে কূটনৈতিক আলোচনা তার আলোচনা হবে এই এককে।

৩১২.৩.৯.১ তেল কূটনীতি

কুড়ি শতকের প্রথম দিকে মধ্যপ্রাচ্যে বিপুল পরিমাণ তেলের খোঁজ পাওয়া যায় । সেই তেলের দখল নিয়ে বৃহৎ ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে তারপর থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়।প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ব্রিটেন সাম্রাজ্যের পাশাপাশি তেল দখলের প্রতিযোগিতায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র ছিল। ১৯০৮ সালে অ্যাংলো ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানি (Anglo-Iranian Oil Company) গড়ে ওঠে। ইরান সরকার এর বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনায় হস্তক্ষেপ করেনি। তবে রাশিয়াও মধ্যপ্রাচ্যের তেলের প্রতি আগ্রহী হওয়ায় ইরান রাশিয়াকে যুক্ত করে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে একটি চুক্তি করতে বাধ্য হয়। এই চুক্তি ইরানকে শোষণের ক্ষেত্র হিসেবে দু'ভাগে বিভক্ত করে দেয়। দেশের উত্তরাংশে রাশিয়া আর দক্ষিণাংশ ভোগের অধিকার কায়েম করে ব্রিটেন।প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পশ্চিমি রাষ্ট্রগুলো মধ্যপ্রাচ্যের তেলের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং তেল সম্পদকে কেন্দ্র করে পশ্চিমি শক্তিগুলির মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। আমেরিকা উপলব্ধি করে যে, তার নিজ দেশে উৎপাদিত তেল আর অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট না। তাই মধ্যপ্রাচ্যের

তেলের দিকে তার নজর পড়ে। গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে স্বাক্ষরিত 'সান রেমো' চুক্তির বিরুদ্ধে আমেরিকা প্রতিক্রিয়া জানায় যে, এই চুক্তি শাসনাধিকার প্রাপ্ত ভূখণ্ডে (ম্যানডেট) মিত্রবর্গের সমান অর্থনৈতিক অধিকার ও সুবিধাভোগের প্রতিশ্রুতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তীব্র টানাপোড়েনের শেষে ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে প্রবল দর কষাকষির পর টার্কিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানিতে আমেরি ২৩-৬৬ শতাংশের অংশের অংশীদারত্ব নিশ্চিত হয়।

বিশ্বযুদ্ধের আগে ১৯১৬ সালের সমঝোতায় রাশিয়াও মধ্যপ্রাচ্যে কিছু সুবিধাভোগের অধিকার পায়। কিন্তু ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর বলশেভিকরা জার সাম্রাজ্যের আমলে ইরানে প্রাপ্ত বিশেষ সুবিধাধিকার একতরফাভাবে ছেড়ে দেয়। ইরানের সমস্ত ঋণ রাশিয়া বাতিল করে দিয়ে ইরানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সে হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এইভাবে যুদ্ধের পর ইরান সোভিয়েত ইউনিয়নের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। তেলের ওপর নিয়ন্ত্রনের জন্য মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটেনের দায়িত্ব বেড়ে যায়। ফ্রান্স এবং আমেরিকার তেল কোম্পানিগুলিও তাদের অংশ সুনিশ্চিত করে। ১৯২৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানি বাহরিনের শেখদমে তেল উত্তোলনের অধিকার লাভ করে। এই কোম্পানি ১৯৩৩ সালের মে মাসে সৌদি আরবের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই একই অধিকার পেয়ে যায়।

১৯৪৪ সালে যখন সোভিয়েত রাশিয়া উত্তরের প্রদেশগুলিতে তেলের অধিকারের বিষয়ে ১৯১৬ সালের বোঝাপড়ার পুনঃস্থাপনের দাবি জানায়, তখন তেলের দখল রুশ পারস্য বন্ধুত্ব চুক্তির মাধ্যমে ১৯২১ সালে সরকারিভাবে ত্যাগ করেছিল। কিন্তু সেই স্বেচ্ছাত্যাগ অধিকারহীনতার সমার্থক নয় বলে রাশিয়া ঘোষণা করে। তার মতে এই রুশ অধিকার অস্বীকার করা হবে শত্রুতার নামান্তর। ইরানের সংসদ 'মজলিস' তাকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরামর্শ দেয় যে, যতদিন না ইরানের মাটি থেকে সমস্ত বিদেশি সৈন্য অপসারিত হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত তেলের অধিকার বিষয়ক সমস্ত আলোচনা স্থগিত থাকবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে মস্কোয় প্রচণ্ড ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মেয়াদ ১৯৪৪ সালের ২ মার্চ শেষ হলে ব্রিটেন এবং আমেরিকা তাদের নিজস্ব সেনা ইরান থেকে সরিয়ে নেয়, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন যতক্ষণ পর্যন্ত ইরান উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলিতে তেল উত্তোলন এবং অনুসন্ধানের জন্য যৌথ কোম্পানি স্থাপনের চুক্তিতে না পৌঁছয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেনা অপসারণ করেনি। ১৯৪৭ সালের ২২ অক্টোবর ইরানি ‘মজলিস' নিজস্ব বিনিয়োগে তেল অনুসন্ধান ও উত্তোলনের পরিকল্পনা ঘোষণা করে। মজলিস' ১৯৫১ সালের ২৪ এপ্রিল আইন পাশ করে তেল শিল্পের জাতীয়করণ করে। অক্টোবরে এ.আই.সি.সি.-র সমস্ত বিদেশি কর্মী তেল ক্ষেত্রগুলি এবং আবাদান শোধনাগার ছেড়ে চলে যায়।

এই অবস্থার ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৩ সালের একপাক্ষিক চুক্তি বর্জনের প্রতিবাদ জানায়। ইরান সরকারের কাছে চুক্তির ধারা অনুযায়ী বিতর্কের নিষ্পত্তি করতে চেয়ে ব্রিটেন আন্তর্জাতিক আদালতে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। ইরান এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে যুক্তি দেখায় যে, হেগ আদালতের মতো কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থার ইরানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। ব্রিটেন এককভাবে বিষয়টি আন্তর্জাতিক আদালতে উত্থাপন করলে আদালত

বিবদমান পক্ষগুলিকে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেয়। অসন্তুষ্ট ব্রিটেন আদালত থেকে তার সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেয়। এক্ষেত্রে মার্কিন মধ্যস্থতার চেষ্টাও বিফলে যায়। ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে গ্রেট ব্রিটেন এই বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে তোলে, কিন্তু তাও নিষ্ফল হয়।

তেল কূটনীতির দ্বিতীয় পর্যায়

ইরানের তেল নিয়ে এই কূটনীতির দ্বিতীয় পর্যায়ে সরাসরি ঢুকে পড়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু তা করতে গিয়ে অজান্তেই সে জড়িয়ে পড়েছিল ইরানের অভ্যন্ত ধর্মীয় রাজনীতির সঙ্গে। ইরানীয় সমাজের শাসক এবং উচ্চবর্গ ছিল সুন্নি গোষ্ঠীর, আর শাসিতের সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষা। ইরানীয় সমাজে শিয়া-সুন্নির বিরোধ শাসনে বিরুদ্ধে শাসিতের প্রতিরোধের চেহারা নিয়েছিল। ইরানের শাহ ১৯২৫ সাল অবধি 'কাজার বংশের এবং তারপর 'পাহলভি বংশের, ব্রিটেন বা আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা আগ্রহী হলেও শিয়া প্রতিনিধিদের হাতে থাকা 'মজলিস' তা করতে দেয়নি। ইরানের তেল দখল করতে চাইলে শুধু শাহের সঙ্গে চুক্তি করাই যথেষ্ট ছিল না। ১৯৫ সালে শাহ মুহম্মদ রেজা (১৯৪১-১৯৭৯) ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতার রাজি ছিলেন, কিন্তু মজলিস'-এর চাপে বাদ সেধেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মুহম্মদ মোসাদের মজলিসকে বাগে আনতে না পেরে আমেরিকা ১৯৫৩ সালে ইরানের বিরুদ্ধে আর্থিক অবরোধের নীতি নিয়েছিল, কিন্তু এতে ফল হয়েছিল হিতে বিপরীত। জঙ্গি শিয়া গোষ্ঠী শাহ-বিরোধী এবং সুন্নি-বিরোধী দাঙ্গা শুরু করেছিল, ইরান ছেড়ে রোমে পালিয়ে গিয়েছিলেন শাহ্ মুহম্মদ রেজা। মার্কিন সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ সি.আই.এ. শেষপর্যন্ত নানা কৌশলে শাহকে ইরানের ক্ষমতায় ফিরিয়ে এনেছিল। ক্ষমতায় ফিরেই শাহ আমেরিকার সঙ্গে তেলের বিনিময়ে মার্কিন অস্ত্র কেনার চুক্তি করেন। ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সময় তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় আমেরিকার পক্ষেও এই লেনদেন লাভজনক হয়।

ইরানের ইসলামীয় বিপ্লব, ১৯৭৯

ইরানের বিদ্রোহী শিয়া নেয়া আয়াতুল্লা খোমেইনি ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্যারিসের নির্বাসন থেকে ফিরে এসেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই ইরানে শুরু হয় মার্কিন-বিরোধী এবং শহ বিরোধী ইসলামীয় বিপ্লব। শাহ তখন চিকিৎসার জন্য আমেরিকাতেই ছিলেন। ১৯৭৯ সালের ৪ নভেম্বর শিয়া ছাত্ররা মার্কিন দূতাবাসের ছেষট্টি জনকে পণবন্দি করে ফেলে, ফলে সি.আই.এ. কিছুই করতে পারেনি। শাহকে আশ্রায় দিয়ে হার মানতে হয়েছিল আমেরিকাকে। সেই সুযোগে সোভিয়েত ইউনিয়ন সেনা পাঠিয়ে দিয়েছিল আফগানিস্তানে। মার্কিন সমাজে এই ঘটনা চরম অপমানকর বলে মনে হয়েছিল, প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারকে বলা হয়েছিল ‘indecisive' এবং 'wimp'। ১৯৮০ সালের নির্বাচনে হেরে গিয়েছিলেন তিনি। ইসলামীয় বিপ্লবের পর ইরানে শরিয়তি আইন চালু হয়, তেলের ওপর পশ্চিমি নিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এই ব্যবস্থা হজন করা সম্ভব ছিল না। পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগান বাধ্য হয়েছিলেন ইরানের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে। এই যুদ্ধ তিনি চাপিয়েছিলেন ইরাকের মাধ্যমে। তারই প্রতা ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেন ১৯৮০ সালে ইরান আক্রমণ করেছিলেন।

ইরান-ইরাক যুদ্ধ

সাদ্দাম হোসেন ইরাকে ক্ষমতায় এসেছিলেন আমেরিকার মদতেই। সেখানে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ছিল ব্রিটেনের তাঁবেদার সরকার। সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে মার্কিনিরা সেই সরকারকে হটিয়ে দেয়। তারপর আবির্ভূত হন সাদ্দাম হোসেন। স্পষ্টতই তখন আমেরিকার মদত তার পেছনে ছিল। ফলে ১৯৮০-তে ইরান আক্রমণের সময়ে মার্কিন সাহায্য নেওয়া সাদ্দামের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। প্রধানত তিনটি উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি ইরান আক্রমণ করেছিলেন। এক. তিনি নিজে ছিলেন সুন্নিদের নেতা, কিন্তু অধিকাংশ আরবীয় ইরাকি ছিল শিয়া। সুতরাং ইরানের সফল শিয়া বিদ্রোহ ইরাকি শিয়াদের বিদ্রোহী করে তুলতে পারে, এই ভয় তাঁর ছিল। কাজেই আয়াতুল্লা খোমেইনিকে তিনি ক্ষমতা থেকে সরাতে চেয়েছিলেন। দুই, উপসাগরীয় খাঁড়িপথে ইরাকের সহজ প্রবেশের স্বার্থে টাইগ্রিস- ইউফ্রেটিসের সংযোগ-এ অবস্থিত শাত-এল-আরবের দখল নিতে চেয়েছিলেন সাদ্দাম হোসেন। তিন, আরব জগতের একচ্ছত্র নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে তেলের ওপর নিজের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন তিনি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রকাশ্যে নিরপেক্ষতার কথা বললেও তারা এবং আরও কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ বিবদমান পক্ষদুটিকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র যুগিয়েছিল। আমেরিকা তো ইরান ও ইরাক দুটি দেশকেই অস্ত্র দিয়েছিল একই সাথে। রাসায়নিক ও জৈবিক অস্ত্রের ব্যাপক প্রয়োগ এই ইরান-ইরাক যুদ্ধেই প্রথম দেখা যায়। ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে কুনদের (সাদ্দাম-বিরোধী অনারব মুসলিম গোষ্ঠী শহর হালজার ওপর ইরাক রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করে। পাঁচ সেনার মৃত্যু হয়। এই রাসায়নিক অস্ত্র গোটা বিশ্বেই নিন্দিত হয় "Poor Man's Atomic Bomb" নামে।

১৯৮৭ সালেই রাষ্ট্রসংঘ ইরান-ইরাক যুদ্ধের বিরতির প্রস্তাব নিয়েছিল। সাদ্দাম হোসেন ১৯৮৮ সালে সেই প্রস্তাব মেনে নেওয়ার কথা বলেন, কিন্তু তেহরান তাতে সাড়া দেয়নি। আয়াতুল্লা খোমেইনি দাবি করেছিলেন, সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে হবে এবং যুদ্ধের ক্ষতিপুরণ হিসেবে ইরানকে দিতে হবে ১৫০ বিলিয়ন ডলার। এই দাবি মেনে নেওয়া ইরাকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু তেলের বাণিজ্যের ঘাটতি এবং যুদ্ধের ক্ষতি ইরানকেও বিপর্যস্ত করেছিল। ১৯৮৮ সালের ১৮ জুলাই আয়াতুল্লা অকস্মাৎ যুদ্ধবিরতির প্রস্তবে রাজি হয়ে যান, থেমে যায় আট বছরের ইরান-ইরাক যুদ্ধ। কোনও পক্ষেরই জয়-পরাজয় এই যুদ্ধে নির্ধারিত হয়নি। তবে ইরাক সামরিক শক্তি বহুগুণ বাড়িয়ে নিয়েছিল, কেননা যুদ্ধের সময় আমেরিকার কাছ থেকে সে প্রচুর অস্ত্রসাহায্য পেয়েছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের কাছ থেকে যে আনুগত্য আশা করেছিল, তা দিতে আর প্রস্তুত ছিল না ইরাক। বরং হাওয়া বুঝে তেল কুটনীতিতে মার্কিন বিরোধিতার পথই নিয়েছিলেন সাদ্দাম হোসেন। তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। রেগান-পরবর্তী মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের সঙ্গে সাদ্দাম হোসেনের বিরোধিতা এবং ১৯৯০ সালে ইরাকের কুয়েত আক্রমণের মধ্যে।

কুয়েতের যুদ্ধ- ১৯৯০

১৯৯০ সালের ২ আগস্ট ইরাক কুয়েত আক্রমণ করেছিল। কুয়েত আক্রমণ সম্পর্কে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের কয়েকটি যুক্তি ছিল। প্রথমত, ইতিহাসের দিক থেকে কুয়েত ইরাকেরই অংশ, অথচ স্বাধীনতার নামে কুয়েত-এর আমির সেখানে মার্কিন আধিপত্য ডেকে এনেছিলেন। দ্বিতীয়ত, মার্কিন নির্দেশে কুয়েত কম দামে তেল দিয়ে তেলের বাজারের ক্ষতি করছিল। তৃতীয়ত, কুয়েত ইরাকের তেল চুরি করছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী তুর্কি সাম্রাজ্যের এক একটি টুকরো অংশকে এক এক ঔপনিবেশিক শক্তির দায়িত্বে রাখা হয়েছিল। একে বলা হত ম্যান্ডেট প্রথা। লেবানন-সিরিয়ার ম্যান্ডেট পেয়েছিল ফ্রান্স, ব্রিটিশরা পেয়েছিল প্যালেস্তাইন-ইরাল, আমেরিকা পেয়েছিল আফ্রিকার জাইরে, এখন যার নাম নামিবিয়া। কুয়েত ইরাকেরই জেলা বসরার একটি অঞ্চল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ম্যান্ডেট প্রথা শেষ হয়ে যায়। স্বাধীনতা পায় আরবের অনেক দেশ, যেমন ইরাক, প্যালেস্টাইন, লেবান সিরিয়া, জর্ডন, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, ইয়েমেন, কাতার, ওমান ইত্যাদি। দেশগুলোর অধিকাংশের ভৌগোলিক সীমানা কোনও জাতি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে হয়নি, হয়েছিল পশ্চিমী রাষ্ট্রের, বিশেষ করে তেল কোম্পানিগুলোর কর্তৃত্ব বজায় রাখার কথা ভেবে। এই সময়েও কুয়েত ইরাকেরই অংশ ছিল। ১৯৬১ সালে মার্কিন-ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে এক আফ্রিকান আমিরকে গদিতে বসিয়ে কুয়েতকে ইরাক থেকে আলাদা করে দেয়। তারা ভেবেছিল, উপসাগরের তেল সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলোকে ছোটো ছোটো রাষ্ট্রে ভাগ করে দিতে পারলে তেলের ওপর নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশি কার্যকর করতে পারা যাবে। সেজন্যই বাহরিন, কাতার, ওমান, কুয়েত প্রভৃতি খুদে রাষ্ট্রের জন্ম।

কুয়েত সীমান্ত নিয়ে ইরাক ও সৌদি আরবের মধ্যে বিবাদ দীর্ঘ দিনের। মানচিত্রে সৌদি-কুয়েতের মাঝে একটা নিরপেক্ষ অঞ্চল আছে, সৌদিদের দাবি, ওটা তাদের। কুয়েত ও ইরাকের মধ্যে ছোটো দ্বীপ মতো যে জায়গাটা আছে, তার মালিকানা যৌথ। অনেক দিন ধরেই OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries, 1960)-এর ঠিক করা দামের চাইতে কম দামে, প্রতি ব্যারেল ১৩ ডলারে, তেল বিক্রি করেছিল কুয়েত। আমেরিকা সেই তেল কিনে বাজার বিক্রি করছিল চড়া দামে, প্রতি ব্যারেল ২৮ ডলারে। এর ফলে ক্ষতি হচ্ছিল ইরাক ও অন্যান্য আরব দেশের। তাছাড়া ইরাক-কুয়েত সীমান্তের কাছে, ইরকের রামায়েলা তেল খনির তেল মার্কিনি প্রযুক্তির সাহায্যে টেনে নিচ্ছিল কুয়েত। সুতরাং যে অভিযোগ নিয়ে ইরাক কুয়েত আক্রমণ করেছিল, তা একেবারে অযৌক্তিক ছিল না।

মার্কিনিরা ভয় পেয়েছিল যে, যদি সৌদি আরব ইরাকের অনুগত হয়ে পড়ে, এবং যদি কুয়েত ইরাকের নিয়ন্ত্রণে থাকে, তাহলে পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি তেল ইরাকের নিয়ন্ত্রণে থাকার সম্ভাবনা। এরকম একটা পরিস্থিতি আমেরিকা কিছুতেই চায়নি, কেননা তার নিজের তেল তখন প্রায় নিঃশেষিত।

ইরাক কুয়েত আক্রমণ করার পরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক অবরোধের কথা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু সেইসঙ্গে প্রেসিডেন্ট বুশ এও বলেছিলেন যে, ইরাকের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অবরোধ যথেষ্ট নয়। ১৯৯০ সালের ২৯ নভেম্বর রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত পরিষদ ১২-২ ভোটে সিদ্ধান্ত নেয় যে, ১৯৯১ সালের ১৫ জানুয়ারির মধ্যে র কুয়েত না ছাড়লে সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ইরাক কথা শোনেনি, মার্কিনি নেতৃত্বে ২৮টি ইউরোপীয় রাষ্ট্রের বাহিনী কাপিয়ে পড়েছিল ইরাকের ওপর। দিনের যুদ্ধের পর কুয়েত থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ইরাক।

এই অসম 'Resource War থেকে দুটো জিনিস পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রথমত, রাষ্ট্রসংঘের নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব। কুয়েত আক্রমণ করে সাদ্দাম হোসেন নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক আইন লঙঘন করেছিলেন। কিন্তু ইসরায়েলও যে ২৩ বছর ধরে জর্ডনের পশ্চিম তীর আর গাজা জবরদখল করে রেখেছিল সে সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘ আশ্চর্য- জনকভাবে নীরব। মার্কিনিরা অন্তত তিনবার পানামা, গ্রেনাডা আর নিকারাগুয়ার আন্তর্জাতিক বিধি ভেঙেছিল। সে ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘ ছিল সম্পূর্ণ চুপ। দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট গর্বাচভ যে 'নতুন চিন্তার' তত্ত্ব হাজির করেছিলেন, তা যে কতটা অন্তঃসারশূন্য, এই যুদ্ধ চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখিয়ে দিয়েছিল।

রাষ্ট্রসংঘের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব ইরাকের ওপর কয়েকটি শর্ত চাপিয়েছিল। এক, ইরাক তার পরমাণু ও অন্যান্য মারণাস্ত্রের মজুত নষ্ট করে দেবে। দুই, খাঁড়ি যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দেবে এবং কুয়েতের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেবে। তিন, উত্তর ইরাকে কুর্দ অধ্যুষিত এলাকাকে 'উড়ান-ছাড় অঞ্চল' (No Fly Zone) বলে মেনে নেবে। তিনবছর আগে ইরাকের ওপর চাপানো আর্থিক অবরোধ এই শর্তগুলো পুরোপুরি না মানা পর্যন্ত চলবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৪ সালের নভেম্বর মাসে ইরাক কুয়েতকে স্বীকৃতি দেওয়ায় ১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাসে অবরোধ অংশত তুলে নেওয়া হয়, তা প্রায় সম্পূর্ণই শিথিল করা হয় ১৯৯৭ সালের গোড়ায়।

কিন্তু আমেরিকার সঙ্গে ইরাকের বিরোধ ছিল অন্তহীন। উত্তর ইরাকের কুর্দিস্তান উড়ান-ছাড় অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃত ছিল। ১৯৯৬ সালে সাদ্দাম হোসেন এখানে দেন পাঠিয়ে মার্কিন-ক্রোধ ডেকে আনেন। কুর্দিস্তনের ক্ষমতার জন্য দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী কুর্দ গোষ্ঠী ছিল। একটি মাসুদ বরজানি-র ‘কুর্দিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি' (KDM), আর অন্যটি জালাল তালবানি-র 'প্যাট্রিয়াটিক ইউনিয়ন অব্ কুর্দিস্তান' (PUK)। তামাক ও গ্যাসোলিন বিক্রির অধিকার নিয়ে এই দুটি দলের বিরোধ চরমে উঠেছিল। বরজানি সাদ্দাম হোসেনের সাহায্য চেয়েছিলেন, তালবানি চেয়েছিলেন ইরানের। সাদ্দাম হোসেন কুর্দিস্তানে ইরাকি সেনা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে মার্কিন বাড়িয়ে দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন।

দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধ— ২০০৩

২০০৩ সালে আমেরিকা যখন ইরাক আক্রমণ করে, তখন তেল কূটনীতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ (পূর্বতন জর্জ বুশ-এর পুত্র) ইরাক আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার মধ্যে।

আমেরিকার তেলের সমস্যার সমাধান ইরাকের অনমনীয়তার জন্য এবং সেইসূত্রে OPEC-এর অসহযোগিতার জন্য সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে বিশ্বের বাজারে তেলের দাম ২০০২ সালের শেষে বেড়েছিল ব্যারেল প্রতি ৩০ ডলার। আমেরিকায় প্রয়োজনীয় তেলের পঞ্চাশ শতাংশ আসত। মধ্যপ্রাচ্য থেকে তার চাহিদার মাত্র পঁচিশ শতাংশ আসত। মধ্যপ্রাচ্য ছাড়া মেক্সিকো, নাইজিরিয়া, ভেনেজুয়েলা থেকেও তেল আমদানি করা হত। কিন্তু আমেরিকার চোখ ছিল ইরাকের ওপর। কেননা, ইরাকে তেলের উৎপাদন খরচ ছিল অনেক কম। তছাড়া ইরাকের প্রতিরোধ চূর্ণ হয়ে গেলে গোটা বিশ্বের তেলের জগৎই মার্কিন নিয়ন্ত্রণে আসবে, এমন সম্ভাবনা ছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ, ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি, প্রতিরক্ষা সচিব ডোনাল্ড রামসফেল্ড-এরা সকলেই তেলের জগতের অংশীদার ছিলেন। সুতরাং বিশ্ব তেলের মজুত মার্কিন এক্তিয়ারের মধ্যে নিয়ে আসার স্পৃহা তাদের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক ছিল না। যে বাজার আগে ফ্রান্সের ফ্রাঁ, জার্মানির মার্ক, ইতালির লিরা এবং নেদারল্যান্ডসের গিল্ডারের অধীনে বিভক্ত হয়ে ছিল, তা এক হয়ে গিয়েছিল, ইউরো চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল ডলারকে। ইরাকের 'অপরাধ' ছিল এই যে, ব্রিটেন ও রাশিয়া ছাড়া ইউরোপের অনেকগুলো দেশে সে তেল দিয়ে চেয়েছিল ইউরো-র বিনিময়ে।

ইরাক আক্রমণের অজুহাত হিসেবে বুশ দেখাতে চেয়েছিলেন ইরাকে পারমাণবিক ৩ রাসায়নিক মারণাস্ত্রের মজুতকে। কিন্তু হান্স ব্রিক্স-এর নেতৃত্বে রাষ্ট্রসংঘের দল ইরাকে তেমন কোনও অস্ত্র খুঁজে পায়নি। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী কায়দা'-র সঙ্গে সাদ্দাম প্রশাসনের যোগাযোগ ছিল মার্কিন সরকারের আর একটি ছুতো। কিন্তু এই অভিযোগেরও কোনও প্রমাণ দেখাতে পারেনি আমেরিক মিত্রদেশগুলো তাই আমেরিকাকে প্রত্যক্ষ ইরাক আক্রমণ সম্পর্কে ধারে চলার ব্যাপারে চাপ দিয়েছিল। ইরাকে যুদ্ধ এড়ানোর জন্য ফ্রান্স ও জার্মানি একটি যৌথ পরিকল্পনা তৈরি করেছিল। ইরাকে যুদ্ধের ব্যাপারে আপত্তি ছিল রাশিয়ারও। জার্মান চ্যান্সেলর গেরহার্ড শ্রোয়েডারের সঙ্গে বৈঠকের পর রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জানিয়েছিলেন, তাঁরা দুজনেই বিশ্বাস করেন যে, শান্তির পথেই ইরাকের নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব। কিন্তু শান্তির পথে আস্থা ছিল না আমেরিকার। তার মনে হয়েছিল ইরাকে যুদ্ধ অনিবার্য। একমাত্র ব্রিটেন প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিল আমেরিকার সঙ্গে। ২০০৩ সালের ২০ মার্চ আমেরিকা ইরাকের ওপর হামলা শুরু করেছিল, নাম দিয়েছিল 'অপারেশন শক অ্যান্ড অ' কিংবা 'অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম'। মার্কিন সেনা বাগদাদে ঢুকেছিল ৯ এপ্রিল।

যুদ্ধের পরিণতি সকলেরই জানা। ইরাকের প্রত্নতাত্ত্বিক ও আর্থিক সম্পদের লুঠ, অগণিত মানুষের মৃত্যু, সাদ্দাম হোসেনের বন্দিদশা ও বিচারের প্রহসনের পর তাঁর ফাঁসি, ইরাকি মার্কিন-বিরোধী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত — ইতিহাসের এই অধ্যায় এখনও শেষ হয়নি। তবে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকের পুনর্গঠনের নামে পেন্টাগনের তৈরি কর "অফিস অব্ রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাসিস্টান্স'-এর ব্যর্থতা এই প্রস উল্লেখ্য। আর উল্লেখ করতে হয় এই ঘটনা যে, যে বে-আইনি অস্ত্র মজুদের অজুহাতে ইরাক আক্রমণ করা হয়েছিল, সেই অস্ত্র ইরাকে পাওয়া যায়নি, 'আল-কায়দার ইরাকের যোগযোগের অভিযোগটিও উড়িয়ে দিয়েছে মার্কিন সেনেট কমিটি অন্য সেসব নিয়ে রাষ্ট্রসংঘ বিস্ময়করভাবে নির্লিপ্ত। সবচাইতে ভয়ের কথা, যে জাতিরাষ্ট্রের

সার্বভৌমত্ব আন্তর্জাতিক সম্পর্কে 'বিষয়', সেই জাতিরাষ্ট্রের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়েছে। 'বৃহৎ বিষয়ী'র আন্তর্জাতিক লাইন ও আন্তর্জতিক কূটনীতির লঙ্ঘনের ফলে।

পালাবদলের দশক ২০১১- ২০২০

সাদ্দাম হোসেনের মৃত্যুর পর ইরাক ইরান শিয়া সম্প্রদায়ের স্বার্থে, লক্ষ্য ছিল ইরাককে সুন্নি কট্টরপন্থীদের জেহাদি খেলাফত থেকে মুক্ত করা। এই কাজে ইরাক-ইরান যৌথ বাহিনীর একদিকে ছিল ইরাকি বাহিনীর শিয়া সেনা, আর অন্যদিকে ইরানের শিয়া মিলিশিয়া, শীর্ষ নেতৃত্বে ইরানের মার্কিন বিরোধী বিপ্লবী কমান্ডার কাসেম সোলেমানি, পরে যিনি মার্কিন ড্রোন হানায় মারা গিয়েছিলেন। এই ইরানকে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এঁটে উঠতে পারেনি। মার্কিন- ইরান চুক্তি ততদিনে অর্থহীন হয়ে গেছে, রাশিয়াকে তেলের লোভ দেখিয়ে ইরান তখন পক্ষে টানার কাজে অনেকটাই সফল, চাবাহার বন্দর ব্যবহারের স্বার্থে ভারতও ইরানকে শত্রুতে পরিণত করতে রাজি নয়, এই অবস্থায় পশ্চিম এশিয়ার শক্তি ভারসাম্যের রাজনীতিতে ইরানের এই নতুন গুরুত্ব স্বীকার করা ছাড়া মার্কিনিদের হাতে অন্য কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু এতে আতঙ্ক বেড়েছিল সৌদি আরব আর ইসরায়েলের। আই.এস.এ.-র রাষ্ট্রবাদী জেহাদি মুসলিমদের মদতদাতা সৌদি আরব আসলে ছিল ইসলামের গোঁড়া এবং মৌলবাদী প্রকরণে অভ্যস্ত। উদার পারসিক সভ্যতার ইরানীয় উত্তরাধিকারকে তারা সন্দেহের চোখে দেখত। তাই সৌদি আরবের অসন্তোষের কারণ ছিল পশ্চিম এশিয়ায় ইরানের মতাদর্শগত কর্তৃত্ব স্থাপনের সম্ভাবনা। অন্যদিকে ইসরায়েল জানত যে, ইরান যদি পশ্চিমী অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার ঘোরাটোপে থেকে একবার বেরিয়ে আসতে পারে, তাহলে শুধু তেল রপ্তানি করে প্রতি মাসে সে যে একশো ষাট কোটি ডলার আয় করবে, তাতে পশ্চিম এশিয়ায় শক্তির ভারসাম্য ও সমীকরণ অনেকটাই পাল্টে যাবে। তাই ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বারবার সিরিয়া, লেবানন, ইরাক এবং ইয়েমেনে ইরানের শিয়া প্রভাব বলয়ের বিস্তারের বিপদ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, ইরান বা শিয়া ইসলাম নয়, ইসরায়েল তার কূটনৈতিক অস্বস্তি ডেকে এনেছিল প্যালেস্তিনীয়দের স্বদেশ জবরদস্তি দখল করে রেখে।

৩১২.৩.৯.২ জল কূটনীতি

তেলের মতোই জলও যে কূটনীতির বিষয় হিসেবে কিছু কম ছিল না তার প্রমাণ ভারত মহাসাগর (Indian Ocean)। সম্পদ উৎপাদন ও ব্যবহারের সঙ্গে তেলের যোগ, উৎপাদন ব্যবস্থা, সম্পদের বাণিজ্য ও সেই বাণিজ্যের নিরাপত্তার সঙ্গে যোগ জলের, অর্থাৎ সমুদ্রের। সমুদ্রের কূটনীতি এমন একটা বিষয়, যা যে কোনও রাষ্ট্রের সীমান্তক আধিপত্য অনেক গুণ বাড়িয়ে দিতে পারে, অথবা সীমান্তের ভেতরের রাজনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে তুলতে পারে। সেই কারণে

সমুদ্রের ব্যবহার সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলো কীভবে করবে, সে সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক বিধির প্রয়োজন হয়েছিল সকলেরই, বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর।

রাষ্ট্রসংঘ ১৯৪৭ সালে যে International Law Commission গড়ে তুলেছিল, সেই কমিশন একটি সর্বমান্য বিধির প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে ১৯৫৮ সালে জেনেভায় একটি সভা বসিয়েছিল। এটা ছিল 'United Nations Conference on Law of the Sea'-এর প্রথম সম্মেলন (UNCLOS - I)। এর প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল চারটি : (১) ভূখণ্ডসীমার অধিকারভুক্ত এবং তার সংলগ্ন সামুদ্রিক অঞ্চল (Territorial Sea and Contiguous Zone); (২) উপমহাদেশীয় খাড়ি এলাকা (Continental Shelf); (৩) রাষ্ট্রনিরপেক্ষ সমুদ্র (High Seas) এবং (৪) সামুদ্রিক প্রাণী সংরক্ষণ ও মাছ শিকার (Fishing and Conservation of living resources)। কিন্তু এই সভায় এবং তার পরের সম্মেলনেও (UNCLOS-II) কোনও সর্বমান্য বিধি প্রণয়ন সম্ভব হয়নি। তা শেষপর্যন্ত সম্ভব হয় ১৯৭৬ সালে, অনেক তর্ক-বিতর্কের স্তর পার হওয়ার পর। এইসব আলোচনার পর্বে ছিল ১৯৭৩ সালের নিউইয়র্কের তৃতীয় বৈঠক (UNCLOS III). ১৯৭৪ সালের কারাকাস সম্মেলন, ১৯৭৫ সলের জেনেভা বৈঠক এবং তার একক সমঝোতাপত্র (Single Negotiating Text SNT), আর ১৯৭৬ সালের নিউইয়র্ক বৈঠক এবং তার সংশোধিত সনদ (Revised Single Negotiating Text -RSNT)। প্রস্তাবিত সনদটি বিধি হিসেবে স্বাক্ষরিত হয় ১৯৮২ সালে জামাইকায়। ৪৪৬টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত এই সনদটিতে সম্মতি দিয়েছিল ১১৯টি রাষ্ট্র, তার মধ্যে ব্রিটেন ও আমেরিকাও ছিল। তবে ছ'টি ইউরোপের দেশ আর জাপান এতে রাজি হয়নি। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে সামুদ্রিক সম্পদের যে সর্বজনীন ব্যবহারের কথা বলা হয়েছিল (Common Heritage Principle), সে বাপারে একমত ছিল না তারা।১৯৭৬ সালের আন্তর্জাতিক সনদটির আটটি নির্দেশ ছিল লক্ষ্য করবার মতো। এর ভূখণ্ডসীমার অধিকার (Territorial Waters)। উপকূলীয় রাষ্ট্রের স্থলভূমি থেকে বা দ্বীপময় রাষ্ট্রের বেষ্টনী জলপ্রাপ্ত থেকে বারো নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত অঞ্চল সেই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের মধ্যে পড়বে, এটাই ছিল সনদের প্রথম শর্ত। দুই, নিরপেক্ষ পারাপার (Transit Passage/Innocent Passage) শর্তে বলা হয়েছিল যে, "Territorial Waters'-এর পর আরও ১২ মাইল পর্যন্ত এলাকা দিয়ে যে কোনও দেশ অন্য দেশের ক্ষতি না করে বাণিজ্য বা বিমাহবাহী পোত পার করতে পারবে। তিন, একনিষ্ঠ অর্থমণ্ডল। (Exclusive Economic Zone-EEZ)। UNCLOS III-এর ৫৬ ও ৫৭ নম্বর বিদি থেকে এই শর্তটি নির্মাণ করা হয়েছিল। কোনও রাষ্ট্রের ভিত্তিভূমি (baseline) থেকে দুশো নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সমুদ্রে জৈবিক-অজৈবিক সম্পদের অনুসন্ধান ও ব্যবহারের অধিকার সেই রাষ্ট্রের—এটাই ছিল এই শর্তের মূল কথা। চার, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত সমুদ্র (High Seas)। মেনে নেওয়া হয়েছিল যে, প্রথম ও তৃতীয় শর্তে নির্দেশিত নয়, এমন সামুদ্রিক অঞ্চল সর্বজনীন। তবে যেসব রাষ্ট্র সমুদ্রবর্তী নয়, তারাও যাতে সমুদ্রের সুবিধা পায়, সেইজন্যে রাখা হয়েছিল পঞ্চম ও ষষ্ঠ শর্ত। শর্তদুটি বিধিবদ্ধ হয়েছিল 'Land Locked States' সংক্রান্ত ৬১ অনুচ্ছেদে এবং Geographically Disadvantaged State' সংক্রান্ত ৭০ নম্বর অনুচ্ছেদে। এছাড়াও ছিল সামুদ্রিক গবেষণা ও পরিবেশ রক্ষা বিষয়ে সপ্তম ও অষ্টম শর্তদুটি।

ভারত এই আন্তর্জাতিক সমুদ্রবিধিটিকে সন্তোষজনক মনে করেছিল। প্রায় ছ'শো কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূল জুড়ে পাওয়া সামুদ্রিক অধিকারকে রাষ্ট্রীয় মান্যতা দেওয়ার জন্য সে তার সংবিধানে জুড়ে নিয়েছিল ২৯৭ নম্বর অনুচ্ছেদ। কিন্তু একথা মনে করার কোনও কারণ নেই যে, সামুদ্রিক ব্যবহার বিধি চালু হওয়াতে জলের অধিকার নিয়ে কূটনীতির খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বন্ধ যে হয়নি, তার প্রমাণ ভারত মহাসাগর নিয়ে ক্ষমতা আর স্বার্থের রাজনীতি। এক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকা সম্ভব হয়নি, কেননা, ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড ভারত মহাসাগরের জলেই সিক্ত।

ভারত মহাসাগর (Indian Ocean)

১৯৫০-এর দশক পর্যন্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারত মহাসাগর তেমন নজর-কাড়া বিষয় ছিল না। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রথম দশ বছরে আমেরিকাও তাকে নিয়ে মাথা ঘামায়নি, সেটা তখনও পর্যন্ত 'British Lake' হিসেবেই পরিচিত ছিল। ১৯৬৮ সালে প্রচণ্ড বাণিজ্যিক ঘাটতির কবলে পড়ে ব্রিটেন যখন হংকং ছাড়া সুয়েজের পূর্বাংশ থেকে সরে আসার কথা বলতে থাকে, তখন দুনিয়ার নজর গিয়ে পড়ে ভারত মহাসাগরের ওপর। আমেরিকার ধারণা হয়, ব্রিটিশ সিদ্ধান্ত ভারত মহাসাগরে ক্ষমতার শূন্যতা তৈরি করবে। সেই কারণে আমেরিকা ব্রিটেনের সঙ্গে একটা চুক্তি করে নেয়। সেই চুক্তিতে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত ভারত মহাসাগর এলাকার ওপর (British Indian Ocean Territory BLO.T.) ব্রিটিশ-মার্কিন যৌথ খবরদারির কথা বলা হয়। বিখ্যাত দিয়েগো গার্সিয়া দ্বীপটি ছিল এই অঞ্চলের মধ্যেই। ১৯৭০ সালে নার্কিন কংগ্রেস দিয়েগো গার্সিয়ায় সামরিক ঘাঁটি তৈরির জন্য ৫.৪ মিলিয়ন ডলার মঞ্জুর করে কাজ শুরু হয় ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে। ভারতীয় উপকূল থেকে দুহাজার কিলোমিটার দূরের এই দ্বীপে মার্কিন ঘাঁটি হওয়ার ফলে আরবীয় উপকূল থেকে অস্ট্রেলীয় উপকূল পর্যন্ত ভারত মহাসাগরে আমেরিকার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ছিল। অন্যদিকে এডেন বন্দর হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপকূলে নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল সোভিয়েত রাশিয়া। ফলে লঙ্ঘিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক সমুদ্রবিধি। ভারত মহাসাগর এইভাবে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ক্ষেত্রে পরিণত হওয়ায় উদ্বেগ বেড়েছিল ভারতের। সোভিয়েত রাশিয়া অবশ্য ভারত মহাসাগর নিয়ে কূটনৈতিক খেলার ব্যাপারটি অস্বীকার করেছিল। কিন্তু সে কথায় আস্থা ছিল না ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই-এর। ১৯৭৭ সালের ১৪ জুলাই লোকসভার সাংসদ বসন্ত মাঠের একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "The Honourable member is wrong in stating that the Soviet Union has no base whatsoever. It has its spheres of influence in the Indian Ocean. That cannot be denied. It is an arms race between two powerful nations". ভারত মহাসাগর নিয়ে দুই বড়ো শক্তির রেষারেষির কারণ ছিল তার সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থান। পারসীয় খাঁড়ি আর লোহিত সাগরকে সঙ্গে নিয়ে ভারত মহাসাগর মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে দূরপ্রাচ্য আর অস্ট্রেলিয়াকে যুক্ত করেছে; আবার সুয়েজ খাল হয়ে তা দূরপ্রাচ্য আর অস্ট্রেলিয়াকে ইউরোপ-আমেরিকার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। তার পর এর বিশাল উপকূল নানা সম্পদে সমৃদ্ধ উল, পাট, টিন, রবার, চা, তামা, সোনা, হিরে, ইউরেনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম আর তেল। তাছাড়া এই সাগরের পাশাপাশি আরব

সাগর, আর বঙ্গোপসাগরের কিছু এলাকা ব্যবহার করে 'পোলারিস' ডুবোজাহাজ আর ডুবোজাহাজ বাহিত ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের আওতায় (Submarine launched Ballistic Missiles SLBMS) সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে। ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্রনীতি পণ্ডিত কারদি দিপেয়দৎ (Kindi Dipayudo) তাই বলেছিলেন, "The Indian Ocean's geographical location, the important sea routes which traverse it...are the main features of its strategic importance". একই কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছেও ভারত মহাসাগরের গুরুত্ব ছিল।

অব-উপনিবেশিত বাগুলোর কাছে ভরের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিজেট আন্দোলন শামিল এইসব দেশ চায়নি যে, ঠাণ্ডা লড়াই ভারত মহাসাগরের জল বেয়ে তৃতীয় বিশ্বা আর তার পরমাণু অস্ত্র তাদের সার্বভৌমত্ব বা নিরাপত্তকে বিপন্ন কর তুলুক। ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সাকা নির্জোট সম্মেলনে এলম্বা ও ভ তাই যৌথভাবে ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকা' (Zone of Peace) ঘোষণা করার পারি তুলেছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি বলেছিলেন, "We would like the Indian Ocean to be an area of peace and co-operation. Military bases of outside powers will create tension and great power rivalry". প্রস্তাব মেনেও নিয়েছিল রাষ্ট্রসংঘ। একই প্রস্তাব আবার নেওয়া হয় ১৯৭২ সালের ১৫ ডিসেম্বর। ১৯৭৯ সালে রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তরে উপকূলীয় চুয়াল্লিশটি দেশের সভায় শান্তির প্রস্তাব দ্রুত কার্যকর করার কথা বলা হয়।

কিন্তু তবুও ভারত মহাসাগরকে ক্ষমতার লড়াই থেকে মুক্ত করা যায়নি। এর কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত, উপকূলের বেশ কয়েকটি দেশ ভারত মহাসাগরে বড়ো শক্তির নিয়ন্ত্রণ থাকাটাকে তাদের নিরাপত্তার স্বার্থেই দরকার বলে মনে করেছে। যেমন পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা মনে করে, ভারতে যথাযথ নিরস্ত্রীকরণ না হলে ভারত মহাসাগকে শান্তির এলাকা বলার কোনও যৌক্তিকতা নেই। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তান বা বাংলাদেশের সামরিক শাসিত রাষ্ট্রগুলো আমেরিকার ওপর অস্ত্রের ব্যাপারে এতটা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে যে, ভারত মহাসাগর থেকে আমেরিকাকে হাত গোটাতে বলার সাহসই তাদের নেই। তৃতীয়ত, ১৯৮০-র দশক পর্যন্ত উপকূলীয় অনেক দেশ নিজেরাই নানা সংঘাতে জড়িয়ে ছিল। যেমন, ১৯৭১ সালে ইথিওপিয়া-সোমালিয়া, ভিয়েতনাম-কাম্পুচিয়া; ১৯৭০ সালে আরব-ইরসায়েল আর দীর্ঘ সময় ধরে ইরাক-ইরান।

সুতরাং কুড়ি শতকের শেষ দশক পর্যন্ত ভারত মহাসাগরকে 'Zone of Peace'-এ পরিণত করার ব্যাপারটি স্বপ্ন হিসেবেই থেকে গিয়েছিল। সোভিয়েত রাষ্ট্রের ভাঙ্গনের ফলে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান ঘটায় মনে হয়েছিল, হয়তো একটা শান্তির পরিবেশ তৈরি হবে। কিন্তু তাতেও বাধ সাথে চিন। মার্কিন জল কূটনীতির বিপরীতে, রাশিয়ার দুর্বলতার প্রেক্ষিতে, দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভুত্বের লক্ষ্যে চিন চেয়েছিল ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে রাস্তায় আধিপত্য কায়েম করতে। এর জন্য তার দরকার ছিল মালবা শ্রীলঙ্কাকে মুঠোয় পুরে নেওয়া। যতদিন মালদ্বীপে চিনপন্থী আবদুল্লা ইয়ামিন

এবং শ্রীলঙ্কায় চিনের বংশবদ রাজাপক্ষে ক্ষমতায় ছিলেন, ততদিন তার পক্ষে এই কাজ কঠিন কিছু ছিল না। কিন্তু সমস্যা বেড়ে যায় মালদ্বীপে ইয়ামিনকে হটিয়ে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ভারতপন্থী রাজনীতিক ইব্রাহিম মোহাম্মদ সালিহ নির্বাচিত হওয়ায় আর শ্রীলঙ্কার রাজাপক্ষের বদলে রণিল বিক্রমাসিদে ক্ষমতা পাওয়ায়। ফলে ভারত মহাসাগরীয় যতটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিনের মধ্যে, ঠিক ততটাই চিন ও ভারতের মধ্যে। এই প্রেক্ষিতেই বুঝতে হবে কেন ভারত চিনের 'ওবর' বা সামুদ্রিক সিল্ক রুট (Maritime Silk Route)-এর প্রস্তাবের জবাবে 'প্রজেক্ট মৌসম'-এর কথা বলেছে এবং আমেরিকা, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে চিনের একক বাণিজ্যপথ নির্মাণ প্রয়াসের বিরুদ্ধে চতুর্দেশীয় অক্ষ বা 'কোয়াড'-এ যোগ দিয়েছে।

প্রসঙ্গ প্রশান্ত মহাসাগর শুধু ভারত মহাসাগর নয়, প্রশান্ত মহাসাগরও জল কূটনীতির আর একটি প্রধান ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে একুশ শতকে। কুড়ি শতকে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল (Asia-Pacific Zone) নামটি যথেষ্ট পরিচিত ছিল। কিন্তু ২০০৭-এর আগস্ট মাসে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে ভারতীয় সংসদে বক্তৃতা করতে এসে ইন্দো-প্যাসিফিক' শব্দটির উল্লেখ করেছিলেন। মুঘল যুবরাজ দারা শিকোহ্-র একটি বই থেকে নামটি ধার করে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের মিলনস্থলের গুরুত্ব বোঝাতেই সম্ভবত এই শব্দবন্ধটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন। কথাটি জল-কূটনৈতিক তাৎপর্য পেয়ে যায় ২০১৭ সালে, যখন এশিয়া সফরে এসে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ভিয়েতনামের দা নাং শহরে দাঁড়িয়ে ইন্দো-প্যাসিফিক এলাকার কূটনীতির ওপর জোর দেন। এর আগে মার্কিন বিদেশমন্ত্রী রেক্স টিলারসনও ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরকে একটি অভিন্ন কৌশলগত কর্মক্ষেত্র আখ্যা দিয়েছিলেন। তারই পুনরাবৃত্তি করে ট্রাম্প সম্ভবত দুটি উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছেন। এক, 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' (ওবর) বা সামুদ্রিক রেশম পথ' নীতির মাধ্যমে এশিয়া মহাদেশ ছাড়িয়ে ইউরোপ ও আফ্রিকার উপকূল পর্যন্ত যে চিনা শক্তি বলয় নির্মাণের আভাস ছিল, তারই প্রতিদ্বন্দ্বী বলয় তৈরি করার কথা বলতে চেয়েছিলেন ট্রাম্প। দুই, ‘এশিয়া-প্যাসিফিক' শব্দবন্ধের বহুপাক্ষিকতাকে সরিয়ে ইন্দো-প্যাসিফিক দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক ভারতকে আগ্রহী করতে চেয়েছিলেন তিনি।কিন্তু ভারতের পক্ষে এই নীতি অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে পারে, কারণ 'কোয়াড'-এভারতের যোগদান বা ইন্দো-প্যাসিফিক' কূটনীতির ভরকেন্দ্র হয়ে ওঠা, কোনওটাই চিনের পক্ষ স্বাভাবিকভাবে মেনে নেওয়া সহজ নয়। ভারতকে তাই সদাসতর্ক থাকতে হয় এটা বোঝার জন্য যে ইন্দো-প্যাসিফিক' কূটনীতি শুধু একটি দিসামুদ্রিক মধ্যে সীমাবদ্ধ, না অন্য কোনও বড়ো পরিকল্পনার অংশ হিসেবেও তার বিকাশ ঘটতে পারে।

৩১২.৩.৯.৩ পরমাণু কূটনীতি

সন্ত্রাসের প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সক্রিয় হয়ে উঠেছিল কয়েকবছর হল। কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূচনার সময় থেকে, পরমাণু শক্তির ভয় দেখিয়ে আমেরিকা নিজেই সন্ত্রস্ত করে রাখতে চেয়েছিল গোটা বিশ্বকে। যতদিন সোভিয়ের ইউনিয়ন টিকে ছিল, পরমাণু শক্তির জোর তারও ছিল। ভারতে একসময়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন কেনেথ গলব্রেথ (John Kenneth Galbraith) দুই বড়ো রাষ্ট্রের অস্ত্র- প্রতিযোগিতা আর তাদের ওপর নির্ভরশীল 'client' রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে গড়ে ওঠা 'Arms Quadrilateral'-এর কথা বলেছিলেন। পরমাণু অস্ত্রের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা চতুর্ভুজ ছিল না, শুধুই ছিল 'Arams Duel'। দুই পারমাণবিক রাষ্ট্রের উতোর-চাপান Strategic Balance of Power তৈরি করেছিল, পারমাণবিক নিবৃত্তির বা Nuclear Deterrance-এর সম্ভাবনাও সৃষ্টি করেছিল। দাঁতাৎ-এর পর্যায়ে আবার দুটো রাষ্ট্রই পরমাণু শক্তির সীমানা বেঁধে দেওয়ায় কূটনীতিতে ব্যস্ত হয়ে পড়িছিল। Nuclear Diplomacy বলতে এই কূটনীতিকেই বোঝায়। এর উদ্দেশ্য ছিল, এক, পরমাণু খাতে ব্যয়ের বোঝা কমানো; দুই আকস্মিক কোনও পরমাণু যুদ্ধের সম্ভাবনা নষ্ট করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য খুবই গুরুত্বময় ছিল, কেননা, পরমাণু শক্তি এমন এক মারণাস্ত্র, যা যুদ্ধে শুধু আক্রান্তকেই ধ্বংস করে না, আক্রমণকারীকেও করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর মার্কিন পরমাণু-নীতির প্রধান লক্ষ্য হয় তিনটি। এক, নিজের পরমাণু শক্তির প্রাবল্য বজায় রেখে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর পরমাণু শক্তিকে সামায়িত করা, যাতে তাদের ওপর অভিভাবকত্ব বা একাধিপত্য আরও নিশ্চিত হয়; দুই, সোভিয়েত রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনও ছোটো রাষ্ট্রের হাতে পরমাণু-প্রযুক্তি গিয়ে থাকলে তা নষ্ট করবার ব্যবস্থা করা; তিন, আল-কায়দার মতো অতিজাতিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের হাতে পরমাণু প্রযুক্তির চলে যাওয়া বন্ধ করা। প্রথম লক্ষ্যটি আমেরিকার সঙ্গে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করেছে। দ্বিতীয় লক্ষ্য মার্কিনিদের মধ্যে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের প্রবণতা তৈরি করে দিয়েছে। আর তৃতীয় লক্ষ্য আমেরিকাকে অহেতুক উগ্রতার দিকে নিয়ে গেছে।

কিউবা সংকটের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু কূটনীতিতে নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছিল। ১৯৬০-৭০-এর দশকে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে অনেকগুলো পরমাণু চুক্তি হয়। ১৯৬৩ সালে সই হয় Partial Nuclear Test Ban Treaty। শর্ত ছিল, বায়ুমণ্ডলে, মহাশূন্যে (Outer space) বা সমুদ্রের ওপর ভাগে পরমাণু বিস্ফোরণ-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে না। এরপর থেকেই শুরু হয় ভূগর্ভে পরমাণু পরীক্ষা। ফ্রান্স ও চিন ছাড়া আরও একশোটি দেশ এই শর্তেই ১৯৬৩ সালের চুক্তিতে শামিল হয়েছিল। চিন তাঁর পরমাণুর শক্তি পরীক্ষা করেছিল ১৯৬৪ সালে। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে আরও পাঁচটি চুক্তি হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন ও আরও ৮৩টি রাষ্ট্রের মধ্যে। এগুলো হল Outer Space: Treaty (১৯৬৭), Nuclear Non-Proliferation Treaty (১৯৮৮), The Seabed Pact (১৯৭১), Biological Warfare Treaty (১৯৭২) এবং Anti- Ballistic Missile Treaty ABN (১৯৭২)।

১৯৭২ সালেই সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান লিওনিদ ব্রেজনেভ এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসনের মধ্যকার Strategic Arms Limitations Talk (SALT) একটি নির্দিষ্ট পরিণতিতে পৌঁছেছিল। দুপক্ষই সম্মত হয়েছিলেন এই প্রস্তাবে যে, অন্যকে কৌশলে আঘাত করতে সক্ষম এমন পরমাণু অস্ত্রের (Strategic Arms) সংখ্যার বাপারে দুই রাষ্ট্র একটা সীমিত সংখ্যা মেনে চলবে। এই ধরনের অস্ত্রের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) এবং Sub- marine Launched Ballistic Missile (SLBM)। এদের নিয়ে করা চুক্তি দুটো পরিচিত হয়েছিল SALT I এবং SALT II নামে। এর ফলে অবশ্য ICBM-এর ক্ষেত্রে কিছু বাড়তি সুবিধে দেওয়া হয়েছিল সোভিয়েতকে, মার্কিন রাষ্ট্র সুবিধে পেয়েছিল বম্বার এবং ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের ক্ষেত্রে।কিন্তু ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপাল্লার টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র আর সোভিয়েত ইউনিয়নের SS-20 নিয়ে উভয়ের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল। ১৯৮১ সালের জেনেভা বৈঠকে দু'পক্ষই চেষ্টা করেছিল অন্যপক্ষের অস্ত্র বেশি কমিয়ে দিতে। শেষপর্যন্ত যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল তাকে বলা হয়েছিল “Walk in the Woods Proposal"। ঠিক হয়েছিল যে, দু'পক্ষই পঁচাত্তরটি করে ঐ ক্ষেপণাস্ত্র রাখতে পারবে।

এই চুক্তিগুলোর অর্থ ছিল এই যে, পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই বড়ো রাষ্ট্র দুটি তাদের বাড়তি পরমাণু শক্তি ক্ষয় করে ফেলবে। 'Mutually Assured Destruction (MAD)'-এর মাধ্যমে এও একরকমের ‘Nuclear Deterrence'। কিন্তু ১৯৮৩ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগানের একটি ঘোষণা উত্তেজনা আবার বাড়িয়ে দেয়। রেগান সোভিয়েত ICBM-এর প্রতিপক্ষ হিসেবে একটি পরমাণু প্রতিরক্ষা বলয়ের (Stratgic Defence Initiative-SDI) কথা বলেন। নিঃসন্দেহে এটা MAD-এর পরিপন্থী ছিল। আন্তর্জাতিক মহলে রেগানের এই ঘোষণা Star War-এর সুচনা বলেই মনে হয়েছিল এবং সঙ্গত কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘোষণা করেছিল যে, তারাও চুপ করে বসে থাকবে না। অর্থাৎ তৈরি হয়েছিল মহাশূন্যের সামরিকায়নের (militarization of space) সম্ভাবনা। রেগানের প্রতিরক্ষা সচিব ক্যাসপার ওয়েনবার্গর (Casper Weinberger) নিজেই বলেছিলেন, “such an act would be one of the most frightening prospects I could imagine".

১৯৮৫ সালে আবার অবস্থার পরিবর্তন হয়। তার কারণ সোভিয়েত পক্ষের পশ্চাদপসরণ। মিখাইল গর্বাচভ সোভিয়েত বিদেশনীতিতেও পেরেস্ত্রৈকা আনার কথা বলে পশ্চিমকে বলেছিলেন "we will rob you of your enemy"। এর ফল ১৯৮২ সালের রেগান-গর্বাচভ বৈঠকে এবং ১৯৯০ সালের রুশ গর্বাচভ বৈঠকে ১৯৮২ সালে শুরু হওয়া Strategic Arms Reduction Talks (START) -এর চুক্তি-সমাপ্তি। মোট দুটি START চুক্তি হয়েছিল, START এবং START II। পরমাণু অস্ত্র কমিয়ে আনার কথা চুক্তিগুলোর মধ্যে ছিল।START সম্পাদনের পর রাশিয়ার ক্ষমতা আরও কমতে থাকে, রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে আমেরিকা যে প্রস্তাবটি বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে (১৯৯৬) সেটা হল Comprehensive (Nuclear Test Ban Treaty (CTBT)- প্রস্তাব।

সি.টি.বি.টি-র মূল দোষ দুটি। প্রথমত, চুক্তিটি শুধুই প্রথাগত পারমাণবিক বিস্ফোরণকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, অ-বিস্ফোরক পরীক্ষা-নিরীক্ষা (Non-Explosive Testing) বন্ধ করেনি, সুতরাং একে CTBT না বলে Explosive Test Ban Treaty বা ETBT বলাই ভালো। দ্বিতীয়ত, পরমাণু হস্তান্তরের সম্ভাবনাও নষ্ট হয়নি এর ফলে। সি.টি.বি.টি. সম্পর্কে ভারতের আপত্তি এইখানেই। প্রথমত, এই চুক্তি অনুন্নত তৃতীয় বিশ্বকে পরমাণু অস্ত্র রাখতে দেবে না, কিন্তু উন্নত বিশ্ব উন্নততর প্রযুক্তির মাধ্যমে অবিস্ফোরক পরীক্ষা চালিয়ে পরমাণু শক্তির বিস্তার ঘটিয়ে প্রথম বিশ্ব তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে শক্তির ফারাকটা রেখে দেবে। দ্বিতীয়ত, পরমাণু হস্তান্তরের সুযোগ থেকে যাওয়ায় পাক-ভারত পরমাণু বিপর্যয় ঘটে যাওয়া এর ফলে অসম্ভব নয়। এই আশঙ্কা আরও বেশি কার ইতিমধ্যেই চিনের কাছ থেকে পাওয়া পঞ্চাশটিরও বেশি M-II ballistic missile আফগানিস্তানের সূত্রে পাওয়া অনেক স্কাড মিসাইল পাকিস্তানের হাতে আছে। ভারত এই নিঃশর্তে সি.টি.বি.টি-তে সই করতে রাজি হয়নি। তার ফলে যে আন্তর্জাতিক মহলে নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে তা নয়।

মার্কিন রাষ্ট্রের পরমাণুভীতি

সি.টি.বি.টি-তে ভারতের সই না করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্বস্তি বেড়েছিল, সঙ্গে নেই। সেই অস্বস্তি সে কাটাতে চেয়েছিল পাকিস্তানকে প্রতিদ্বন্দ্বী পরমাণু রাষ্ট্র হিসেবে দাঁড় কারিয়ে। ১৯৭০ সালের Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)-তে স করবার জন্য তাই সে পাকিস্তানকে বাধ্য করেনি। তবে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতি ইদানীং দেখা গেছে, তাতে মার্কিন পক্ষের উদ্বেগ অনেকটাই আবার কমে এসেছে ১৯৯৮ সালে ভারতের পোখরান বিস্ফোরণের পর যে অর্থনৈতিক বিধিনিষেধ আরো করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তাও ধীরে ধীরে তুলে নেওয়া হয়েছে। ভারত সি.টি.বি.টি.-ডে স্বাক্ষর না দেওয়া সত্ত্বেও ২০০৫ সালের জুলাই মাসে ভারত-মার্কিন অসামরিক পারমাণবি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, ভারতকে পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রসংঘের সহযোগী সদস্যের মর্যাদ দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে এই ব্যাপারে পাকিস্তান সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরক্তি বেড়েছে। কেননা, এ পর্যন্ত পাকিস্তানই একমাত্র জানা দেশ নে পারমাণবিক অস্ত্র ও প্রযুক্তি অন্য দেশে পাচার করেছে। অনুমান করা হয় যে, উত্ত কোরিয়াকে পারমাণবিক প্রযুক্তি দিয়ে তার কাছে থেকে পাকিস্তান ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি নিয়েছে। আর এই প্রযুক্তি সে অর্থের বিনিময়ে দিয়েছে ইরানকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসল পরমাণুভীতি কিন্তু উত্তর কোরিয়া আর ইরান—এই রাষ্ট্র দুটোকে নিয়ে।

উত্তর কোরিয়া

পারমাণবিক অস্ত্র তৈরিতে উত্তর কোরিয়া হাত পাকিয়েছে ১৯৫০-এর দশক থেকে ১৯৫০-৫৩ সালে দুই কোরিয়ার যুদ্ধের সময়ে দক্ষিণ কোরিয়ায় পারমাণবিক অস্ত্র মজুত করেছিল আমেরিকা। ১৯৬৭ সালে প্রায় আট রকমের ১৫০টি ক্ষেপণাস্ত্র ছিল সেখানে। ১৯৮০ সালে অবশ্য এর সংখ্যা কমিয়ে ১৫০ করা হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এইসময়ে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে

সব পারমাণবিক অস্ত্র সরিয়ে ফেলার কথা বলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই মার্কিন পারমাণবিক হুমকির বিরুদ্ধে আত্ম উত্তর কোরিয়া সোভিয়েত রাষ্ট্র, পাকিস্তান ও ইরানের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে পারমাণবিক অস্ত্র বানাতে শুরু করে। ২০০২ সালে মার্কিন বিদেশ দপ্তর সরাসরি উত্তর কোরিয়ায় পারমাণবিক অস্ত্র মজুদের অভিযোগ করে। এর আগেই ১৯৭০-এর দশক থেকে ১৯৯০-এর দশকের মধ্যে চিন ও মিশরের কাছ থেকে উত্তর কোরিয়া ক্ষেপণাস্ত্র কিনেছে, ১৯৯০ সালে নিজেই স্কাড-ডি মিসাইল উৎক্ষেপণ করেছে, আয়ত্ত করে ফেলেছে পাকিস্তানের ঘাউরি-১ ও ইরানের শাহ্হাব-৩ প্রযুক্তি। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগের ভিত্তি ছিল না তা নেয়। কিন্তু উত্তর কোরিয়া সেই কথা কানেই তোলেনি। বরং ২০০৬ সালের ৪ জুলাই টেপোডং-২ কারিগরির প্রায় ১০টি ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ ঘটিয়ে আর ৯ অক্টোবর হওয়াদেরি সামরিক ঘাঁটির কাছে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। বিস্ফোরণের পরই আমেরিকা উত্তর কোরিয়ার উপর আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তার বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করেছে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। ২০০৬-এর বেজিং সম্মেলনের পরেও কিন্তু মাথা নামায়নি উত্তর কোরিয়া, রাজি হয়নি রাষ্ট্রসংঘ বা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের পরমাণু কেন্দ্র পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে।

তবে ২০০৭ সালে কিছুটা নরম হয় উত্তর কোরিয়া। দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে সমঝোতার আশায় দুই পর্যায়ে সে তার পরমাণু কর্মসূচিকে সংযত করার কথা বলে। প্রথম পর্যায়ে ইয়াবায় (Yangbyon)-এর পরমাণু কেন্দ্রটিকে বন্ধ করার আশ্বাস দেয়। কিন্তু বদলে দাবি করে আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বেসামরিক চুক্তির স্বাভাবিক সুবিধা, বছরে এক মিলিয়ন টন তেলের প্রতিশ্রুতি আর কিছু বাণিজ্যিক সুযোগ। শর্ত পূরণসাপেক্ষে আন্তর্জাতিক সংস্থার পরমাণুকেন্দ্র পরিদর্শনের প্রস্তাবেও সায় দিয়েছে উত্তর কোরিয়া। হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে আমেরিকা, বেশ কিছু বাণিজ্যিক বিধিনিষেধ সে তুলেও নিয়েছে। কিন্তু তাতেও আমেরিকা নিরুদ্বিগ্ন হতে পেরেছে তা নয়। কেননা ২০১৯-২০ তেও উত্তর কোরিয়া পরীক্ষামূলক পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে এবং মার্কিন হুমকির কোনো পরোয়া করেনি। মার্কিন উদ্বেগের বড়ো কারণ পূর্ব এশিয়ায় উত্তর কোরিয়ার 'স্ট্র্যাটেজিক' অবস্থান। হিরোশিমা-নাগাসাকির স্মৃতি মাথায় রেখে জাপান- ইতিমধ্যেই পরমাণু অস্ত্র বানিয়ে রেখেছে। চিনও পিছিয়ে নেই। এই অবস্থায় উত্ত কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লায় যদি আলাস্কা থেকে জাপান পর্যন্ত চলে আসে, তাহলে মার্কিনিদের স্বস্তিতে থাকার কথা নয়। উত্তর কোরিয়া পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ শিবিরে যোগ দিতে রাজি হওয়া সত্ত্বেও নয়।

ইরান ইরানের ক্ষেত্রেও মার্কিন নীতিই বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে বলা যায়। লড়াইয়ে ইসরায়েলের পেছনে মার্কিন মদত থেকে সমস্যার সূত্রপাত। 10 থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ডিপ্লিটেড ইউনে যোগান দিয়ে এসেছে, যদিও সব আন্তর্জাতিক চুক্তি, এমনকি আমেরিকার নিে সামারিক আইনেও এটা পুরোপুরি নিষিদ্ধ। ইরান মার্কিনিদের এই দ্বিচারিতা ভা নেয়নি। ১৯৭৮ সালে ইরানের ইসলামীয় বিপ্লবের পর ইরান-মার্কিন সম্পর্কের ঘটেছে। অন্যদিকে

পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিতে সই না করা ইসরায়েলের সঙ্গে চুক্তির সই করা ইরানের সম্পর্ক খুবই খারাপ। ফলে ইসরায়েল যে পারমাণবিক শি কখনও ইরানের ওপর অন্যায় চাপ সৃষ্টি করবে না, এরকম কোনও নিশ্চিততা হরানের নেই। এইসব কারণেই ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমেদিনিজান ক্ষমতায় এসেই পরমাণু কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অশান্তির এটাই কারণ। ২০০৬ সালের ১ জানুয়ারি জার্মান পত্রিকা "ডার স্পাইগো খবর দিয়েছিল যে, ইরানের পরমাণু কেন্দ্রগুলোর ওপর বোমাবর্ষণ করবার সব প্রস্তুতি। পাকা করে ফেলেছে আমেরিকা। সি.আই.এ. প্রধান পোর্টার গস তুরস্কে গিয়ে সেখানকার প্রধানমন্ত্রীকে তুর্কি-মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলোকে তৈরি রাখার অনুরোধও জানিয়ে এসেছিলেন। ইরান সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সভয় তৎপরতাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। এল বারাদেই-এর একটি রিপোর্ট। ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের (IAEC) চেয়ারম্যান এল বারদেই তাঁর রিপোর্টে জানিয়েছিলেন যে, পরমাণু বোমার জন্য যে ইউরেনিয়াম দরকার, তা খনিজ আকর থেকে নিষ্কাশনের প্রযুক্তি ইরানের আয়ত্তে এসে গেছে। যদিও ইরান বরাবর বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে, পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির শর্ত না ভেঙ্গে তা ঠিক না-করা জায়গাগুলোর ফাঁক দিয়ে কেবল শান্তিপূর্ণ পরমাণু কর্মসূচি সে নিয়েছে, আমেরিকা তার সে কথা মোটেই বিশ্বাস করেনি। তাই সে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বিষয়টি তুলে ইরানের বিরুদ্ধে একটি বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছে। ১৬৯৬ সংখ্যক প্রস্তাবে ইরানকে ইউরেনিয়াম শোধনের কাজ বন্ধ রাখার যে কথা বলা হয়েছিল, ইরান তা মানেনি, এই অভিযোগে ১৭০৭ সংখ্যক প্রস্তাবে ইরানের ওপর নানা বিধিনিষেধ চাপানো হয়েছে। ইরান অবশ্য এ ব্যাপারে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে কথা বলতে প্রস্তুত, কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ বা আমেরিকার সঙ্গে কিছুতেই নয়। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি অ্যাসোসিয়েশনের "Time Out Proposal" মেনে পরমাণু কর্মসূচি স্থগিত রাখতে ইরান রাজি, কিন্তু শর্ত হল, তার ওপর চাপানো নিষেধাজ্ঞা স্থগিত রাখতে হবে। একক পরমাণুর প্রশ্নে মার্কিন পক্ষের সঙ্গে শুরু হয়েছে ইরানের দড়ি টানাটানি।

ভারতের পরমাণু নীতি

১৯৬০-র দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ভারতের পরমাণু নীতি ছিল অত্যন্ত সহজ, বিপবহীন, সরলরৈখিক এবং ১৯৫৪ সালের পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধ করার দাবির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু এই সহজ-সরল নীতিটিকে বদলানোর প্রয়োজন দেখা দেয় ১৯৬৪ সালের ২৪ অক্টোবর মহাকাশে চিনের পরমাণু বিস্ফোরণ ও ১৯৬৫ সালের ভারত-পাক যুদ্ধের পর। এইভাবেই জওহরলাল নেহরুর 'নিস্তরঙ্গ পারমাণবিক নীতি' প্রাসঙ্গিকতা হারায়, ১৯৭০ সালে পরমাণু অস্ত্রপ্রচার রোধ (এন.পি.টি.) চুক্তিতে সই করতে অস্বীকার করে ভারত।

১৯৭৪ সালের মে মাসে ভারত পোখরানে একটি পারমাণবিক পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে ঘরে বাইরে তুমুল সমালোচনা হয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির। আন্তর্জাতিক উদ্যোগে ভারতের বিরুদ্ধে কিছু নিষেধাজ্ঞাও জারি হয়। আবার ১৯৮০-র দশকের শেষদিকে ভারত রাশিয়ার কাছ

থেকে প্রায়োজনিক ক্ষেপণাস্ত্র কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আমেরিকা নতুন করে বিধিনিষেধ আরোপ করে। ১৯৯৩ সালে রাশিয়া আমেরিকার চাপের কাছে নতিস্বীকার করে। তাতে ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি অগ্রগতি রুদ্ধ হয়নি,তবে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত অন্য পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্রের তুলনায় ভারতের বিস্ফোরণের হার ছিল নগণ্য।

ভারত তার পরমাণু নিতির তৃতীয় ধাপে পৌছায় ১৯৯৮ সালে। ঐ বছ বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়ে, ১১ ও ১৩ মে, ভারত পরপর পাঁচটি পরমাণু পরীক্ষা করে।এর পাশাপাশি পাকিস্তানের মাউরি পরীক্ষা উপমহাদেশে যথেষ্ট উত্তে কিন্তু এরপরেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করছে। অস্বীকার করে এই অজুহাতে যে ১৯৬৮ সালের আগে সে এই শক্তির পরিচয় দিয়ে পারেনি। সেই মর্যাদার আশ্বাস ভারত মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে পায় ২০০৫ সালে ভারত-মার্কিন অসামরিক পারমাণবিক চুক্তির সময়ে।

এই পারমাণবিক চুক্তির রূপায়ণের জন্য মার্কিন সেনেটের হাত রিপ্রেজেন্টেটিভ্স' অনুমোদন দেয় ২০০৬ সালের ২৬ জুলাই আর চুক্তি সংক্রান্ত বিলটি সেনেট পাশ করে ডিসেম্বরে। ২০০৮ সালের ৬ সেপ্টেম্বর এই চুক্তিটি পরমাণু-জ্বালানি, সরবরাহ-গোষ্ঠী বা এন. এস. জি (Nuclear Supplier Group)-এর ভিয়েনা বৈঠার আন্তর্জাতিক অনুমোদনও পেয়ে যায়। অনুমোদনের উদ্দেশ্য ছিল ১৯৭৪ সাল থেকে তিন দশক ধরে চলে আসা আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া, এন.পি.টি.-র বাইরে। থাকা সত্ত্বেও ভারতকে পরমাণু ক্লাবে ঢোকার ছাড়পত্র দেওয়া আর ভারতকে অসামরিক প্রযুক্তি ও জ্বালানি সরবরাহ করা। অবশ্য তার জন্য সামরিক ও অসামরিক পরমাণু কেন্দ্রকে আলাদা করতে হবে এবং দ্বিতীয়টি আসবে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি অ্যাসোসিয়েশনের' (IAEA) আওতায়। কূটনীতি-বিশেষজ্ঞ ও পরমাণু-বিজ্ঞানীদের এইখানেই আপত্তি, কেননা, এতে পারমাণবিক সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হওয়ার ভয় আছে।

বদলে যাওয়া আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ভারত-মার্কিন অসামরিক পরমাণু চুক্তি একদিকে এশিয়ার নিজস্ব সমীকরণ আর অন্যদিকে ভারতের পরমাণু-জাতীয়তাবাদের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং, বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় ও প্রযুক্তিমন্ত্রী কপিল সিব্বাল বারবার বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে, সি.টি.বি.টি-তে সই না করেও পরমাণু চুক্তিকে হাতিয়ার করে ভারত যে এর আগে চাপানো আর্থিক অবরোধ উঠিয়ে দিতে পেরেছিল, কিংবা এন.এস.জি. (Nuclear Supplier Group)-এর পঁয়তাল্লিশটি দেশের মধ্যে অস্ট্রিয়া বা আরও ছোটোখাটো দু'একটা দেশ ছাড়া অন্য সবদেশের সম্মতি আদায় করে নিয়েছিল, তা ভারতের বিদেশনীতির একটা বড়ো সাফল্য।

৩১২.৩.৯.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১) আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বর্তমান বিশ্ব ঃ অলক কুমার ঘোষ

২) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস- প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

৩১২.৩.৯.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

1) Discuss the Role of USA in the Oil politics of Middle East.

2) What was the cause of second gulf war?

3) What do you know about water diplomacy regarding Indian ocean?

4) What is Nuclear disarmament? What is Indian viewpoint in this matter?

পর্যায় গ্রন্থ - ৫

একক - ২

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন ও তৃতীয় বিশ্ব
Non-Aligned Movement and the Third World

বিন্যাসক্রম ঃ

২.৫.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

২.৫.২.১ ঃ ভূমিকা

২.৫.২.২ ঃ জোটনিরপেক্ষতার অর্থ ও উদ্ভব

২.৫.২.৩ ঃ বিভিন্ন শীর্ষ সম্মেলন

- ২.৫.২.৩.১ ঃ কায়রোর প্রস্তুতি সম্মেলন (১৯৬১)
- ২.৫.২.৩.২ ঃ বেলগ্রেড সম্মেলন (১৯৬১)
- ২.৫.২.৩.৩ ঃ কায়রো সম্মেলন (১৯৬৪)
- ২.৫.২.৩.৪ ঃ লুসাকা সম্মেলন (১৯৭০)
- ২.৫.২.৩.৫ ঃ আলজিয়ার্স সম্মেলন (১৯৭৩)
- ২.৫.২.৩.৬ ঃ কলম্বো সম্মেলন (১৯৭৮)
- ২.৫.২.৩.৭ ঃ হাভানা সম্মেলন (১৯৭৯)
- ২.৫.২.৩.৮ ঃ নতুন দিল্লী সম্মেলন (১৯৮২)
- ২.৫.২.৩.৯ ঃ হারারে সম্মেলন (১৯৮৬)
- ২.৫.২.৩.১০ ঃ বেলগ্রেড সম্মেলন (১৯৮৯)
- ২.৫.২.৩.১১ ঃ জাকার্তা সম্মেলন (১৯৯২)
- ২.৫.২.৩.১২ ঃ কার্টাজেনা সম্মেলন (১৯৯৫)
- ২.৫.২.৩.১৩ ঃ ডারবান সম্মেলন (১৯৯৮)
- ২.৫.২.৩.১৪ ঃ কুয়ালালামপুর সম্মেলন (২০০৩)

২.৫.২.৪ ঃ অবদান

২.৫.২.৫ ঃ দুর্বলতা

২.৫.২.৬ ঃ উপসংহার

২.৫.২.৭ ঃ সহায়ক গ্রন্থ

২.৫.২.৮ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্ন

২.৫.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি পাঠের পর আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) তৃতীয় বিশ্ব বলতে কি বোঝায়।

(২) জোটনিরপেক্ষতা কথাটির অর্থ কি।

(৩) জোটনিরপেক্ষতা ধারণার উদ্ভব কি ভাবে হয়েছিল।

(৪) জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির সাধারণ সমস্যা কি ছিল।

(৫) কারা জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

(৬) তৃতীয় বিশ্বের কোথায় জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

(৭) জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে প্রধানতঃ কোন্ কোন্ সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল এবং বর্তমানে এর প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা।

২.৫.২.১ ঃ ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে ঠান্ডা লড়াই, প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব এবং দুই বৃহৎশক্তির দুটি শিবিরে বিভক্তির ফলে উদ্ভূত বিশ্বপরিস্থিতির ফলশ্রুতি হল জোটনিরপেক্ষ নীতির উদ্ভব। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশ এই নীতি গ্রহণ করেছে। তৃতীয় বিশ্ব বলতে কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল বোঝায় না। সমাজতান্ত্রিক ও পাশ্চাত্য শিবিরের বাইরে অবস্থিত এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ও ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত দেশগুলিকে নিয়ে তৃতীয় বিশ্ব গঠিত। কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে একত্রিত হতে সাহায্য করেছে। সেগুলি হল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও দারিদ্র্য, জনসংখ্যার আধিক্য, জীবনযাত্রার নিম্নমান, কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, সাংস্কৃতিক সংকট, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নিরাপত্তার দুর্বলতা, নয়া উপনিবেশবাদের চাপ ইত্যাদি। তবে অর্থনৈতিক কাঠামো ও উন্নয়নের স্তরের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য আছে। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন একটি রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবে শুরু হলেও পরবর্তীকালে এটি তৃতীয় বিশ্বের একটি সমষ্টিগত অর্থনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক ও পাশ্চাত্য শিবিরের বাইরে অবস্থিত এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ও ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত দেশগুলিকে নিয়ে তৃতীয় বিশ্ব গঠিত।

প্রশ্ন

১। তৃতীয় বিশ্ব কি এবং কাদের নিয়ে গঠিত?

২.৫.২.২ ঃ জোটনিরপেক্ষতার অর্থ ও উদ্ভব

জোটনিরপেক্ষ কথাটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৯৫০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে। অনেকে মনে করেন ভারতের কৃষ্ণ মেনন প্রথম কথাটি ব্যবহার করেন। তবে তার জোটনিরপেক্ষতা নীতির প্রকৃত উদ্ভাবক হলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু।

এই মৌলিক নীতি তাঁরই চিন্তাধারা প্রসূত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার প্রবল ক্ষমতা ও অন্যান্য রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে এশিয়া ও আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ শান্তিকামী মানুষের অবস্থান নির্দিষ্ট করার চিন্তাভাবনা থেকেই নেহরুর মনে জোটনিরপেক্ষতা ধারনার উদ্ভব ঘটে। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর বিখ্যাত বেতার ভাষণের মাধ্যমে এই নীতির আভাস পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন, যতদূর সম্ভব পৃথিবীর দুই শক্তিশিবির থেকে দূরে থাকতে হবে। ১৯৪৮ সালে তিনি আবার বলেছিলেন, অল্প কিছু সুবিধার জন্য বৃহৎ শক্তিগুলির কোনো একটির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার চেয়ে ক্ষতিকারক ভারতের পক্ষে আর কিছুই হতে পারে না।

জোটনিরপেক্ষতা শব্দটি একাধিক অর্থ বহন করে। নেহরু একে একটি গতিশীল ও ইতিবাচক নীতি বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি মনে করতেন, জোটনিরপেক্ষতা বলতে কেবলমাত্র দুই শক্তিশালী জোট থেকে সমদূরত্বে থাকা বা কোনো সুবিধাবাদী অবস্থান নয়। এর অর্থ আত্মনির্ভর ও স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হওয়া। অনেকে মনে করেন, জোটনিরপেক্ষতা হল বৃহৎ শক্তিবর্গের হাত থেকে স্বাধীনতা রক্ষার উপায় ও তৃতীয় বিশ্বের মতামত প্রকাশের নৈতিক অধিকার। জোটনিরপেক্ষতার আদর্শগত ও নীতিগত উভয় দিকই আছে। এটি নিছক কোনো নেতিবাচক নীতি নয়। নেহরু মনে করতেন, জোটনিরপেক্ষতা কেবলমাত্র নিরপেক্ষতার নামান্তর নয়। বস্তুতপক্ষে এর প্রকৃত অর্থ হল জাতীয় আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বাধীনতা রক্ষার কর্মসূচী। জোটনিরপেক্ষতার উদ্দেশ্য কোনো তৃতীয়-শিবির তৈরি করা নয়। এর উদ্দেশ্য হল নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখবে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবে এবং জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করবে।

১৯৫০ এর দশকের গোড়ার দিকের কয়েকটি ঘটনা জোটনিরপেক্ষতা নীতির গঠনে সাহায্য করেছিল। প্রথমতঃ ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবে ভারতকে সামরিক বা অন্য কোনো জোটবদ্ধ রাজনীতি থেকে মুক্ত রাখার নীতি গৃহীত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে ভারত ও চীনের 'পঞ্চশীল' নীতি গ্রহণ। চৌ এন লাই এর ভারত ভ্রমনকে কেন্দ্র করে ভারত ও চীনের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। পঞ্চশীল-এর প্রধান নীতিগুলি হল: শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষা, অন্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, পারস্পরিক আগ্রাসন থেকে বিরত থাকা, সার্বভৌমত্বের প্রতি মর্যাদাবোধ। তৃতীয়তঃ, ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে নেহরু ও যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো দিল্লীতে এক যৌথ বিবৃতিতে জোট-নিরপেক্ষ নীতির প্রতি আস্থা ঘোষনা করেন। চতুর্থতঃ, ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ ১৯৫৫ সালে যে আফ্রো এশিয় সম্মেলন হয়েছিল তা জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে যথেষ্ট শক্তিশালী করেছিল। এই সম্মেলনে জোটনিরপেক্ষা নীতির পরিষ্কার ব্যাখ্যা করা হয়। এই সম্মেলনে ঠিক হয় যে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের উদ্দেশ্য কোনো তৃতীয় শিবির তৈরি করা নয়। এই সম্মেলনে নেহরুর বিখ্যাত পঞ্চশীল নীতি স্বীকৃতি লাভ করে। বান্দুং সম্মেলনের পরই বহুদেশ পঞ্চশীল তথা জোটনিরপেক্ষ নীতিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে থাকে। এই সময় জওহরলাল নেহরু, প্রেসিডেন্ট নাসের ও প্রেসিডেন্ট টিটো-এই তিনজন জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলেন এবং এই আন্দোলনকে এক উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছে দেন। এই তিন নেতা পৃথিবীতে শান্তির সীমানা বৃদ্ধি করার জন্য যেমন সচেষ্ট হন, ঠিক তেমনি স্বাধীনতা আন্দোলন ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির

জোটনিরপেক্ষতা নীতির প্রকৃত উদ্ভাবক হলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। জোট নিরপেক্ষতা বলতে কেবলমাত্র দুই শক্তিশালী জোট থেকে সমদূরত্বে থাকা বা কোনো সুবিধাবাদী অবস্থান নয়। এর উদ্দেশ্য হল নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবে এবং জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করবে।

জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যান। এই তিন নেতার উদ্যোগে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন ক্রমশ: ছড়িয়ে পড়তে থাকে। স্থির হয়, যে সকল দেশ কতকগুলি নীতি অনুসরণ করে চলবে তাদের জোটনিরপেক্ষ দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। নীতিগুলি হল ঃ (ক) যে দেশ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী হবে এবং স্বাধীনভাবে নীতি নির্ধারণ করবে। (খ) যে দেশ জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন জানাবে। (গ) যে দেশ কোন শক্তিশালী সামরিক জোটের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে যোগদান করার কতকগুলি সাধারণ কারণ উল্লেখ করা যায়। যেমন, নিজেদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রচেষ্টা, অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি, অর্থনৈতিক সম্পদ আহরণের চেষ্টা, ব্যবসা ও বানিজ্যকে নয়া উপনিবেশবাদীদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা। এছাড়া এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি আন্তর্জাতিক শান্তি আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য উদগ্রীব ছিল। অবশ্য এইসব সাধারণ কারণগুলি ছাড়াও প্রত্যেকটি দেশের নিজস্ব কতকগুলি কারণ ছিল যার জন্য তারা এই জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। ইন্দোনেশিয়া, চীন, বার্মা, শ্রীলঙ্কা, যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি দেশগুলির জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে যোগদানের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব কতকগুলি কারণ ছিল।

১৯৫৬ সালে ব্রাইয়োনিতে নেহরু, নাসের ও টিটো-এই তিন প্রধান সিদ্ধান্ত নেন যে জোটনিরপেক্ষতাকে দেশভিত্তিক বিদেশনীতির উর্ধ্বে তুলে এক বিশ্বব্যাপী আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৬১ সাল থেকে অনেকগুলি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন

১। জোটনিরপেক্ষ কথাটির প্রকৃত অর্থ কি?

২। কোন কোন ঘটনা জোটনিরপেক্ষতা নীতি গঠনে সাহায্য করেছিল?

২.৫.২.৩ ঃ বিভিন্ন শীর্ষ সম্মেলন

২.৫.২.৩.১ ঃ কায়রোর প্রস্তুতি সম্মেলন (১৯৬১)

১৯৬০ সালে জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে জোটনিরপেক্ষ নীতির অনুগামীদের একটি সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়ে নেহেরু, নাসের, টিটো প্রমুখ নেতারা আলোচনা করেন। ১৯৬১ সালের জুন মাসে ২১টি দেশ কায়রোতে মিলিত হয় এবং ভবিষ্যত সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন।

২.৫.২.৩.২ ঃ বেলগ্রেড সম্মেলন (১৯৬১)

যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির প্রথম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২৫টি দেশ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা ঠাণ্ডা যুদ্ধ ও সামরিক জোটের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। উপনিবেশবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এই সম্মেলন জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি তৈরি করেছিল।

২.৫.২.৩.৩ ঃ কায়রো সম্মেলন (১৯৬৪)

কায়রোতে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৪৭টি দেশ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। এই সম্মেলনে সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবিদ্বেষনীতি ও বিদেশী সামরিক ঘাঁটির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। কায়রোতে নিরাপত্তা, সহাবস্থান, শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের মীমাংসা এবং নিরস্ত্রীকরণের উপর জোর দেওয়া হয়। এই সম্মেলনে তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার কথা বলা হয়।

২.৫.২.৩.৪ ঃ লুসাকা সম্মেলন (১৯৭০)

জাম্বিয়ার রাজধানী লুসাকাতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন এক নতুন পদক্ষেপের সূচনা করেছিল। আমন্ত্রিত ৭০টি দেশের মধ্যে ৫৪টি দেশ অংশগ্রহণ করে। এই সম্মেলনে বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এছাড়া এ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক, জিম্বাবোয়ে, ইন্দোচীন, লেবানন প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনের প্রতিনিধিরা বিশ্বের মঙ্গলের জন্য বিশ্বের অর্থনৈতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের দাবী জানান। দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকে বিশ্বের ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

২.৫.২.৩.৫ ঃ আলজিয়ার্স সম্মেলন (১৯৭৩)

আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত চতুর্থ জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন আন্দোলনকে আরো গতিশীল করে তুলেছিল। এই সম্মেলনে ৭৫টি দেশ যোগদান করেছিল। সম্মেলনের প্রতিনিধিরা ভিয়েতনাম ও কাম্বোডিয়ার মার্কিন হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। একই সঙ্গে ল্যাটিন আমেরিকায় নয়া উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হয়। সম্মেলনে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির সঙ্গে উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

২.৫.২.৩.৬ ঃ কলম্বো সম্মেলন (১৯৭৮)

কলম্বোতে পঞ্চম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ৮৬টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল। সম্মেলনে অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ, উপনিবেশবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের কথা বলা হয়। এছাড়া এই সম্মেলনে রাষ্ট্রসংঘের সনদের সংশোধনের দাবী জানানো হয়।

২.৫.২.৩.৭ ঃ হাভানা সম্মেলন (১৯৭৯)

হাভানার ষষ্ঠ শীর্ষ সম্মেলনে ৯৫টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল। তবে এই সম্মেলনে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সাধারণ নীতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিতর্ক দেখা দেয়। মার্শাল টিটো জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে বিদেশী প্রভাবমুক্ত করার জন্য আহ্বান জানান। সম্মেলনে দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে, নামিবিয়ার অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

২.৫.২.৩.৮ ঃ নতুন দিল্লী সম্মেলন (১৯৮২)

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সপ্তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নতুন দিল্লীতে। সম্মেলনে ৯৯টি দেশের প্রতিনিধি যোগদান করেছিল। এই সম্মেলনে যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল সেগুলি হল শান্তি, নিরাপত্তা, ঔপনিবেশিকতা, নিরস্ত্রীকরণ ও উন্নয়ন। এই সম্মেলনে আনবিক শক্তি সম্পন্ন রাষ্ট্রগুলোর কাছে আনবিক যুদ্ধ প্রতিরোধের দাবী জানানো হয়।

২.৫.২.৩.৯ ঃ হারারে সম্মেলন (১৯৮৬)

জিম্বাবোয়ের রাজধানী হারারেতে অষ্টম জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১০২টি রাষ্ট্র এই সম্মেলনে যোগ দেয়। সম্মেলনে আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী জোট, উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্রমবর্ধমান ঋণের বোঝা, ইরান-ইরাক যুদ্ধ, কাম্পুচিয়া, আফগানিস্তান সংকটের সমাধান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক মহাকাশ যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে শান্তির প্রয়াসকে সংহত করা।

২.৫.২.৩.১০ ঃ বেলগ্রেড সম্মেলন (১৯৮৯)

বেলগ্রেড নবম জোট নিরপেক্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১০২ সদস্য রাষ্ট্র এতে যোগদান করে। এছাড়া ৮টি অতিথি দেশ এতে যোগ দেয়। এই সম্মেলন মানুষের মৌলিক অধিকারগুলিকে আন্দোলনের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়। বিশ্বের অসম অর্থনৈতিক বিকাশের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কাম্পুচিয়া, নামিবিয়া ও প্যালেস্তাইন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই সম্মেলনে পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য অন্তঃরাষ্ট্র সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য আবেদন জানানো হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রসংঘের নেতৃত্বে একটি তহবিল গঠন করার আহ্বান জানান। এই সম্মেলনে মাদক দ্রব্যের ব্যবসা ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

২.৫.২.৩.১১ ঃ জাকার্তা সম্মেলন (১৯৯২)

জাকার্তার দশম সম্মেলনে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে স্তিমিত পরিস্থিতি কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সম্মেলনে সদস্য সংখ্যা ছিল ১০৮। চীনকে পর্যবেক্ষক হিসাবে আমন্ত্রণ জানোনো হয়। মায়ানমারে অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সমালোচনা করা হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য স্বনির্ভরতার কথা বলা হয়। জাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়। তাছাড়া পৃথিবীব্যাপী অশান্তি, আধিপত্য ও জাতিগত সংঘর্ষ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

২.৫.২.৩.১২ ঃ কার্টাজেনা সম্মেলন (১৯৯৫)

একাদশ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কলম্বিয়ার রাজধানী কার্টাজেনাতে। এই সম্মেলনে আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের পর জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে। এই সম্মেলনে পরিবেশ বিপর্যয়, জীব বৈচিত্র্য বিনাশ ও জৈব সন্ত্রাস সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বেনজির ভুট্টো কাশ্মীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। এই সম্মেলনের ঘোষনা পত্রে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়।

২.৫.২.৩.১৩ ঃ ডারবান সম্মেলন (১৯৯৮)

দ্বাদশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান শহরে। ১১৩টি দেশ এতে অংশগ্রহণ করে। এই সম্মেলনে পরমানু নিরস্ত্রীকরণ, নারীদের অধিকার ও মর্যাদারক্ষা, সন্ত্রাসবাদ, উন্নয়শীল দেশগুলির উপর বিশ্বায়নের চাপ, HIV AIDS, আন্তর্জাতিক মাদক চালান প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

২.৫.২.৩.১৪ ঃ কুয়ালালামপুর সম্মেলন (২০০৩)

এয়োদশ শীর্ষসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মালায়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে। ১১৬টি দেশ এতে অংশগ্রহণ করেছিল। এই সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক আক্রমণের হুমকি, আতঙ্কবাদের প্রসার ও বিশ্ববাণিজ্যে বৈষম্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

২.৫.২.৪ ঃ অবদান

জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের একটি বড় কৃতিত্ব হল এই যে, পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্র এই সংগঠনের সদস্য হয়েছে। এই সংস্থার স্বচ্ছতা ও নমনীয়তা লক্ষ্যণীয়। অহেতুক কঠোরতা না থাকার ফলে সদস্য রাষ্ট্রগুলি যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন একটি বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সাম্রাজ্যবাদ তথা উপনিবেশবাদ ও কোন রাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদ উচ্ছেদের ক্ষেত্রে শক্তিশালী দেশগুলির বিরুদ্ধে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলি অনেকাংশে সফল। এক সময়ে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন প্রায় সমার্থক বলে মনে হয়েছে। বর্ণবিদ্বেষবাদ, বৃহৎশক্তি কর্তৃক অনুসৃত প্রভুত্ববাদের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন একটি আন্তর্জাতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। বিশ্বশান্তি রক্ষা এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংঘর্ষ রোধ করার ক্ষেত্রে এই আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই আন্দোলনের দ্রুত প্রসারের ফলে পৃথিবী সম্পূর্ণভাবে দুটি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে বিভক্ত হয়নি। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন তৃতীয় বিশ্বের ঐক্যকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছে। বর্ণবিদ্বেষ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সরব প্রতিবাদের মধ্যে দিয়েই বর্তমানে বহু আলোচিত মানবাধিকার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছে। তাছাড়া জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন এখন তৃতীয় বিশ্বের একটি সমষ্টিগত অর্থনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। এই আন্দোলন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে বিশ্বজনীন রূপ দিয়েছে। এই সংস্থা রাষ্ট্রপুঞ্জে অনেক সময়ই ঐক্যবদ্ধ একক গোষ্ঠী হিসাবে মতামত প্রকাশ করে। এমন কি ঠাণ্ডা লড়াই চলার সময়ে কোরিয়া ও ইন্দোচীন সমস্যার সমাধানে জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিকে দুই শিবিরের মধ্যে মধ্যস্থতার ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছে।

বর্ণবিদ্বেষবাদ, বৃহৎশক্তি কর্তৃক অনুসৃত প্রভুত্ববাদের বিরুদ্ধে এবং বিশ্বশান্তি রক্ষা এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংঘর্ষ রোধ করার ক্ষেত্রে এই আন্দোলন একটি আন্তর্জাতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন ১। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জোটনিরপেক্ষ নীতির অবদান কি ছিল?

২.৫.২.৫ ঃ দুর্বলতা

তবে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের এই সাফল্য বা অগ্রগতি ত্রুটিবিহীন নয়। অনেক উন্নতিশীল দেশ এখনও এই আন্দোলনের বাইরে আছে। তবে নতুন সদস্য গ্রহণ করার আগে আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের খুব ভালভাবে বিচারবিবেচনা করা দরকার। কারণ ইদানীং গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি থেকেও এই আন্দোলনে যোগ দেবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক ও পাশ্চাত্য শিবিরের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকেও জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। আন্দোলনের নেতাদের মধ্যেও ধ্যান ধারণারও পার্থক্য দেখা যায়। যেমন টিটো সোভিয়েত বিরোধিতাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন; কিন্তু নাসের চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য বিরোধী অবস্থান থেকে আরব জগতে নেতৃত্বের পদ গ্রহণ করা। অন্যদিকে নেহরুর কাছে এই আন্দোলন ছিল একটি নৈতিক ধারণা ও শান্তিকে জয় করার একটি পথ। জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য আছে। তাদের মধ্যে সঠিক সমঝোতার অভাবও পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ১। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের ত্রুটিগুলি কি ছিল?

২.৫.২.৬ ঃ উপসংহার

বর্তমানে ঠাণ্ডালড়াই এর উপশমের পর জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। অর্থাৎ এই আন্দোলনের আর প্রাসঙ্গিকতা আছে কিনা আপাতদৃষ্টিতে ঠাণ্ডা লড়াই এর শেষে এর যৌক্তিকতা নেই বলে মনে হলেও আন্দোলনের পক্ষে অনেক কিছু বলার আছে। দুটি সামরিক জোটের একটি ভেঙ্গে গেলেও অপরটির প্রভাব থেকে রাষ্ট্রগুলির নিরাপদ ভাবার কোন কারণ নেই। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন কেবলমাত্র ঠাণ্ডা লড়াইয়ের বিরোধী নয়; এই আন্দোলন স্বাতন্ত্র্যের কথা ও বলে। অর্থাৎ স্বাধীনভাবে বৈদেশিক নীতি পরিচালনার অধিকার বোঝায়। ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উন্নয়নকামী মানুষের আন্দোলন বোঝায়। ঠাণ্ডা লড়াই এর অবসানের পর এগুলির প্রয়োজন এখনও ফুরিয়ে যায়নি। তাছাড়া বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে যে সংকট দেখা দিয়েছে তা থেকে মুক্ত হবার জন্যও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করা দরকার। তবে এই আন্দোলনের সাফল্যের সব কিছুই নির্ভর করছে সদস্যরাষ্ট্রগুলির ঐক্য ও আন্তরিক প্রয়াসের উপর।

২.৫.২.৭ ঃ সহায়ক গ্রন্থ

(১) প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় : আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস।

(২) অমিত কুমার সেন : আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস।

(৩) রাধারমন চক্রবর্তী ও সুকল্পা চক্রবর্তী : সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।

(৪) V. P. Dutt : India and the World.

(৫) B. R. Nanda : (ed) Indian Foreign Policy : The Nehru Years.

২.৫.২.৮ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্ন

(১) তৃতীয় বিশ্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর।

(২) জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন বলতে কি বোঝ?

(৩) জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের বিভিন্ন সম্মেলনগুলির সমালোচনামূলক বিবরণ দাও।

(৪) জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের বিভিন্ন গুণাবলী ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।

———————

পর্যায় গ্রন্থ - ৬
Age of Progress : Economic and Social

একক - ১
বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কৃষি ও সংস্কৃতি
Industry, Agriculture, Science and Technology and Communication and Information

বিন্যাস ক্রম ঃ

একক - ১

২.৬.১.১ ঃ প্রস্তাবনা

২.৬.১.২ ঃ উদ্দেশ্য

২.৬.১.৩ ঃ বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঃ বিজ্ঞান, কৃষি ও প্রযুক্তিতে

২.৬.১.৪ ঃ প্রগতির ধরন

২.৬.১.৫ ঃ তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব ও বিশ্বায়ন

২.৬.১.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

২.৬.১.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

২.৬.১.১ ঃ প্রস্তাবনা

উনিশ শতকের শেষদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যে অভাবনীয় উন্নতি হয়েছিল, তা দ্রুতগতি লাভ করেছিল কুড়ি শতকের গোড়ায়। প্রযুক্তি চর্চায় বিপ্লব এনে দিয়েছিল ১৮৯৫-এর মোটরগাড়ি নির্মাণ আর ১৯০৩-এর এরোপ্লেন। মানুষের ভালোর জন্য যেমন- এর প্রয়োগ হয়েছিল, তেমনি তার ক্ষতিও কম করেনি এই প্রযুক্তি-বিজ্ঞান। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আর ঔপনিবেশিক শক্তির নির্মাণের স্বার্থে পুঁজিবাদীরা এই বিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল, আঘাত করেছিল সাধারণ নাগরিক সমাজকে। ফলে শুরু হয়েছিল মানুষের নতুন লড়াই, অধিকার আদায়ের লড়াই। গড়ে উঠেছিল এক বিশেষ সংস্কৃতি চেতনা, মেয়েদের অধিকারের ভাবনাটিও এসেছিল সেই অনুষঙ্গে । বিজ্ঞান থেকে মানবতায় ঐতিহাসিক উত্তরণের একটি ছবিই আঁকা হবে এই এককটিতে।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আর ঔপনিবেশিক শক্তি নির্মাণের স্বার্থে পুঁজিবাদীরা এই বিজ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল, আঘাত করেছিল সাধারণ নাগরিক সমাজকে।

প্রশ্ন

১। বিশ্বে প্রথম কবে মোটরগাড়ি ও এরোপ্লেন নির্মাণ করা হয়?

২.৬.১.২ ঃ উদ্দেশ্য

কুড়ি শতকে দুই বিশ্বযুদ্ধের আবহে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী ও সংস্কৃতির রাজনীতিকরণ ঘটেছিল কীভাবে, তা ব্যাখ্যা করাই এই এককটির উদ্দেশ্য।

২.৬.১.৩ ঃ বৈপ্লবিক পরিবর্তন — বিজ্ঞান, কৃষি ও প্রযুক্তিতে

কুড়ি শতকের বিজ্ঞানের কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই চলে আসে পদার্থবিজ্ঞানের কথা। এতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের লক্ষণ উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে দেখা গিয়েছিল, তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল এই শতকে। প্ল্যাংক 'quantum theory' বা শক্তিকণাবাদ হাজির করে শক্তি বিকিরণের প্রচলিত তত্ত্বের খোলনলচে পাল্টে দিয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগেই আইনস্টাইন নিয়ে এসেছিলেন তার 'Theory of Relativity' বা আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। নিউটনীয় গতিবিদ্যার সংশোধন ছিল অনিবার্য। আইনস্টাইন শক্তি ও বস্তুর আলাদা সত্তা মানেননি, বলেছিলেন যে, বস্তুকে ধ্বংস করে শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটে, আবার শক্তিও জমাট বেঁধে বস্তুতে পরিণত হয়। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের এই তত্ত্ব গাণিতিক আঙ্গিকে প্রকাশিত হয়েছিল, তার ধ্বংসাত্মক প্রয়োগ হয়েছিল ১৯৪৫ সালে, জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকিতে মার্কিনী অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণে এবং ১৯৫২ সালে হাইড্রোজেন বোমার সৃষ্টিতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে শক্তিকণাবাদের ওপর ভিত্তি করে পরমাণুর গঠন (atomic structure) ব্যাখ্যা করেছিলেন কোপেনহেগেনের নীল্‌স্ বোর (Bohr)। সেই পরমাণুকে ভেঙ্গে, এক মৌলিক পদার্থকে কৃত্রিম উপায়ে অন্য মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করে বিজ্ঞানের জগতে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন কেম্ব্রিজের গবেষক রাদারফোর্ড (Rutherford)। বোর বা রাদারফোর্ড কেউই কিন্তু তখন কল্পনাও করতে পারেননি যে, তাদের আবিষ্কারের কতটা রাজনীতিকরণ ঘটতে পারে ভবিষ্যতে এবং যুদ্ধে তার কী বীভৎস প্রয়োগ হতে পারে।

১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের 'Theory of Relativity' গাণিতিক আঙ্গিকে প্রকাশিত হয়েছিল, তার ধ্বংসাত্মক প্রয়োগ হয়েছিল ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকিতে অ্যাটক বোমার বিস্ফোরণে এবং ১৯৫২ সালে হাইড্রোজেন বোমার সৃষ্টিতে। পাশাপাশি পদার্থ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে সহযোগিতা ও জ্ঞানের দেওয়া নেওয়ার এক চমৎকার পরিবেশ বজায় ছিল। এমনকি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন চলছে, সাহিত্যিকরাও অন্ধ জাতীয়তাবাদের মোহে যখন সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন, তখনও কেম্ব্রিজের রাদারফোর্ড জার্মানীর হান্স গাইগারের সঙ্গে গবেষণার খবর বিনিময় করেছেন। জার্মানীতে বন্দী করা হয়েছিল ইংরেজ বিজ্ঞানী চ্যাডউইককে (Chadwick)। সঙ্গে সঙ্গে জার্মান অধ্যাপকরা বন্দী-শিবিরেই তাঁর জন্য পরীক্ষাগার বানিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯২০ সালের পর জার্মানীর গ্যোটিঙেন্ বিশ্ববিদ্যালয়কে বিজ্ঞানের তীর্থক্ষেত্র করে তুলেছিলেন তারই (গ্যেটিঙেন্-এর) প্রাক্তন ছাত্ররা, যেমন, ওপেনহাইমার (Oppenheimer), হাইসেনবার্গ (Heisenberg), ডিরাক্ (Dirac), ব্ল্যাকেট (Blackett), ফার্মি (Fermi), গামো (Gamow) এবং পাওলি (Pauli)। এই সমাবেশটিকে ছিল হিটলারের রাজত্ব শুরু হওয়া পর্যন্ত।

কুড়ি শতকের তৃতীয় দশকে নিউটনীয় চিন্তাধারাকে সরিয়ে রেখে পদার্থবিজ্ঞানেও সম্ভাবনা তত্ত্বকে (Probability Theory) মেনে নেওয়া হয়েছিল। এই সময়েই পারমাণবিক ক্রিয়াবিক্রিয়া নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যার সূত্র যুগিয়েছিল quantum mechanics। এর স্রষ্টা ছিলেন চারজন, জার্মান গবেষক হাইসেনবার্গ ও শ্রোডিঙার (Schrodinger),

ইংরেজ গবেষক ডিরাক্ ও ফরাসী গবেষক দ্য ব্রয়ি (De Broglie)। এর কিছুদিনের মধ্যেই নির্ণীত হয়েছিল ইলেকট্রন ও প্রোটনের অস্তিত্ব, তৈরি হয়েছিল পরমাণু ভাঙার হাতিয়ার সাইক্লোট্রন (Cyclotron)। তবে আসল বিপ্লবটি ঘটেছিল ১৯৩২ সালে যখন চ্যাডউইক বস্তুর ভেতরের সুপ্ত শক্তিকে মুগ্ধ করবার জন্য আবিষ্কার করেছিলেন নিউট্রন। কিন্তু ক্ষমতালোভী রাজনীতিকরা যে এর অপপ্রয়োগ করতে পারেন, এই ভয় তখন থেকেই বিজ্ঞানীদের মনে ছিল। ফরাসী বিজ্ঞানী লাঁজভ্যাঁ-র (Langevin) কথাতেই তা পরিষ্কার ঃ "যে কোন স্বেচ্ছাচারী শাসকের মতোই হিটলারের পতন অবশ্যম্ভাবী; কাজেই তা নিয়ে আমি চিন্তিত নই, আমি চিন্তিত নিউট্রনকে নিয়ে, খারাপ লোকের হাতে পড়ে তা অনর্থ ঘটাতে পারে।" বিজ্ঞানীদের এই আশঙ্কা আতঙ্কে পরিণত হয়েছিল ১৯৩৮ সালে যখন জার্মানীতে অটো হান (Hahn) ও স্ট্রাসমান (Strassmann) সত্যি সত্যিই নিউট্রন দিয়ে পরমাণুকে ভেঙ্গে ফেলতে পেয়েছিলেন। ইহুদী বিজ্ঞানীদের হিটলার জার্মানী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই রাগে আমেরিকায় আশ্রয় পাওয়া বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, কুরান্ট (Courant) মার্কিন সরকারকে অ্যাটমবোমা বানানোর জন্য অনুরোধ করেছিলেন। ১৯৪৫-এর আগষ্টে জাপানের শহরদুটোতে ফেলা হয়েছিল সেই বোমা। ফলাফল সকলেরই জানা।

কিন্তু এরপরই আত্মগ্লানিতে ভুগতে শুরু করেছিলেন বিজ্ঞানীরা। তাই আইনস্টাইন আর সোভিয়েত বিজ্ঞানী কাপিৎসা শান্তির জন্য পরমাণু' আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। ১৯৪২-এ ফার্মির বানানো 'ইউরেনিয়ম্ রিঅ্যাকটরকে হাইড্রোজেন বোমার কাজে না লাগিয়ে শক্তিভাণ্ডার গড়ার কাজে লাগাতে বলেছিলেন গবেষকরা। ভি-১ এবং ভি-২ প্রযুক্তিকে প্রয়োগ করতে বলেছিলেন উড়োজাহাজ ও মহাকাশগামী রকেট তৈরির ব্যাপারে। তেমনি যুদ্ধের সময়ে জার্মান বিমানের আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য ইংল্যান্ডে তৈরি রাডারকে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণে লাগাতে বলা হয়েছিল, উন্নত হয়েছিল জ্যোতির্বিদ্যা (Radioastronomy)। ১৯৪৮ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী ভীনার্ (Wiener) ব্যাখ্যা করেন মহাকাশবাণী নিয়ন্ত্রণতত্ত্ব (Cybernetics), তার উন্নত রূপটি একবিংশ শতকের যোগাযোগ বিপ্লবের ভিত্তি।

রোগের চিকিৎসা, কৃষি ও খাদ্যের নানা চাহিদা থেকে জীব বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি হয়েছে কুড়ি শতকে। হপকিন্সের পুষ্টিতত্ত্ব (Nutrition) আর ভিটামিনের অস্তিত্বপ্রমাণ এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাছাড়া ছিল ডি. ডি. টি, সালফোনামাইড, পেনিসিলিন, প্যালউড্রিন— এইসব জীবাণুরোধক-এর আবিষ্কার। সেইসঙ্গে বেড়েছিল জৈব-রাসায়নিক গবেষণা (Biochemical research) দৈহিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্য তেজস্ক্রিয় সূত্র (radioactive tracer) আবিষ্কারের প্রয়াস, যেসব ভাইরাস অনুবীক্ষণেও দেখা যায় না, সেই সব জীবাণুকে দেখার জন্য ইলেকট্রন-মাইক্রোস্কোপের ব্যবহার, মস্তিষ্কের সঞ্চালন বোঝার জন্য ইলেকট্রোএন্সেফালোগ্রাফ্-এর নির্মাণ ইত্যাদি। এককথায়, এইভাবেই গড়ে উঠেছিল বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা, জৈব-পদার্থ-বিজ্ঞান বা Biophysics। এরই পাশাপাশি বিকশিত হয়েছিল কৃষি-প্রজনন-বিদ্যা বা Agricultural Genetics।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বংশগতির তত্ত্ব নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে অনেক বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। তবে সাধারণভাবে জীববিজ্ঞানীরা মেনে নেন যে, বংশগতির মূলে রয়েছে ডি এন্ এ ও আর্ এন্ এ নামক রাসায়নিক পদার্থ এবং এগুলোই ক্রোমোজম ও জিন্-এর উপাদান। কেমন করে এই উপাদানের সাহায্যে পূর্বপুরুষের বংশগতি উত্তরপুরুষের মধ্য দিয়ে বয়ে চলে, তা এখনকার একটি গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক আলোচনার বিষয়। এই তাত্ত্বিক জ্ঞানের

উৎকর্ষের ওপরই নির্ভর করে পশুপালন, কৃষি, পরিবেশ ও মানবসম্পদ বিকাশের মতো দরকারি বিষয়গুলো। শুধু তাই নয়, ডি এন এ পরীক্ষা যে কোন জৈব গোষ্ঠীর ইতিহাস নির্ণয়েরও অন্যতম হাতিয়ার।

প্রশ্ন

১। 'Quantum theory'-এর প্রবক্তা কে?
২। সোভিয়েত রাশিয়ার একজন বিজ্ঞানীর নাম কর?
৩। মহাকাশ বাণী নিয়ন্ত্রণতত্ত্ব কে ব্যাখ্যা করেন?
৪। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে বংশগতির মূল কি?

২.৬.১.৪ ঃ প্রগতির ধরন

কুড়ি শতকের বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে যে জিনিসটি স্পষ্ট বোঝা যায়, তা হল, বিজ্ঞানের গবেষণা দ্রুত বেড়েছে হয় যুদ্ধের সময়ে, নয়তো সেই সময়ে যখন শিল্পোদ্যোগীরা পুঁজিসৃষ্টির সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছে। যুদ্ধের সময়ে সামরিক বিজ্ঞানচর্চার ভেতর দিয়ে এমন সব তত্ত্ব ও তথ্য দ্রুত বেরিয়ে আসে, যেসব তত্ত্ব ও তথ্য হয়তো শান্তির সময়ে পাওয়া যেত অনেক ঢিমে তালে। ১৯২৯-এ আলেকস্যানডার ফ্লেমিং পেনিসিলিনের গুণ আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু তখন এটা নিয়ে তেমন হৈ চৈ হয়নি। অথচ যুদ্ধের সময়ে যখন সেনাদের চিকিৎসার ব্যাপারটি জরুরি হয়ে পড়েছিল, সেই সময়ে গুরুত্ব পেয়েছিল ঐ পেনিসিলিন। অন্যদিকে বিজ্ঞানের ব্যবসায়িক প্রেরণার লক্ষণীয় উদাহরণ হল টেলিভিশন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই পাওয়া গিয়েছিল এর আভাস। তখন কেউ এটা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন বোঝা গেল যে, উনিশ শতকীয় উৎপাদন-প্রযুক্তি আর কুড়ি শতকীয় শক্তি প্রযুক্তির মিশ্রণে গণব্যবহার্য পণ্যউৎপাদনের (Mass Production) বাজার-সম্ভাবনা (Market Potential) অসীম এবং তার জন্য চাই গণমাধ্যমের উন্নতি, কেননা গণমাধ্যমই ভোগ্যপণ্যবাদের (Consumerism) প্রচার করে বাজার সৃষ্টি করবে আর পুঁজির সম্ভাবনা বাড়াবে, তখন আর টেলিভিশনের ব্যাপারে কেউ পিছিয়ে রইল না, তার থেকেই এল তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব আর ভোগ্যপণ্যের বিশ্বায়ন।

বিজ্ঞানের গবেষণা দ্রুত বেড়েছে হয় যুদ্ধের সময়ে, নয়তো সেই সময় যখন শিল্পোদ্যোগীরা পুঁজিসৃষ্টির সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ পেনিসিলিন ও টেলিভিশনের উল্লেখ করা হয়।

প্রশ্ন

১। পেনিসিলিন কে ও কবে আবিস্কার করেন?
২। টেলিভিশন আবিস্কারের প্রেক্ষাপট আলোচনা কর।

২.৬.১.৫ ঃ তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব ও বিশ্বায়ন

বিশ্বায়িত ভোগ্যপণ্য সংস্কৃতি এবং কেন্দ্রীয় উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যতম শর্ত অবশ্যই তথ্যপ্রযুক্তি। বিশ্বায়ন গতি পেয়েছে তথ্যপ্রযুক্তির (Information Technology) হাত ধরে New International Information Order-এর প্রতিশ্রুতি দিয়ে। তথ্যপ্রযুক্তির নতুন অবয়বকে এভার্ট রজার্স পুরোনো কাঠামোর ওপর নতুন ব্যবস্থার প্রসারিত প্রভাব হিসেবে দেখতে চেয়েছেন, আর মার্শাল ম্যাকলুহান একে বলেছেন নাটকীয় বা বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

এই তথ্যপ্রযুক্তির মূল্যায়ন তিনদিক থেকে করা যেতে পারে। এক, তথ্যসঞ্চয়ন, তথ্যসঞ্চালন ও তথ্যবাজারের সংরক্ষণ ও প্রসারণ। দুই, তথ্যমাধ্যমিক পণ্যায়ন এবং তিন, উদ্বৃত্ত মূল্যজনক প্রযুক্তি।

প্রথম দিকটির ভিত্তি হল সাংখ্য-বৈদ্যুতিন (digital) পদ্ধতির প্রয়োগ। ১৯৮০-র দশক থেকে উন্নতি বিশ্বের অর্থনৈতিক এজেন্টগুলো স্যাটেলাইট কম্পিউটারভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা (Computer Synthesized Satellite Receiver) চালু করেছে। তার ফলে গোটা বিশ্বের সম্পদ, চাহিদা, জনসংখ্যা, সাচ্ছল্য বা দারিদ্র্য, সমাজের ক্রয়ক্ষমতা, আঞ্চলিক সৃজনশীলতা, এই সব তথ্যই দ্রুত বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে চলে যায়, প্রয়োজনমতো পুঁজির বিশ্বায়নে বা একরূপীকরণে ব্যস্ত 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট'-এর বা টেকনোক্রাটদের কাজে লেগে যায়। ডিজিটাল আর্কাইভ ব্যবস্থায় দরকারি তথ্য জমিয়েও রাখা যায়, সময়মতো কাজে লাগবে বলে, বা সেই তথ্য মোটা দামে বিক্রি করা যাবে বলে। এইভাবেই তথ্য নিজেই পণ্যয়িত (Commoditised) হয়ে যায়, প্রসারিত হয় তথ্যবাজার। সাধারণ অবস্থায় এই তথ্যবাজারের সবচাইতে দরকারি যোগাযোগ প্রযুক্তি হল ইন্টারনেট এবং ইন্ট্রানেট। এদের দৌলতেই পৃথিবীর ভোক্তারা আজ আর কোনো বিশেষ রাষ্ট্রের 'সিটিজেন' বা নাগরিক নন, তারা সকলেই হয়ে পড়েন 'নেটিজেন'।

এই তথ্যপ্রযুক্তির মূল্যায়ন তিনদিক থেকে করা যেতে পারে। এক, তথ্যসঞ্চয়ন, তথ্যসঞ্চালন ও তথ্য-বাজারের সংরক্ষণ ও প্রসারণ। দুই, তথ্যমাধ্যমিক পণ্যায়ণ এবং তিন উদ্বৃত্ত মূল্যজনক প্রযুক্তি । এই উন্নত প্রযুক্তি ও পুঁজির দ্রুত চলাচল নিচু মজুরির দেশের শ্রমকে উন্নত অর্থনীতির দেশে আমদানির সুযোগ করে দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এই তথ্যপ্রযুক্তিই এখন গোটা পৃথিবীর পণ্য বাণিজ্যের সবচাইতে বড় হাতিয়ার। এর মাধ্যমেই তৈরি হয় ক্রেতা, গড়ে ওঠে তার চাহিদা আর তার যোগাযোগ হয় বিক্রেতা বা উৎপাদকের সঙ্গে। ১৯৯০-এর দশকে স্যাটেলাইট সম্প্রচারে ছাড়পত্র দিয়ে ভারতে এই ব্যবস্থার সূচনা করেছিলেন অর্থমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিং, যে মনমোহন এখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। মানুষের খাওয়া-পরা-প্রসাধন বা শরীরচর্চা সবই ঠিক করে দেয় এই স্যাটেলাইট পণ্যায়ন। রুপার্ট মার্ডোক নিউজ কর্পোরেশনের কর্ণধার রূপার্ট মার্ডোককে এখন বলা হয় 'আকাশের আলেকজান্ডার'। তার একমাত্র কাজ হল সংবাদ, খেলাধূলা, বিনোদন এবং মানুষের শৈশবকেও স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা। এই দিয়েই যেন তিনি পৃথিবীকে পণ্যসংস্কৃতিতে ছেয়ে দেবেন, জয় করে নেবেন গোটা বিশ্বকে।

তৃতীয়ত, তথ্য সংগ্রহ আর তার উৎপাদনমুখী ব্যবহারের নানা কৌশল উদ্ভাবন করে উদ্বৃত্ত মূল্যও সৃষ্টি করতে পারে তথ্যপ্রযুক্তি। বিভিন্ন রকমের সফ্‌টওয়্যারই তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সারা বিশ্বে যে নেটভিত্তিক বাণিজ্য চলে ই-কমার্স, ই-ব্যাংকিং বা ই-শপিং এর হাত ধরে তার মূলেও এই সফ্‌ট্‌ওয়্যার।

অর্থনীতি ও পুঁজিশাস্ত্রের একটি দরকারি বিষয়ের আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক। উনিশ শতকে রিকার্ডো 'Theory of Comparative Advantage' শীর্ষক একটি আলোচনা করেছিলেন। তিনি এমন একটি বাণিজ্য ব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন, যেখানে নিচু হারে থাকা মজুরির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শ্রম-নিবিড় দেশগুলোকে উৎপাদনের ব্যাপারে তুলনামূলক সুবিধা (comparative advantage) দেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে ঐসব দেশে পণ্যের মূল্যমান কম থাকবে এবং মুক্ত বাণিজ্যের আবহাওয়ায় উঁচু হারে বাঁধা মজুরির যন্ত্র-নিবিড় উৎপাদনের বিদেশী পণ্য ঐ দেশগুলোর বাজার দখল করতে পারবে না। এইভাবে অনুন্নত দেশ মুক্ত বাণিজ্যের দুনিয়ায় আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

বিশ্বায়নের অর্থনীতি, প্রযুক্তির হাতবদল এবং তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার রিকার্ডোর এই ভাবনাটাকে অচল করে ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে মুশকিলে ফেলে দিয়েছে। উন্নত প্রযুক্তি ও পুঁজির দ্রুত চলাচল নিচু মজুরির দেশের শ্রমকে উন্নত অর্থনীতির দেশে আমদানির সুযোগ করে দিয়েছে। ফলে উন্নত দেশেই নিচু মজুরির সমান্তরাল উৎপাদন কাঠামো তৈরি হয়ে গেছে। মুক্ত বাণিজ্যের আপেক্ষিক সুবিধার তত্ত্ব এইভাবেই উন্নত দেশের পক্ষে দাঁড়িয়ে গেছে। অবশেষে ডিজিটাল ও তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব রিকার্ডোর তত্ত্বকেই বিপরীত মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আউটসোর্সিং-এর কায়দায় এখন শ্রম-প্রতুল দেশে বসেই যোগাযোগ-বিপ্লবের (Information Revolution) সুযোগে উন্নত দেশের উৎপাদনের কাজ সেরে ফেলা যায়। এ এক নতুন ধরনের পুঁজির উপনিবেশায়ন।

প্রশ্ন

১। পুঁজির উপনিবেশায়ন বলতে কি বোঝ?
২। রিকার্ডো তত্ত্ব কি?
৩। আকাশের আলেকজান্ডার কাকে বলা হয়?

২.৬.১.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ঃ পৃথিবীর ইতিহাস

Ference Feher et. al. : Dictatorship Over Needs.

Stein Ringer : The Possibility of Politics.

W.C. Mcwilliams and H. Piotrowski : The World Since 1945.

C.F.J. Muller (ed.) : Five Hundred Years : A History of South Africa.

Rinita Mazumder : A Short Introduction to Feminist Theory

McGeorge Bundy : Danger and Survival.

২.৬.১.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। কুড়ি শতকে যুদ্ধের পরিবেশ বিজ্ঞান গবেষণার ওপর কী প্রভাব ফেলেছিল? এর সঙ্গে রাজনীতির কী সম্পর্ক ছিল?

২। কুড়ি শতকের শেষদিকে তথ্যপ্রযুক্তিতে যে বিপ্লব আসে, তার স্বরূপ কী ছিল?

———————

পর্যায় গ্রন্থ - ৬
Age of Progress : Economic and Social

একক - ২
Cultural Revolution, Civil Rights Movement, Apartheid and Feminism

---

বিন্যাস ক্রম ঃ

একক - ২

২.৬.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

২.৬.২.১ ঃ প্রসঙ্গ সংস্কৃতি

২.৬.২.২ ঃ সংস্কৃতির দিকবদল ঃ ইউরোপ আমেরিকা

২.৬.২.৩ ঃ সংস্কৃতির সংকট

২.৬.২.৪ ঃ সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি

২.৬.২.৫ ঃ তৃতীয় বিশ্বের সংস্কৃতি

২.৬.২.৬ ঃ সাংস্কৃতিক স্ট্রাকচারালিজম

২.৬.২.৭ ঃ উত্তর-আধুনিক সংস্কৃতি

২.৬.২.৮ ঃ সাংস্কৃতিক উত্তরণ ঃ অধিকারের সংস্কৃতি

২.৬.২.৯ ঃ অধিকারের লড়াই ঃ মানবাধিকার আন্দোলন ঃ রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা

২.৬.২.১০ ঃ মানবাধিকার ঘোষণা

২.৬.২.১১ ঃ মানবাধিকার আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা

২.৬.২.১২ ঃ বর্ণবৈষম্যবাদ বিরোধী লড়াই ঃ দক্ষিণ আফ্রিকা

২.৬.২.১৩ ঃ মেয়েদের অধিকারের কথা ঃ নারীবাদ তথা মানবতাবাদ

২.৬.২.১৪ ঃ সারকথা

২.৬.২.১৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

২.৬.২.১৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

২.৬.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি থেকে আপনি জানতে পারবেন ঃ-

(১) প্রসঙ্গ সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির দিক বদল

(২) সংস্কৃতির সংকট

(৩) সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি

(৪) সংস্কৃতিক স্ট্রাকচারালিজম

(৫) মানবাধিকার আন্দোলন

(৬) বর্ণবৈষম্যবাদ বিরোধী আন্দোলন

(৭) মেয়েদের অধিকার নারীবাদ তথা মানবতাবাদ

২.৬.২.১ ঃ প্রসঙ্গ সংস্কৃতি

শুধু বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি নয়, কুড়ি শতকের আর একটি বিভাজক দিকচিহ্ন হল সংস্কৃতির ভোলবদল। যদি ভৌগোলিক দিক থেকে বিচার করা যায়, তাহলে কুড়ি শতকের সংস্কৃতি হল ত্রিমাত্রিক। একদিকে যুদ্ধোত্তর ইউরোপ-আমেরিকার সংশয়বাদ, অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার নিয়ন্ত্রিত সংস্কৃতি, আর তৃতীয় পক্ষে দরিদ্র বিশ্বের জাতীয়তাবাদ।

২.৬.২.২ ঃ সংস্কৃতির দিকবদল ঃ ইউরোপ-আমেরিকা

দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপ-আমেরিকার সংস্কৃতিকে দুটো বৈরী শিবিরে ভাগ করে দিয়েছিল। একদিকে ছিলেন শিল্পী সাহিত্যিকরা, আর অন্যদিকে বিজ্ঞানী ও প্রয়োগকুশলীরা। যুদ্ধের ভয়াবহতা শিল্পী-সাহিত্যিকদের মনে এমন বিতৃষ্ণার জন্ম দিয়েছিল যে, তারা ভুল বুঝতে শুরু করেছিলেন বিজ্ঞানীদের, বিজ্ঞানকেই অভিশাপ মনে করেছিলেন, তাই উত্তরোত্তর হয়ে পড়ছিলেন বিজ্ঞান-বিরোধী। ডব্লু. বি. ইয়েটস (১৮৬৫-১৯৩০), এজরা পাউন্ড (১৮৮৫-১৯৭২), যোসেফ কনরাড (১৮৫৭-১৯২৪), টি. এস. এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫), জেমস জয়েস (১৮৮২-১৯৪১) বা ডি. এইচ. লরেন্স (১৮৮৫-১৯৩০)— এঁরা প্রত্যেকেই ভয় পেয়েছিলেন বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মক প্রয়োগে, তাই প্রযুক্তিকে সরে যেতে বলেছিলেন, আক্রান্ত হয়েছিলেন দুরপনেয় নস্টালজিয়া বা স্মৃতিমেদুরতায়। যুদ্ধবিধ্বস্ত জীবনের গ্লানি এঁদের অবসন্ন করেছিল। এঁরা দেখেছিলেন শিল্প বিপ্লবের কদর্য দিকগুলো, তার ছাই ও ধোঁয়া, তার নিষ্পেষণ ও যান্ত্রিকতা, তার 'boredom' ও 'horror'। ম্যাথু আর্নল্ডের 'স্কলার জিপসি' তবু অক্সফোর্ড ছেড়ে প্রকৃতির রাজ্যে জিপসিদের সঙ্গে জীবনযাপনে আনন্দের খোঁজ পেয়েছিলেন, কিন্তু এলিয়টের 'হলো মেন'-দের ভাগ্য তেমন নয়, তাদের ভেতরে অসীম শূন্যতা, দুঃসহ অর্থহীনতা।

যুদ্ধের ভয়াবহতা শিল্প-সাহিত্যিকদের মনে এমন বিতৃষ্ণার জন্ম দিয়েছিল যে, তারা বিজ্ঞানকে অভিশাপ মনে করেছিলেন, তাই উত্তরোত্তর হয়ে পড়ছিলেন বিজ্ঞান-বিরোধী।

ইউরোপ-আমেরিকায় যুদ্ধ নতুন নতুন অর্থনৈতিক আর সামাজিক সমস্যা ডেকে এনেছিল। রুশ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নতুন বিশ্বাসের জন্ম হয়েছিল বটে, কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজের বুদ্ধিজীবীদের তা ততটা আকর্ষণ করেনি, যুদ্ধ আসলে তাদের মননে পঙ্গুত্বের বেদনা সঞ্চার করেছিল। ইয়েট্‌স্ তাই ১৯১৯-এ একটি কবিতায় লেখেন, "Things fall apart; the centre cannot hold/ Mere anarchy is loosed upon the world,/ The blood dimmed tide is loosed, and everywhere/The ceremony of innocence is drowned;/ The best lack all conviction, while the worst/Are full of passionate intensity".

প্রশ্ন

১। কয়েকজন ২০ শতকীয় সাহিত্যিকের নাম কর।

২। সাহিত্যিকরা প্রযুক্তির অপসারণ চেয়েছিলেন কেন ?

২.৬.২.৩ ঃ সংস্কৃতির সংকট

যুদ্ধ ঘটেছিল পুঁজিবাদী জগতের সংকট থেকে। আঠারো শতকের সাংস্কৃতিক সংকট যেমন ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছিল, উনিশ শতকের সংকট উত্তরিত হয়েছিল জাতীয়তাবাদের উল্লম্ফনে, কুড়ি শতকের সংকট কিন্তু তেমন কোনো সুযোগ পায়নি। রুশ বিপ্লব পুঁজিবাদের "ধ্বংস" চেয়েছিল বলে পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীরা জীবনের পরিণতি সম্পর্কে আশ্বস্ত হতে পারেননি, অনিশ্চয়তায় ভুগেছিলেন। একদিকে পুঁজিবাদের সমস্যা, আর অন্যদিকে অজানা সমাজতন্ত্রের ভয় সংস্কৃতিতে নানা অবৈজ্ঞানিকতা বা পিছুটানের জন্ম দেয়, নিজের প্রতি অনাস্থার রূপান্তর ঘটে কল্পনার কোন বীরের প্রতি আস্থায়, ফলে সহজতর হয় ফ্যাসিবাদের লালন। জীবনের চাইতে, বাস্তবের চাইতে কল্পনার শিল্প বড় হয়ে ওঠে, বৃহৎ ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত হয় 'শিল্পের জন্য শিল্প', 'সংস্কৃতির জন্য সংস্কৃতি'— এই সামন্তিক বিশ্বাসগুলো।

২.৬.২.৪ ঃ সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি

এর ঠিক বিপরীত মেরুতে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির অবস্থান। রুশ বিপ্লব ও চীন বিপ্লবের হাত ধরে তার বিকাশ। পুঁজিবাদী আধুনিকতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ধনতন্ত্রের নির্মম উদ্ভব প্রক্রিয়া, দুনিয়াজোড়া ঔপনিবেশিকতা, ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস আর নারকীয় যুদ্ধযন্ত্রণা। এর থেকে মুক্তি খোঁজে মার্কসবাদী শিল্প-সাহিত্য। পুঁজিবাদী বুদ্ধিজীবী সংস্কৃতির উদ্ধার খোঁজেন বিশেষ বিশেষ মানুষের মধ্যে, সমাজতান্ত্রিক শিল্পস্রষ্টা তার সন্ধান পান সমষ্টির মধ্যে, গোর্কির ব্যক্তি বা লু-সুনের অস্তিত্ব তাৎপর্য অর্জন করে ব্যষ্টির স্পর্শে। কিন্তু বিপদ সেখানেও আসে। প্রাচুর্যে ভরা, শিল্পোন্নত, শোষণমুক্ত যে সুষম সময়ের আধুনিকতার কথা বলে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি, তাও কখনো কখনো অন্ধ বিশ্বাসে কুসংস্কৃত, "সমূহের মধ্যে ব্যক্তির পূর্ণ নিমজ্জন হয়ে যায়" ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিসর্জন"। সেই কারণেই ব্যক্তিগত লিরিক্যাল লেখা লিখে দণ্ডিত হন আখ্‌মাতোভা, সোভিয়েত দেশে, ধিক্কৃত হয় কসমোপলিটানিজম বা অ্যাপলিটিসিজম। কিন্তু রূপান্তর থেমে থাকে না। তফাৎ ধরা পড়ে মায়াকভ্‌স্কি আর এভ্‌তুশেস্কোর রচনায়।

পুজিবাদী বুদ্ধিজীবী সংস্কৃতির উদ্ধার খোঁজেন বিশেষ বিশেষ মানুষের মধ্যে, সমাজতান্ত্রিক শিল্পস্রষ্টা তার সন্ধান পান সমষ্টির মধ্যে, লু-সুনের অস্তিত্ব তাৎপর্য অর্জন করে ব্যষ্টির স্পর্শে।

১৯৬৬তে মনন-গঠনের জন্য চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ডাক দেন মাও সে তুং। শতপুষ্প তবুও মঞ্জরিত হয় না, বরং অনেক ফুলই ফোটার আগেই ঝরে পড়ে।

২.৬.২.৫ ঃ তৃতীয় বিশ্বের সংস্কৃতি

তৃতীয় বিশ্বে এই সময়ের মনছবিটি কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরকম। একদিকে উনিশ শতকীয় ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের বিলম্বিত প্রভাবে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে জেগে ওঠা, আর অন্যদিকে রুশ বিপ্লব, আর পরে চীন বিপ্লবের দূরাগত আবেগে যুদ্ধগ্লানিকে অতিক্রম করে 'শুভ্র মানবিকতা'র আবাহন— এই ছিল সেই ছবির দুটো রং। ১৯২৭ সালে একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন "তখন ...অগৌরবের ইতিহাসমরুতে... বীরত্বকাহিনীর ওয়েসিস থেকে যেটুকু ফসল সংগ্রহ করা সম্ভব তাই নিয়ে স্বজাতির মহত্ত্ব-পরিচয়ের দারুণ ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা করা হত।"

কুড়ি শতকের মধ্যভাগে অব-ঔপনিবেশিকতার (de-colonisation) যুগে ঔপনিবেশিক রেশ সম্পূর্ণ কেটেছিল, তা নয়। তবে চর্চার ধরন বদলে গিয়েছিল তখন। একদা পরাধীন দেশগুলোর জীবনভঙ্গি, সাহিত্যকলা, মূল্যবোধ ও অর্থনীতির ওপর উপনিবেশের ছাপ বিশ্লেষণ করা শুরু হয়েছিল। এই থেকে গড়ে উঠেছিল উত্তর-উপনিবেশবাদ (postcolonialism)। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতিশাস্ত্র— এই সব কিছুর মধ্যে যোগসূত্ররক্ষা উত্তর-উপনিবেশবাদের লক্ষণ। কারণ এই পরম্পরা দিয়েই একমাত্র উপনিবেশের ছাপ ব্যাখ্যা করা সম্ভব। আর এই ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য অবশ্যই ঔপনিবেশিক পিছুটান কাটিয়ে ওঠা।

প্রশ্ন

১। উত্তর উপনিবেশবাদের প্রাথমিক কার্যকলাপ কি ছিল?

২.৬.২.৬ ঃ সাংস্কৃতিক স্ট্রাকচারালিজম

কুড়ি শতকের শেষ তিন দশকে 'সংস্কৃতি'-চর্চা নতুন মোড় নিয়েছে। ই. পি. থম্প্সন, এরিক হবস্বম বা রেনল্ড উইলিয়মস্ 'কালচারকে লড়াই টিকিয়ে রাখার হাতিয়ার হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আন্তোনিও গ্রামশি-র 'প্রিজন নোটস্' ছড়িয়ে পর অনেকের মনেই প্রশ্ন ওঠে, শুধুই কি লড়াই, বোঝাপড়াও কি নেই? শাসিত কি কেবল শাসকের বিরোধিতাই করে, শাসকের জীবনদর্শন নিম্নবর্গের চেতনাতেও কি নিঃশব্দে ঢুকে পড়ে না? অণু-ইতিহাস (Micro-history) চর্চা গ্রামশি-জাত এই সংশয়কে জোরালো করেছে, আলথুসারকে অগ্রাহ্য করে গুরুত্ব পেয়ে গেছে রোলা বার্থের মিথ্যাচেতনার তত্ত্ব।

এদিকে আলথুসারের স্ট্রাকচারালিজমকে ভাঙতে শুরু করেছিলেন বার্মিংহামের স্টুয়ার্ট হল, রিচার্ড জনসন আর টেরেন্স হক্স, তাঁদের 'সাব-কালচার'-এর তত্ত্ব দিয়ে। এক্ষেত্রে সবচাইতে বেশি সাড়া ফেলেছিলেন জেমস ক্লিফোর্ড তাঁর 'The Predicament of Culture' বইটি লিখে।

২.৬.২.৭ ঃ উত্তর-আধুনিক সংস্কৃতি

সংস্কৃতিচর্চার শেষ কুড়ি শতকীয় বাঁকটি এসেছিল উত্তর আধুনিকতা (Postmodernism) তত্ত্বের হাত ধরে। আধুনিকতার যুক্তিকেই আক্রমণ করে উত্তর-আধুনিকতা, তাকে ভাঙতে চায়, আবার গড়তে চায়। উত্তর-আধুনিক মতে, আধুনিকতারও অনেক অন্ধকার দিক আছে, শুধু পুঁজিবাদী আধুনিক সংস্কৃতি নয়, সমাজতান্ত্রিক আধুনিকতা সম্পর্কেও এটা সত্য। সোভিয়েত সংস্কৃতির অবক্ষয়, পূর্ব ইউরোপের ভাঙ্গন, চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিপর্যয় উত্তর আধুনিক সংস্কৃতি চর্চাকে আরও বেশি প্রাসঙ্গিকতা যুগিয়েছে। উত্তর আধুনিকরা দেখিয়েছেন কীভাবে সাংস্কৃতিক জগতে আধুনিকতার ক্ষমতা প্রযুক্ত হয়। চিন্তাভাবনায়, দর্শনে, শিল্পে চেপে বসে আধুনিকতার বিকৃতি। পরনির্ভর পশ্চিমমুখী সমাজদর্শন আর তাত্ত্বিক ভাবনা চেপে বসে উত্তর-ঔপনিবেশিক বৌদ্ধিক জগতে। এই উত্তর আধুনিক সংস্কৃতি চর্চার রথী মহারথীদের মধ্যে যাঁদের নাম করা যায়, তাঁরা হলেন মিশেল ফুকো, জাক দেরিদা, লিওতার, বদ্রিলার, লাঁকা, দ্যলুজ এবং গুয়াত্তারি।

উত্তর আধুনিক মতে, আধুনিকতারও অনেক অন্ধকার শুধু পুঁজিবাদী আধুনিক সংস্কৃতি নয় সমাজতান্ত্রিক আধুনিকতা সম্পর্কেও এটা সত্য।

প্রশ্ন

১। উত্তর আধুনিক তত্ত্বের দুজন দার্শনিকের নাম কর?

২.৬.২.৮ ঃ সাংস্কৃতিক উত্তরণ ঃ অধিকারের সংস্কৃতি

উত্তর-সাম্রাজ্যবাদী, উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বচর্চা শুধু বুদ্ধির জগতেই সীমাবদ্ধ ছিল, তা নয়। মানুষের বাস্তব জীবনচর্চাতেও তার প্রতিফলন ঘটেছিল। তবে এই প্রতিফলনের বিধেয় ছিল ভিন্নরকমের। বৌদ্ধিক চর্চার বিষয়ীরা ছিলেন উচ্চবর্গের মানুষ। বাস্তব জীবনের বিষয়ীরা প্রধানত ছিলেন নিম্নবর্গের। ফলে তাদের লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছিল মানবাধিকারের লড়াই। কখনো তা প্রকৃত গণতন্ত্রের পক্ষে, কখনো বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে, আবার কখনো বা লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে, নারীবাদের পক্ষে।

২.৬.২.৯ ঃ অধিকারের লড়াই ঃ মানবাধিকার আন্দোলন ঃ রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা

সামাজিক অধিকার (Civil Rights) বা মানবাধিকার (Human Rights) বলতে বোঝায় মানুষ হিসেবে মানুষের স্বীকৃতি আর সামাজিক জীবনের বিকাশমুখীনতা ও নিরাপত্তা। এর প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল ষোল-সতেরো শতকে ইউরোপে ইরাসমাস ও ক্যাম্পানেলার খ্রীষ্টীয় মানবতাবাদের ধারণায়; আর পেত্রার্ক, দাঁতে, ব্রুনো, দা-ভিঞ্চি, বেকন, সেক্সপিয়রের ধর্মোত্তর মানবতাবাদে। যুদ্ধোত্তর কুড়ি শতকীয় বিশ্বে এই মানবতাবাদই সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতা আর পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার আদায় ও রক্ষার আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল।

১৯৪৮-এ রাষ্ট্র সংঘের উদ্যোগে গৃহীত হয়েছিল আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ। এই পর্বে একশোটিরও বেশি দেশ ঔপনিবেশিক শাসনের শেকল ছিঁড়ে স্বাধীনতার পথে পা বাড়িয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অপূরণীয় ক্ষতি, ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের দুঃসহ স্মৃতি আর সমাজতান্ত্রিক লড়াইয়ের প্রেরণা গোটা পৃথিবীর মানুষকে মানবাধিকার প্রসঙ্গে সর্বসম্মত কর্মসূচী গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। যুদ্ধোত্তর পুঁজিবাদী

সমাজও এই দাবি অগ্রাহ্য করতে পারেনি, কেননা একে অবহেলা করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। ১৯৪৮-এ রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে তাই গৃহীত হয়েছিল আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ। এই পর্বেই একশোটিরও বেশি দেশ ঔপনিবেশিক শাসনের শেকল ছিঁড়ে স্বাধীনতার পথে পা বাড়িয়েছিল। ফলে মানবাধিকারের তাৎপর্য নতুন করে ধরা পড়েছিল সকলে চোখে।

১৯৫০-এর দশকের প্রথমদিকে রাষ্ট্রসংঘের সনদের ভিত্তিতে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র রচনার উদ্যোগ নেয় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশন। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় ধনতান্ত্রিক পাশ্চাত্য দেশগুলোর সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক এবং অব-উপনিবেশিত রাষ্ট্রগুলোর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকায়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো সম্পত্তির অধিকারের প্রশ্নে আপত্তি জানিয়েছিল, তবে অন্য সব বিষয়ে তাদের সায় ছিল। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো চুক্তিপত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলোকে ঢোকাতে চেয়েছিল, কিন্তু তাতে সায় ছিল না মার্কিন পক্ষের। ফলে দুটো আলাদা চুক্তিপত্র রচিত হয়েছিল। একটিতে ছিল কাজের অধিকার, খাওয়া-পরা-থাকা ও চিকিৎসার অধিকারের মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি, অন্যটিতে ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের উল্লেখ। চুক্তিদুটি কার্যকর হয়েছিল যথাক্রমে ১৯৬৬ ও ১৯৭৬ সালে। এর দশ বছর পর ১৯৮৬ সালে তৃতীয় বিশ্বের চাপে বিকাশের অধিকারকেও রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ মানবাধিকার সনদে অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘের তেহ্‌রান ঘোষণায় (১৯৮৬) বলা হয়েছিল ঃ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার অর্জন না করে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলোকে পাওয়া যায় না।" এই ঘোষণাই আরও স্পষ্ট ১৯৮৭ সালের রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তে ঃ "মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে জাতিবৈষম্য, বর্ণবৈষম্য, উপনিবেশবাদ, বিদেশী আগ্রাসন, দখলদারী ও আধিপত্য যাতে কোন সার্বভৌম দেশের মানুষকে বিপর্যস্ত না করে এবং সেই দেশের সম্পদ ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের ওপর যাতে সেই দেশের নাগরিকদের অধিকার স্বীকৃত হয়, সেদিকে রাষ্ট্রসংঘ সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দেবে।"

প্রশ্ন

১। সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ কিভাবে হয়?

২। কে কতসালে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন?

২.৬.২.১০ ঃ মানবাধিকার ঘোষণা

রাষ্ট্রসংঘ এ পর্যন্ত মানবাধিকারের যে সমস্ত ঘোষণা করেছে, সেগুলো হল ঃ মানবাধিকার ঘোষণা (১৯৪৮); গণহত্যাবিরোধী ঘোষণা (১৯৪৮); শিশুদের অধিকার ঘোষণা (১৯৫৯ ও ১৯৯১); জাতিগত বৈষম্যবিরোধী ঘোষণা (১৯৬৩); উপনিবেশকে স্বাধীনতাদান বিষয়ক ঘোষণা (১৯৬৭); নৃশংসতা বিরোধী ঘোষণা (১৯৭৮); ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও বৈষম্য বিরোধী ঘোষণা (১৯৮১) এবং নারী-অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা (১৯৯২)।

প্রশ্ন

১। ২০ শতকের শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র সংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাগুলি কি ছিল?

২.৬.২.১১ ঃ মানবাধিকার আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা

কিন্তু ঘোষণা মানেই যে মানবাধিকার সম্পূর্ণ রক্ষিত হবে এমন কোন কথা নেই। বিভিন্ন দেশের মতাদর্শগত অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক বিরোধ, ধর্মীয় মৌলবাদ বা সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণার অবশেষ পদে পদেই মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণ হয়ে ওঠে, ফলে ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও এর বাস্তব প্রতিকার সম্ভব হয় না। আবার রাষ্ট্রসংঘ এ ব্যাপারে কিছু করতে গেলেই সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপের অভিযোগ ওঠে। কিন্তু তবুও, সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলন এখন একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যের অধিকারী। জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার বিভাগের অধীন উদ্বাস্তু কমিশন (UNHCR) অনেক বেশি কার্যক্ষম বলে প্রমাণিত হয়েছে। ইতিহাস সৃষ্টি করেছে ১৯৯২ সালে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত বিশ্বনারী সম্মেলন।

আবার রাষ্ট্র সংঘ এ ব্যাপারে কিছু করতে গেলেই সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপের অভিযোগ ওঠে।

প্রশ্ন

১। মানবাধিকার আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা কোথায়?

২.৬.২.১২ ঃ বর্ণবৈষম্যবাদ বিরোধী লড়াই ঃ দক্ষিণ আফ্রিকা

অব-ঔপনিবেশিক পর্যায়ে মানবাধিকারের সীমাবদ্ধতার জ্বলন্ত প্রমাণ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যবাদ। আফ্রিকার অব-ঔপনিবেশিকতা বহুদিন পর্যন্ত পূর্ণ হয়নি দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যবাদের কারণে। ১৯১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা স্বাধীন হয়েছিল, কিন্তু সেই স্বাধীনতার কোনো অর্থ ছিল না কালো মানুষদের কাছে, কেননা দক্ষিণ আফ্রিকার শাসন থেকে গিয়েছিল আফ্রিকায় বাস করা সংখ্যালঘু ইংরেজদের হাতে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকদের (বুয়র) উত্তরপুরুষরা নিজেদের বলত 'আফ্রিকানর', আর আফ্রিকার কালো মানুষদের 'ধর্ম ও জাতি'র নিরিখে 'মনুষ্যেতর' বর্গে রাখত। সেই থেকে জন্ম নিয়েছিল বর্ণবৈষম্যবাদ (Apartheid), যার অর্থ আফ্রিকায় কালো মানুষদের আলাদাভাবে বাস করতে বলা। ইংরেজরা এই জাতিদর্শনই মেনে নিয়ে ১৯৫০ সালে Population Registration Act চালু করেছিল। এই আইন দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিকদের চারভাগে ভাগ করে, (ক) সাদা, (খ) মিশ্রবর্ণ (Coloured), (গ) ভারত থেকে যাওয়া কালো মানুষ ও (ঘ) বান্টু (আফ্রিকার কালো মানুষ)।

দক্ষিণ আফ্রিকার ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকদের উত্তর পুরুষেরা নিজেদের বলত 'আফ্রিকানর', আর আফ্রিকার কালো মানুষদের 'ধর্ম ও জাতির' নিরিখে 'মনুষ্যেতর' বর্গে রাখত।

১৯৪৮-এ আফ্রিকার ন্যাশনালিস্ট পার্টি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বর্ণবৈষম্য তীব্র রাজনৈতিক চেহারা নিয়েছিল। শিক্ষা, যাতায়াত, বাসস্থান, চাকরি— সবক্ষেত্রেই আফ্রিকার কালোদের আলাদা করে রাখা হত। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রসংঘের নিন্দাপ্রস্তাব ও আন্তর্জাতিক চাপকে কোনো আমল দেয়নি দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরেজ শাসক। ভারত ও অন্য বহুদেশ তার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখেনি, অর্থনৈতিক সম্পর্কের সংকোচন করেছিল, কিন্তু কোনো ভ্রুক্ষেপ

ছিল না দক্ষিণ আফ্রিকার। ১৯৫৯-এ বান্টুস্তান আইনের মাধ্যমে বান্টুদের জন্য দশটি এলাকা 'Bantu Homeland' বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তার বাইরে কোনো অধিকার ছিল না তাদের, অথচ বান্টু এলাকা ছিল তাদের কাছে 'archipelago of misery'। বান্টু বসতির এই নিয়ম দ্বিতীয়বার সাংবিধানিক চেহারা পেয়েছিল ১৯৭০ সালে, পাশ হয়েছিল 'The Bantu Homeland Citizenship Act'। বান্টুদের বসতি-শহরকে বলা হত ঘেটো।

প্রশ্ন

১। 'Population Registration Act' কবে চালু হয়?

২। বর্ণের নিরিখে দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিকদের কয় ভাগে ভাগ করা হয় ও কি কি?

১৯৬০ সালে সার্পভিল আর জোহানেসবার্গের কাছে সোয়েটোতে পুলিশী হাঙ্গামায় অনেক কালো মানুষের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনার পর বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের আসল লড়াই শুরু হয়। ১৯১২ সালের পর থেকেই এ ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিল 'আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস'। ১৯৬০-এ সেই প্রতিবাদ জঙ্গী হয়ে ওঠে। আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস নেলসন ম্যান্ডেলার তত্ত্বাবধানে তার সশস্ত্র ইউনিট তৈরি করে, নাম দেয় 'উমখন্ডো উয়ে সিজন্বে' অর্থাৎ 'জাতির বর্শাফলক'। নেলসন ম্যান্ডেলা সেই সময়ে বলেছিলেন, "fifty years of non-violence had brought the African people nothing but more repressive legislation, and fewer and fewer rights". সুতরাং অহিংসার পথে আর নয়।

১৯৬৪-তে ম্যাণ্ডেলা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পাশাপাশি নিষিদ্ধ হয়েছিল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস। এরপর প্রায় দু'দশক ছিল উত্তেজনার স্থিতাবস্থা, যদিও আন্তর্জাতিক চাপ ছিল অব্যাহত।

কিন্তু ম্যান্ডেলার আন্দোলনও নিরুপদ্রব ছিল না। একদিকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মার্কিন মানবাধিকার আন্দোলনের আদলে গড়ে ওঠা 'ব্ল্যাক কনসাসনেস' আন্দোলনের নেতা স্টিভ বিকো (Biko) ও তার দল। অন্যদিকে জুলু জাতীয়তাবাদীরা। "Whites must be made realize that they are only human, not superior, (and), blacks must be made realize that they are also human, not inferior"— এই ছিল 'ব্ল্যাক কনসাসনেস'-এর কথা। ১৯৭৭-এ বিকো-র মৃত্যুর পর তার আদর্শকেই গ্রহণ করেছিল Azanian Peoples Organisation (AZAPO)। তবে তারা অনেক বেশি উগ্র ছিল, কোনো শ্বেতাঙ্গকেই সহ্য করতে রাজি ছিল না তারা, তাদের স্লোগানই ছিল 'One settler one bullet'। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ 'প্যান আফ্রিকান' আন্দোলনে আস্থা ছিল না জুলু জাতীয়তাবাদী নেতা বুথেলজি-র (Buthelezi)। তার Inkatha Freedom Party নাটাল প্রদেশে 'জুলু হোমল্যান্ড' চেয়েছিল। বিকো এবং ম্যান্ডেলা দুজনেই সন্দেহ করেছিলেন, বুথেলজি দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের মদতেই কালোদের আন্দোলনে বিভাজন তৈরি করতে চাইছেন, তাকে দিয়েই শ্বেতাঙ্গ শাসকরা 'divide and rule' নীতির প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে। বিকো মৃত্যুর আগে বলেই গিয়েছিলেন, "We oppose Gatsha (Buthelezi). He dilutes the cause by operating on a governmental platform. Because of this I see the danger of division among blacks."

১৯৬৪-তে ম্যান্ডেলা গ্রেফতার হয়েছিলেন, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছিল তার, নিষিদ্ধ হয়েছিল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস। এরপর প্রায় দু'দশক ছিল উত্তেজনার স্থিতাবস্থা, যদিও আন্তর্জাতিক চাপ ছিল অব্যাহত। ১৯৮৫-তে প্রেসিডেন্ট বোথা সমঝোতার চেষ্টা করেছিলেন, কালোদের সঙ্গে সহাবস্থানের নীতি নিয়েছিলেন, স্লোগান দিয়েছিলেন 'adapt or die', কিন্তু কট্টরদের চাপে কিছু করে উঠতে পারেননি, ১৯৮৯-তে নিজের দলেই কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন, ক্ষমতা চলে গিয়েছিল Frederik W. De Klerk-এর হাতে। ক্লার্ক রক্ষণশীলদের চাপ কাটিয়ে উঠে মনোভাব পরিবর্তনের কথা বলতে পেরেছিলেন, স্লোগান দিয়েছিলেন নতুন আফ্রিকার, "a totally changed South Africa... free of domination or oppression in whatever form".

১৯৯০-এর ফ্রেব্রুয়ারিতে নিঃশর্তে মুক্তি পেয়েছিলেন ম্যান্ডেলা, ১৯৯৪-এর নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল তার দল, ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন ২৭মে। সেই সঙ্গে শেষ হয়েছিল বর্ণবৈষম্যের অধ্যায়। ১৯৯৬-এর ডিসেম্বরে স্বাক্ষরিত হয়েছিল কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ সমঝোতাপত্র। ইতিমধ্যে ডেসমন্ড টুটুর সভাপতিত্বে স্থাপিত হয়েছিল "Truth and Reconciliation Commission"। উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক হিংসাশ্রয়ীদের সামাজিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

প্রশ্ন

১। ব্ল্যাক কনসাসনেস আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন?

২। কৃষ্ণাঙ্গ শেতাঙ্গ সমঝোতা পত্র কবে স্বাক্ষরিত হয়?

২.৬.২.১৩ ঃ মেয়েদের অধিকারের কথা ঃ নারীবাদ তথা মানবতাবাদ

বর্ণবৈষম্যের মতো লিঙ্গবৈষম্যও ছিল কুড়ি শতকের সূচনাপর্বের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মেয়েদের মানুষ হিসেবে ন্যূনতম অধিকারটুকুও দেয়নি। তাই মানবাধিকার আন্দোলনের অংশ হিসেবেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল মেয়েদের অধিকারের আন্দোলন, ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছিল বিষয়টি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত মেয়েদের অবস্থান সংক্রান্ত ইতিহাস চর্চা সমাজবিদ্যার একটি গুরুত্বহীন অংশ হিসেবেই ছিল। এ পর্বে সমাজ-রাষ্ট্র এবং উৎপাদনের বিকাশ এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুরুষের প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়া হত। সমাজবিদ্যার চর্চা ছিল মূলত পুরুষকেন্দ্রিক। কিন্তু কুড়ি শতকের তৃতীয় দশক থেকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। মেয়েদের রাজনৈতিক গুরুত্ব, অর্থনৈতিক ভূমিকা এবং সামাজিক মর্যাদার দাবি জোরালো হয়। ফলে নারীবাদী ইতিহাস চর্চাও সমাজতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে।

মেয়েদের রাজনৈতিক গুরুত্ব, অর্থনৈতিক ভূমিকা এবং সামাজিক মর্যাদার দাবি জোরালো হয়। ফলে নারীবাদী ইতিহাস চর্চাও সমাজতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরিণত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে এবিষয়ে জন সচেতনতা আরও বৃদ্ধি পায়। ১৯৭০-এর দশকে রাষ্ট্রপুঞ্জ একটি রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে বলা হয়, গোটা বিশ্বে মোট শ্রমসময়ের দুই তৃতীয়াংশ ব্যবহার করে মেয়েরা, অথচ মোট উপার্জনের মাত্র (দশ) ১০ শতাংশের ওপর তাদের অধিকার স্বীকার করা হয়। গোটাবিশ্বের

উৎপাদনের মোট উপকরণের মাত্র ১ শতাংশ মেয়েদের নিয়ন্ত্রণে আছে বলে দেখানো হয়। রিপোর্টে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মোট শ্রম সময়ের মাত্র এক-তৃতীয়াংশের মত পুরুষ শ্রম ব্যবহার করা সত্ত্বেও মোট উপার্জনের ৯০ শতাংশের ওপর পুরুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রপুঞ্জের এই রিপোর্ট সমাজবিজ্ঞানীদের তীব্রভাবে নাড়া দেয়। সেইসূত্রে নারীবাদ বিষয়টি রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। এবং আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ বা আন্তর্জাতিক নারী দিবসের গুরুত্ব অনুভূত হয়।

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ইউরোপে মেয়েদের অবস্থান সংক্রান্ত প্রতিবাদী রচনার প্রচার শুরু হয়। ১৯৩১-৩২ সালে দুটি বিখ্যাত বই প্রকাশিত হয়। একটি হল 'Mary Baird' এর 'On Understanding Women' এবং অন্যটি হল Oswald Spengler-এর 'The Decline of the West" মেরী বেয়ার্ড যুক্তি দিয়ে দেখান যে, দাস সমাজ থেকে পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশ পর্যন্ত ইতিহাসের অর্ধেক স্রষ্টা মেয়েরা, কিন্তু ইতিহাসে তার স্বীকৃতি বা উল্লেখ নেই বললেই চলে। Spengler মন্তব্য করেন যে, এই অবস্থার স্বাভাবিক কারণ বিবর্তনের ব্যাখ্যায় পুরুষকেন্দ্রিকতা। Spengler-এর মতে, নারী হল পৃথিবীর ইতিহাস, আর পুরুষ পৃথিবীর ইতিহাসের নির্মাতা। এই বক্তব্য সমাজবিজ্ঞানের ধারণাগত দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার এই বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করলেই বোঝা যায় যে ইতিহাস চর্চা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করলেও মন্তব্যটি আসলে নারী বিরোধী পুরুষকেন্দ্রিক সমাজ বিকাশের ধারণার সমালোচনা হিসেবেই প্রযোজ্য।

ইতিহাসগতভাবে এই সমালোচনা একেবারে নতুন ছিল না। ইউরোপ-এর সূত্রপাত হয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে। দার্শনিক দিদেরো স্পষ্টভাষায় ইউরোপীয় সমাজের নারীবিরোধী অবস্থানের সমালোচনা করেছিলেন। পরে দিদেরোর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় জন স্টুয়ার্ট মিলের 'The Subjection of Women' বইতে। মেয়েদের অবস্থান সম্পর্কে দার্শনিকদের সচেতনতার প্রতিফলন ঘটে ফরাসী বিপ্লবে। এর একটি আর্থ-রাজনৈতিক পটভূমিও লক্ষণীয়। অর্থনৈতিক সংকটের ফলে যখন অভিজাতদের বিরুদ্ধে ফরাসী সমাজের প্রতিবাদ দেখা দেয় তখন সেই প্রতিবাদে মেয়েরাও সামিল হতে বাধ্য হয়। ফলে বাস্তিল দুর্গের ধ্বংসে যেভাবে মেয়েরা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল, ঠিক একইভাবে ফ্রান্সের বিভিন্ন খাদ্য দাঙ্গা (Food Riot)-এর সময় তারা পথে নেমেছিল। স্বভাবতই বিপ্লবী সংগঠনগুলি মেয়েদের গুরুত্বকে অস্বীকার করতে পারেনি। এরই পরিণতি ছিল মেয়েদের নেতৃত্বে একটি গণতান্ত্রিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা, যার নাম ছিল "Societe - des Revolutionaries Republicaines"।

এই সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন Rose Claire। ১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয় মেরি ওলস্টোনক্রাফটের "A Vindication of the Rights of Women." এই বইটিতে ফরাসী বিপ্লবে মেয়েদের যে ভূমিকা দেখা গিয়েছিল, সেই সূত্রেই মেয়েদের প্রাপ্য অথচ অস্বীকৃত স্বাভাবিক অধিকারগুলিকে তুলে ধরা হয়। বলা যায়, ইউরোপে নারীবাদী আন্দোলনের এটাই প্রকৃত সূচনা।

প্রশ্ন

১। 'The Decline of the Act' কার লেখা?

উনিশ শতকে এই প্রবণতার একটি বিপরীতমুখী প্রবণতাও দেখা যায়। তার প্রধান কারণ ছিল শিল্পায়ন। শিল্পবিপ্লবের পর পুরুষ এবং মহিলা উভয়শ্রেণীর শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় সমান হয়ে দাঁড়ায়। উৎপাদনে এই সমান অংশগ্রহণ বহু সমাজেই আতঙ্কের কারণ হয় এবং সেই কারণে শ্রমিকদের মধ্যেই নারীবাদ বিরোধিতা দেখা যায়। সম্ভবত এর ফলেই সমাজবাদী চিন্তা মেয়েদের বিশেষ কোনো স্থানের অস্তিত্ব স্বীকার করেনি। মার্কস তার সমাজতত্ত্বে নারী শ্রমিক হিসেবে কোন পৃথকবর্গের কথা বলেননি। মার্কসবাদ ঘোষণা করেছিল যে, শ্রমজীবীদের আন্দোলনের নেতৃত্বে অবশ্যই পুরুষ শ্রমিকরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

রুশ বিপ্লবের পর রাষ্ট্র পরিচালনায় মেয়েদের অধিকারের কথা লেনিন ঘোষণা করেন এবং রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সমাজতান্ত্রিক চিন্তাই আবার মেয়েদের ইতিহাসের আলোয় ফিরিয়ে আনে। এঙ্গেলস তার পরিবার ব্যক্তিমালিকানা এবং রাষ্ট্রের ইতিহাস প্রসঙ্গে প্রকাশিত রচনায় স্পষ্টভাবে দেখিয়ে ছিলেন যে, আধুনিক সমাজের পরিবার মেয়েদের গোপন ও প্রকাশ্যে দাসত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এঙ্গেলসের মতে, প্রতিটি পরিবারেই পুরুষ বুর্জোয়া এবং মেয়েরা প্রলেতারিয়েতের প্রতিনিধিত্ব করে। রুশ বিপ্লবের আগেই লেনিন বলেছিলেন যে, রাষ্ট্রীয় সংগঠনে, রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপায়নে মেয়েরা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। রুশ বিপ্লবের পর রাষ্ট্র পরিচালনায় মেয়েদের অর্ধেক অধিকারের কথা লেনিন ঘোষণা করেন এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য মেয়েদের প্রতি আহ্বান জানান। লেনিনই প্রথম মেয়েদের হাতে রাজনৈতিক মত প্রকাশের অধিকার তুলে দেন। এরপর 'Inosa Armando'-র নেতৃত্বে নারী কমিশন গঠিত হয়। ইতিমধ্যে দুটি বিখ্যাত বই, যথা — Margaret Fuller এর "Women in the Nineteenth Century" এবং John Stuart Mill-এর 'The Subjection of Women' মেয়েদের অধিকার সম্পর্কে ইউরোপে আলোড়ন তোলে। এই বই দুটি ইউরোপে বিশেষভাবে প্রচারিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। কিন্তু এগুলি রচিত হয়েছিল ১৮৪০ ও ১৮৬০-এর দশকে।

কুড়ি শতকে গোটা বিশ্বেই মেয়েদের অধিকারের আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণভাবে এই আন্দোলনের তিনটি ধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি ধারা লক্ষ করা যায় পুঁজিবাদী প্রথম বিশ্বে, দ্বিতীয় ধারাটি সমাজতান্ত্রিক দ্বিতীয় বিশ্বে এবং তৃতীয় ধারাটি গড়ে ওঠে অনুন্নত ঔপনিবেশিক তৃতীয় বিশ্বে। পুঁজিবাদী প্রথম বিশ্বের ধারাটি মূলত ছিল রাজনৈতিক অধিকারকেন্দ্রিক। যেসব রাষ্ট্রে বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেইসব রাষ্ট্রে এই ধারণা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, অর্থনৈতিক অধিকারের চাইতেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার। এবং এই রাজনৈতিক অধিকার অনেকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ভর করে গণতান্ত্রিক নির্বাচন কাঠামোর স্বীকৃত ভোটাধিকারের ওপর। যদিও এই ভোটাধিকারের বিষয়টি প্রথম আলোচিত হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াতেই এবং লেনিন ও জার্মানীর ক্লারা জেটকিন মেয়েদের ভোটাধিকার নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন, তবুও কুড়ি শতকে এই বিষয়টি গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী দুনিয়াতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেছিল। এর প্রধান কারণ অবশ্যই বিশ্বযুদ্ধ। বিশ্বযুদ্ধে মেয়েদের নাগরিকত্ব, রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের একাত্মতা অত্যন্ত জরুরি বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছিল। কেননা এর সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা এবং অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সম্পর্ক জড়িয়ে ছিল। ফলে ইংল্যান্ড বা জার্মানির মতো রাষ্ট্রের কাছে এই সমস্যার সমাধান করা ছিল অত্যন্ত প্রয়োজন। ১৯১৮ সালে ইংল্যাণ্ডে মেয়েদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছিল এবং ১৯১৯ সালে সুইডেন, নেদারল্যান্ড ও অস্ট্রিয়ায় মেয়েদের ভোটাধিকার মেনে নেওয়া হয়। স্পেনে এই অধিকার স্বীকৃত হয়

১৯৩১ সালে। ব্রিটেনে এ সময় একটি সংগঠন গড়ে ওঠে যার নাম দেওয়া হয় 'National Organization for Women'। এই সংগঠনটির কর্মসূচির মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল মেয়েদের রাজনৈতিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করা এবং বিবাহ বিচ্ছেদের প্রশ্নটিকে মেয়েদের পক্ষে নিয়ে আসা।

বুদ্ধিজীবী মহলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই মেয়েদের জাতীয়তা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই বিষয়টি নিয়ে আলোড়ন তুলেছিল Virginia Woolf-এর 'A Room of One's Own' বইটি। ভার্জিনিয়া ওলফ প্রধানত মেয়েদের জাতীয়তার সমস্যাটিকেই তুলে ধরেছিলেন এবং কিভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা থেকে সে বিযুক্ত হয়ে যেতে পারে তা দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে প্রথম বিশ্বে নারীবাদ বিষয়ে অসংখ্য বইলেখা হয়। এই বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য Simone-de-Beauvoir-এর "The Second Sex' (১৯৪৯), Millet-এর "Sexual Politics" (১৯৬৯), Moars এর "Literary Women" (১৯৭৩), Patricia Maire এর "The Female Imagination" (১৯৭৫) এবং Toril এর "Feminist Literary Theory" (১৯৮৫)।

কুড়ি শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তৃতীয় বিশ্বে গড়ে ওঠা নারীবাদী আন্দোলনের মধ্যে কখনো কখনো একটি স্বতন্ত্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। এপ্রসঙ্গে দুজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একজন Toni Morrison এবং অন্যজন হলেন Alice Walker. Morrison বলেন যে, গোটা বিশ্বেই উপনিবেশিকতার চাপে নারীবাদী আন্দোলন একটি বিকৃতিতে পর্যবসিত হয়েছে। যেহেতু নারীবাদের প্রথম আবির্ভাব ইউরোপে হয়েছিল এবং যেহেতু ইউরোপীয়রাই ঔপনিবেশিকতার পথিকৃত, সেই কারণে নির্যাতিত নারীশ্রেণীকে জাগিয়ে তোলার কথা বলা হলেও তাদের নেতৃত্বাধীন নারীবাদী আন্দোলনে নিয়ন্ত্রক এবং নিয়ন্ত্রিতের সামাজিক ভেদের বিষয়টি অবলুপ্ত হয়নি। শ্বেত সাম্রাজ্যবাদীরা কৃষ্ণকায়দের যে নিম্নবর্গীয় অনিবার্যতার চোখে দেখত সেই একই চোখে শ্বেত নারীবাদীরাও কৃষ্ণকায় মহিলাদের দেখেছিল এবং তাদের এই মনোভাবটি ঔপনিবেশিক তৃতীয় বিশ্বের নারীবাদী নেতৃত্বের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। সেইকারণে Morrison গোটা বিশ্বের Feminist Movement কে বর্জন করার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রচলিত নারীবাদ সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন— "I always missed some intimacy, some direction, some voice" মরিসন তার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থ "The Bluest Eye" (১৯৭০)-এর ভূমিকায় লিখেছিলেন, "I wrote my first novel because I wanted to read it".

প্রশ্ন

১। তৃতীয় বিশ্বে নারীবাদী আন্দোলনের লক্ষ্য কি ছিল?
২। Virginia Woolf-এর বইটির নাম লেখ?
৩। মেয়েদের ভোটাধিকারের কথা প্রথম কারা বলেছিলেন?

মরিসন-এর রচনা প্রকাশিত হওয়ার পর ইউরোপে প্রচলিত নারীবাদী আন্দোলনের একটি বিকল্প ধারা গড়ে ওঠে। এর উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত, নারীবাদের সংজ্ঞার পরিবর্তন ঘটানো, এবং তাকে সামগ্রিক মানববাদের সঙ্গে যুক্ত করা। দ্বিতীয়ত, নারীবাদী আন্দোলনের ওপর পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিয়ন্ত্রণের সমালোচনা করা এবং তৃতীয়ত,

মেয়েদের একটি স্বতন্ত্র নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্যেই ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় "National Institute for Women of Color" (NIWC) এই সংগঠনের নামে 'Color' কথাটির প্রয়োগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শ্বেতাঙ্গ সমাজের নারীবাদের বিরুদ্ধে জেগে ওঠার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে এখানে। Alice Walker নারীবাদের একটি বিকল্প শব্দও চয়ন করেছিলেন। তিনি 'Womanism' কথাটি ব্যবহার করেন এবং কথাটি বর্জন করেন নারী নেতৃত্বের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবার জন্যে। Alice Walker-এর মতে, Womanism এর অর্থ অনেক গভীর এবং সমাজ থেকে মেয়েদের বিচ্ছিন্ন করে তাদের অধিকার অর্জনের কোন উদ্দেশ্য 'Womanism' এর নেই। Walker এর এই বক্তব্যে মেয়েদের মানবিক স্বীকৃতির কথা বলা হয়েছে এবং মাতৃত্বের ভ্রান্তধারণার অবসানের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

***Alice Walker** নারী নেতৃত্বের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য নারীদের একটি বিকল্প শব্দ হিসেবে **'Womanism'** কথাটি ব্যবহার করেন।*

উনিশ শতকের শেষভাগে প্রধানত নিপীড়িত সমাজগুলিতেই এই আন্দোলনের ধারাটি ছড়িয়ে পড়েছে। এরই সূত্রে Sherley Anne Williams একটি বই লেখেন। তার নাম 'Some Implications of Womenist theory'। এই রচনায় Sherley দেখিয়েছেন যে Womanist Movement এর লক্ষ্য বিচ্ছিন্নভাবে মেয়েদের অধিকার অর্জন নয়, সার্বিকভাবে অধিকারহীন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং মেয়েদের তার সঙ্গে যুক্ত করাই Womanist Movement-এর উদ্দেশ্য। Sherley-র মন্তব্যটি এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ "Womanist Enquires assume that it can talk both effectively and productively about men."।

প্রশ্ন

১। 'Womanism' আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য কি ?

২। 'Womanism'-এর প্রবক্তা কে ?

২.৬.২.১৪ ঃ সারকথা

কুড়ি শতকের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অকল্পনীয় দ্রুতগতি থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার। তা হল, শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করে এমন বিজ্ঞানের সন্ধান যদি পাওয়া যায়, বিজ্ঞানের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রয়োগ যদি সম্ভব হয়, তাহলে গবেষণা ও প্রয়োগের জন্য রাষ্ট্রীয় সমর্থনের অভাব হয় না, বৈজ্ঞানিক ধারণার বাস্তবায়নের জন্য অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষাও করতে হয় না। তবে যে কোন ঘটনারই প্রতিক্রিয়া থাকে। যুদ্ধে বিজ্ঞানের ভয়াবহ প্রয়োগের পর সেই প্রতিক্রিয়াই দেখা গিয়েছিল সংস্কৃতি ও অধিকারের আন্দোলনে।

২.৬.২.১৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ঃ পৃথিবীর ইতিহাস

Ference Feher et. al. : Dictatorship Over Needs.

Stein Ringer : The Possibility of Politics.

W.C. Mcwilliams and H. Piotrowski : The World Since 1945.

C.F.J. Muller (ed.) : Five Hundred Years : A History of South Africa.

Rinita Mazumder : A Short Introduction to Feminist Theory

McGeorge Bundy : Danger and Survival.

২.৬.২.১৬ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। কুড়ি শতকের সাংস্কৃতিক চর্চার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করুন। উত্তর-আধুনিকতা বলতে কী বোঝায়?

২। মানবাধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

৩। বর্ণবৈষম্যবাদ বলতে কী বোঝায়? দক্ষিণ আফ্রিকায় কীভাবে এর অবসান ঘটেছিল?

৪। কুড়ি শতকে মেয়েদের অধিকারের আন্দোলন কীভাবে গড়ে উঠেছিল, ব্যাখ্যা করুন। 'Womanism' এর তাৎপর্য কি?

———————

পর্যায় গ্রন্থ - ৭
সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার পতন ও ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান
Disintegration of Socialist Block and end of Cold War

একক - ১
Genesis and Process of Disintegration

বিন্যাস ক্রম ঃ

২.৭.১.১ ঃ প্রস্তাবনা

২.৭.১.২ ঃ উদ্দেশ্য

২.৭.১.৩ ঃ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের অবক্ষয় ঃ সূচনা ও পরিণতি

২.৭.১.৪ ঃ সোভিয়েত রাষ্ট্রের ভাঙ্গনের পর্ব ঃ ভাঙ্গনের কারণ

২.৭.১.৫ ঃ গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকা

২.৭.১.৬ ঃ গরবাচভের শেষ বছর

২.৭.১.৭ ঃ রুশ ফেডারেশন

২.৭.১.৮ ঃ সোভিয়েত ভাঙ্গন

২.৭.১.৯ ঃ ভাঙনের পর ঃ পূর্ব ইউরোপ

২.৭.১.১০ ঃ চীনা সমাজতন্ত্রের পতন

২.৭.১.১১ ঃ অবক্ষয়ের কারণ

২.৭.১.১২ ঃ সাংস্কৃতিক বিপ্লব

২.৭.১.১৩ ঃ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সমালোচনা

২.৭.১.১৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

২.৭.১.১৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

২.৭.১.১ ঃ প্রস্তাবনা

আগের পর্যায় গ্রন্থে যে ত্রিমাত্রিক সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য লক্ষ করা গেছে, যে মানবাধিকারের কথা বলা হয়েছে, তার একটি অন্যতম ধারক ছিল সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া। কুড়ি শতকের শেষে সেই দুনিয়ারই পতন ঘটেছে। সেইসঙ্গে

দেখা দিয়েছে পুঁজিবাদের পূর্ণশক্তি আর তার প্রশ্রয়ে লালিত ভোগ্যপণ্যবাদ, যার চূড়ান্ত আর্থ-রাজনৈতিক প্রকাশ ঘটেছে বিশ্বায়নের মধ্যে। এই পর্যায় গ্রন্থে এই পর্বান্তরেরই একটি রূপরেখা দেওয়া হয়েছে।

২.৭.১.২ ঃ উদ্দেশ্য

সমাজতন্ত্রের পতন ও তার ফলে একমেরু বিশ্বের একমাত্রিক সংস্কৃতি ও রাজনীতির উদ্ভবের সঙ্গে পরিচয় করানোই এই পর্যায় গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

২.৭.১.৩ ঃ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের অবক্ষয় ঃ সূচনা ও পরিণতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বব্যবস্থায় পর্বান্তরের সূচনা হয়েছিল সোভিয়েত রাষ্ট্রের অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে। এই অবক্ষয় শুধু রুশ বিপ্লবকেই ব্যর্থ করেনি, সামগ্রিকভাবে সমাজতন্ত্রেরই পতন ডেকে এনেছিল। এর সঙ্গে সোভিয়েতের অভ্যন্তরীণ-রাজনৈতিক পরিবর্তন বা বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে তার টানাপোড়েন, কোন্‌টির সম্পর্ক ছিল বেশি, তা নিয়ে তাত্ত্বিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। বিতর্কটির সূত্রপাত করেছিলেন চার্লস বেট্‌লহেম এবং পল সুইজি 'মান্থলি রিভিউ' পত্রিকার পাতায়, ১৯৮৫ সালে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বব্যবস্থায় পর্বান্তরের সূচনা হয়েছিল সোভিয়েত রাষ্ট্রের অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে।

চার্লস বেট্‌লহেম সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গনকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করেছিলেন। তাঁর মতে, বিপ্লবের আগেও রুশ সম্প্রসারণবাদ বারবার ধাক্কা খেয়েছিল। স্তালিন পরবর্তী রাশিয়া সেভাবেই আবার পর্যুদস্ত হয়েছে। সেই বিপর্যয় সমাজতান্ত্রিক কাঠামোকেও ধ্বংস করেছে। পল সুইজি এই মতের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে, বিপ্লবোত্তর সোভিয়েতের যেটুকু সামরিক সম্প্রসারণশীলতা দেখা গিয়েছিল, তার আসল উদ্দেশ্য ছিল পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোর নিরাপত্তা অর্জন, পুঁজির রপ্তানি নয়। সুতরাং সোভিয়েত বিস্তারনীতি ছিল পুঁজিবাদী আগ্রাসনের বিপরীত প্রতিক্রিয়া, প্রত্যক্ষ সক্রিয়তা নয়। সেই কারণে কোনভাবেই এটা ভাঙ্গনের জন্য দায়ী ছিল না।

কিন্তু চার্লস বেট্‌লহেমের বক্তব্যেরও যেমন অতিসরলীকরণের ঝোঁক আছে, তেমনি পল সুইজির পর্যবেক্ষণের সীমাবদ্ধতাও কম নয়। ক্রুশেভের নিস্তালিনীকরণ (deStalinization) আর ব্রেজনেভের রাষ্ট্রীয় পুঁজির সম্প্রসারণবাদ অবশ্যই সোভিয়েত ব্যবস্থার পতনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোনভাবেই এই পতন শুধু পশ্চিমী ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় ঘটেনি, পশ্চিমী এবং মার্কিন চাপে বা পশ্চিমী পুঁজিবাদের সাফল্যে ঘটেনি। তর্ক-বিতর্ক, তত্ত্ব-প্রতিতত্ত্বের জটিলতার মধ্যে না ঢুকেও এই ঘটনার সহজবোধ্য একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

প্রশ্ন ১। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সূত্রপাতটি কারা করেছিলেন ?

২.৭.১.৪ ঃ সোভিয়েত রাষ্ট্রের ভাঙ্গনের পর্ব ঃ ভাঙ্গনের কারণ

সোভিয়েত রাষ্ট্রের ভিত তৈরি করেছিলেন লেনিন ও স্তালিন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। কিন্তু শুধু সামন্তশোষণ নির্মূল করার বাইরে এবং আধুনিক অর্থনীতির দেওয়াল গড়া ছাড়া আর বেশি কিছু করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এর কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, লেনিন-স্তালিনের সামনে কোনো পূর্ব-দৃষ্টান্ত না থাকায় পথিকৃতের স্বাভাবিক দোষের হাত তাঁরা এড়াতে পারেনি। সাফল্য তাঁরা পেয়েছিলেন, কিন্তু ব্যর্থতার ধাক্কা কী করে রাষ্ট্র সামলাবে, তার ব্যবস্থা করে যাননি তাঁরা। দ্বিতীয়ত, অনবরত পুঁজিবাদের বাইরে থেকে দেওয়া চাপ ও অন্তর্ঘাত থেকে সোভিয়েতকে বাঁচানোর জন্য অতিমাত্রায় কেন্দ্রীকরণ করতে হয়েছিল। সামাজিকীকরণ ব্যাহত হয়েছিল, ফলে নতুন প্রজন্মের মধ্যে সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বিপ্লব সংগঠিত হয়নি এবং পুঁজিবাদী জৌলুসের দিকে আকৃষ্ট হওয়া তাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল। অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সাম্যবাদী কঠোরতায় স্থির থাকা সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে, অথচ "communism was essentially an instrument of faith : the present having value as a measure of reaching an undefined future." তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় স্তরে দলের অতিরিক্ত প্রাধান্য, ব্যক্তি-পুঁজির বদলে রাষ্ট্রীয় পুঁজির উদ্ভব ও তার ওপর দলের আমলা গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণের ফলে সামন্ত-শোষণের বদলে দলীয় আমলা-শোষণের পথ প্রস্তুত হয়েছিল এবং বিপ্লব পরবর্তী রুশ প্রজন্ম তা মেনে নিতে রাজি ছিল না। চতুর্থত, বিকেন্দ্রীকরণের অভাবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা কমেনি বরং বেড়েছিল, আর সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছিল সামরিক কর্তৃত্ব ও পুলিশি নজরদারি, যা একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে ছিল অস্বাভাবিক। এই কারণেই, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যখন সোভিয়েত রাষ্ট্রের 'লৌহযবনিকা'র কথা বলেছিলেন বা 'বদ্ধ সোভিয়েত কাঠামোর' বিপরীতে 'মুক্ত জগৎ'! (Free Society) গড়ার ডাক দিয়েছিলেন, তখন তা অনেকের কাছেই যুক্তিসংগত মনে হয়েছিল। তাছাড়া ভোগ্যপণ্য বনাম সামাজিক পণ্যের দ্বন্দ্বের সমাধান লেনিন-স্তালিন করে উঠতে পারেননি।

লেনিন ও স্তালিনের হাতে সোভিয়েত রাষ্ট্রের ভিত তৈরী হলেও শেষ পর্যন্ত সামাজিক ও সামরিক কারণে তা ভাঙনের দিকে এগিয়ে যায়, এবং পরবর্তী শাসক লিওনিদ ব্রেজনেভ এর আমলে প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েত সম্প্রসারণের সূচনা হলেও শেষে মুদ্রাস্ফীতি, উৎপাদন হ্রাস প্রভৃতি কারণে আবার তা দুর্বল হয়ে পড়ে।

এর ওপর এসেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কা। জরুরি অবস্থায় রাষ্ট্রের নিষ্পেষক অংশ, অর্থাৎ আমলাতন্ত্র, পুলিশ ও সেনা, শক্তিশালী হয়ে ওঠে, সেনাবাহিনীর মধ্যে লালফৌজের রীতি ভেঙ্গে র‍্যাঙ্কিংপ্রথা চালু হয়ে যায়, যুদ্ধ ও গুপ্তহত্যার ফলে বেশিরভাগ কট্টর কমিউনিস্ট শহিদ হয়ে যান, সেনা ও আমলাদের ওপর রাজনৈতিক নজরদারি শিথিল হয় এবং ক্ষুদে উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত পুঁজিবাদ একটু একটু করে গেড়ে বসতে শুরু করে।

স্তালিন-এর মৃত্যুর পর স্তালিনপন্থী ম্যালেনকভ ও মলোতভকে সরিয়ে ক্ষমতায় নির্বাধে আসেন ক্রুশ্চেভ। তিনি এইসব ত্রুটি দূর করতে পারেননি বা চানওনি, বরং ধামাচাপা দিয়েছিলেন এবং সবকিছুর দায় স্তালিনের ঘাড়ে চাপিয়ে শুরু করেছিলেন নিস্তালিনীকরণ (De-Stalinization)। সোভিয়েতকে তিনি শুধুই একটি জাতীয়তাবাদী দেশে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন, আর তার অভ্যন্তরীণ আর্থ-রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন বাইরে 'উপনিবেশ' স্থাপন করে। সোভিয়েত রাষ্ট্রের সম্প্রসারণবাদের বীজ তিনি রোপণ করেছিলেন এইভাবেই।

ক্রুশ্চেভের পর ১৯৬৫ থেকে দু'দশক সোভিয়েত রাষ্ট্রের ক্ষমতায় ছিলেন লিওনিদ ব্রেজনেভ। তাঁর আমলই হল প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েত সম্প্রসারণের যুগ। কিন্তু ভেতরের অর্থনীতিকে না সামলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক প্রতিযোগিতায় যাওয়ার অর্থ আর্থিক সংকট ডেকে আনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রথম সোভিয়েত রাশিয়ায় মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, ইস্পাতের উৎপাদন কমে, তেল-সংকট অনিবার্য হয়ে ওঠে, পুঁজি-শ্রম-প্রযুক্তির অভাবে সাইবেরিয়ার তেলখনি অব্যবহৃত পড়ে থাকে। প্রযুক্তি ও খাদ্যশস্যের জন্য রাশিয়া ক্রমশ তারই প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, শুধু অস্ত্রশিল্পটি তার টিকে থাকে, আর তা যুদ্ধ-প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়।

১৯৮৩-৮৪ সালে আন্দ্রোপভ-শার্নেঙ্কোর জমানায় ব্রেজনেভপন্থীরা কিছুটা পিছু হঠায় অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছিল। শিল্পে অল্প উন্নতি হয়েছিল। আন্দ্রোপভের 'Team Contract' নীতি আর শার্নেঙ্কোর কৃষি-প্রসার ও কৃষি-প্রযুক্তির নীতি কৃষি-উৎপাদন বাড়িয়েছিল। উৎপন্ন হয়েছিল ১৯০ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য। লক্ষ্য থেকে বহু দূরে হলেও ১৯৭৮-এর পর এটা ছিল একটা রেকর্ড। বিদেশনীতির ব্যাপারে এরা মধ্যপন্থা অনুসরণ করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছিল, তবে আফগানিস্তান থেকে রুশ সৈন্য সরেনি।

১৯৮৫-তে ক্রেমলিনের সর্বোচ্চ পদে আসেন মিখাইল গরবাচভ। তিনি ছিলেন বিপ্লবোত্তর প্রজন্মের মানুষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাঁর কাছে বাল্যস্মৃতি মাত্র। আন্দ্রোপভ শার্নেঙ্কোর অর্থনীতি যেটুকু আলোর মুখ দেখিয়েছিল, তা ততদিনে আবার মিলিয়ে গেছে, তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের মুখে তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বদলে সমঝোতার নীতি নিতে হয়েছিল গরবাচভকে। তাছাড়া ক্রুশ্চেভের সময় থেকে একটু একটু করে পুঁজিমুখী অর্ন্তকাঠামো তৈরি হয়েছিল, তার সঙ্গে ততদিনে বিরোধ বেধেছে রাজনৈতিক উপরিকাঠামোর। ফলে গরবাচভকে ভাবতে হয় রাষ্ট্রনীতির সংস্কারের কথা। এই সংস্কারই ছিল তাঁর গ্লাসনস্ত আর পেরেস্ত্রৈকা।

প্রশ্ন

১। সোভিয়েত রাষ্ট্র ভাঙনের কারণগুলি কি ছিল ?

২.৭.১.৫ ঃ গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকা

আর্থ-রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা থেকে গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকা সূত্রায়িত হয়, একথা সত্য। কিন্তু তবুও এর তাত্ত্বিক বিস্তারের প্রয়োজন ছিল। এই জায়গায় গরবাচভ অবশ্যই বুদ্ধিজীবীসুলভ কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন। মূলত গ্লাসনস্ত-পেরেস্ত্রৈকা ছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অপস্রিয়ক ব্যাখ্যা, সমাজ, রাষ্ট্র এবং আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের অনাদর্শায়নের (deideologization) প্রয়াস, অথচ গরবাচভ এই কাজটিকে করতে চেয়েছিলেন লেনিনের দর্শনের কালানুক্রমণের (updating) নামে। লেনিনের জীবনের শেষ বছরগুলোর দিকে ফিরে তাকানোর ওপর তিনি জোর দিয়েছিলেন এবং তার মধ্যেই নিজের তাত্ত্বিক ভিত্তি খুঁজে পেয়েছেন, এমনটাই গরবাচভ বলেছিলেন অথচ শেষ

পর্যন্ত যে তত্ত্ব তিনি হাজির করেছিলেন, তার সঙ্গে না ছিল মার্কসীয় দর্শনের মিল, না তাতে ছিল লেনিনের রাজনীতির আদল। পুঁজিবাদকে তিনি প্রায় অপরাজেয় বলেই ধরে নিয়েছিলেন, আর সমাজতন্ত্র তার কাছে ছিল এক ব্যর্থ প্রত্যাশা, তাই পশ্চিমের সঙ্গে টক্কর দিতে যাওয়ার কোনো যৌক্তিকতাই তিনি খুঁজে পাননি। তাঁর মতে, Present day Capitalism differs in many respects from what it was. Contrary to Marx's most fundamental precept, Capitalism is not expected to decline anytime in the near future, nor should socialists necessarily seek to accelerate that decline." প্রাভদা পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে গরবাচভ জানিয়েছিলেন যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্যার একমাত্র 'universal solution' হিসেবে সমাজতন্ত্র তাঁর কাছে আর বরণীয় নয়, পুঁজিবাদী জগতের সঙ্গে বিরোধিতার সম্পর্ক বজায় রাখার কোনো অর্থও তিনি দেখতে পান না। গরবাচভের কথায়, "Confrontation is not an inborn defect in our relations. It is rather an anomaly. Its continuation is not inevitable at all." গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকাকে বুঝতে গেলে আগে গরবাচভের এই তাত্ত্বিক অবস্থানটি সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকার।

আর্থ সামাজিক বাধ্যবাধকতা থেকে গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকা সূত্রায়িত হয়। গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকাকে আলাদাভাবে বোঝা সম্ভব নয়। কেননা দুটো একে অন্যের পরিপূরক এবং দুটোকে নিয়েই গরবাচভের সংস্কার। গ্লাসনস্ত বলতে বোঝায় 'মুক্তমনা হওয়ার জন্য ব্যাপক গণতন্ত্র' আর পেরেস্ত্রৈকার অর্থ করা হয় 'পরিবর্তন, পুনর্গঠন ও নবসংস্কার।

গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকাকে আলাদা আলাদাভাবে বোঝা সম্ভব নয়, কেননা দুটো একে অন্যের পরিপূরক এবং দুটোকে নিয়েই গরবাচভের সংস্কার। ১৯৮৫ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাতাশতম অধিবেশনে গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকাকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। গ্লাসনস্ত বলতে বোঝানো হয় 'মুক্তমনা হওয়ার জন্য ব্যাপক গণতন্ত্র' আর পেরেস্ত্রৈকার, অর্থ করা হয় 'পরিবর্তন, পুনর্গঠন ও নবসংস্কার'।

গ্লাসনস্ত-পেরেস্ত্রৈকার লক্ষ্য ও পদ্ধতি ছিল আরও বেশি গণতন্ত্রীকরণ। সোভিয়েত রাশিয়াকে বলা হয়েছিল 'আইনি রাষ্ট্র এবং স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্ত মুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ' (a law-governed state and a self-governing socialist society)। একটি শ্রেণির একনায়কতন্ত্র থাকবে না, নাগরিকদের সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং যে-কোনো রাষ্ট্রীয় পদে নিযুক্ত হবার অধিকার স্বীকৃত হবে। দল গঠনের অধিকার দেওয়া হবে, কমিউনিস্ট পার্টি শাসক দল হিসেবে থাকবে কিন্তু কাজ করবে গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে (it will preserve its status as the ruling party within the framework of a democratic process. It will seek to win votes at the election..... the party does not assume full state powers)।

একইসঙ্গে চলবে দল-কাঠামোর গণতন্ত্রীকরণ। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি পুনর্বিবেচিত হবে, দলের মধ্যে বিতর্ককে গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মানতে বাধ্য করা হবে না। (We should re-think the principle of democratic centralism and no longer treat it in such a way that it can be used to implement barrack-type hierarchical discipline. The CPSU needs genuine democratization in intra-party debates...)

পেরেস্ত্রৈকার মূল কথা ছিল অর্থনৈতিক সংস্কার। বাজার অর্থনীতি (market economy) চালু হবে, প্রতিযোগিতার পরিবেশে রাষ্ট্রক্ষেত্র ও বেসরকারি ক্ষেত্র পাশাপাশি চলবে, আবার নতুন অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে

রচিত হবে কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (central management)। অর্থাৎ পেরেস্ত্রৈকা 'Command Economy'-র সমাপ্তি ঘোষণা করেছিল।

গরবাচভ ও রুশ নেতৃত্ব গ্লাসনস্ত-পেরেস্ত্রৈকাকে পুঁজির সঙ্গে আপোস বলে মানতে চাননি। গরবাচভের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা আগানবেগিয়ান *The Challenge : Economics of Perestroika* বইটিতে স্বীকারই করেননি যে, বাজার পুঁজিবাদের চিহ্ন এবং বাজার ও কমান্ড ইকনমি পরস্পরবিরোধী। তাঁর মতে পুঁজিবাদের আগেও বাজার ছিল, যেমন প্রাচীন গ্রীসে বা রোমে, এবং সমাজতন্ত্রেও বাজার অপরিহার্য। তবে সমাজতান্ত্রিক বাজারে পণ্যচরিত্র (Commodity Character) ভিন্ন ধরনের হবে। এই চরিত্র-অর্জনই পেরেস্ত্রৈকার লক্ষ্য বলে বর্ণনা করেছেন আগানবেগিয়ান। আর একজন লেখক আনাতোলি বুতেনকো লিখেছেন, সমালোচনা-আত্মসমালোচনার সূত্রে গ্লাসনস্ত এবং উৎপাদনে যুক্তস্বত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে পেরেস্ত্রৈকা সমাজতান্ত্রিক নীতিকেই আরও কার্যকর করে তুলতে পারে।

কিন্তু বাস্তবে এই কার্যকারিতা দেখা যায়নি। রুশদের মধ্যে সম্পূর্ণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার লক্ষণই দেখা গিয়েছিল এবং ১৯৯০-এ স্তানিস্লাভ শাতালিনের 'শাতালিন পরিকল্পনা' গ্রহণ করে গরবাচভ সেই প্রবণতাকে মেনে নিয়েছিলেন। গরবাচভ নিজেই তাঁর বইতে ইউরোপের জাতি-শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলে পুঁজিবাদী জাতীয়তাবাদকে মেনে নিয়েছিলেন এবং খ্রিস্টধর্মের জয়গান গেয়েছিলেন। সমাজতন্ত্রকে এইভাবে হেয় করার খুব অল্পদিনের মধ্যে গণতান্ত্রিকতার সুযোগ নিয়ে গরবাচভের নেতৃত্বকেই চ্যালেঞ্জ করেছিলেন সাইবেরিয়ার বরিস ইয়েলৎসিন।

প্রশ্ন

১। গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকা বলতে কি বোঝ ?

২.৭.১.৬ ঃ গরবাচভের শেষ বছর

ইয়েলৎসিনের মোকাবিলা করবার জন গরবাচভ প্রথমদিকে কট্টর গোঁড়া সদস্যদের সঙ্গে রাখতে চেয়েছিলেন। এরা হলেন উপ-রাষ্ট্রপতি গেন্নাদি ইয়ানায়েভ, প্রধানমন্ত্রী ভালেন্তিন পাভলভ্ এবং বিদেশমন্ত্রী এদুয়ার্দ শেভার্দনাদজে। কিন্তু ১৯৯০-তেই শেভার্দনাদজে-র পদত্যাগ আর লিথুয়ানিয়ায় সোভিয়েত বাহিনীর সংঘর্ষ গরবাচভকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। তিনি ইয়েলৎসিনের সঙ্গে সমঝোতা করে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য গণভোটের ডাক দেন। ১৯৯১-এর ১৭ই মার্চের গণভোটে ন'টি প্রজাতন্ত্র ইউনিয়নের পক্ষে সায় দেয়, কিন্তু মোলডাভিয়া, জর্জিয়া, কিরঘিজস্তান এবং তিনটি বাল্টিক রাজ্য, এস্তোনিয়া, লাতভিয়া আর লিথুয়ানিয়া ভোট বয়কট করে ইউনিয়নের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে। এপ্রিলের শেষে গরবাচভ ন'টি প্রজাতন্ত্রের মধ্যে 'Treaty of Union' সম্পাদন করে রুশ ফেডারেশন গঠন করেন, যুক্তরাজ্যের প্রধান হিসেবে তাঁর হাতে থাকে অর্থ, সেনা ও বিদেশনীতি। ঐ বছর জুন মাসে সাধারণ নির্বাচনে

ইয়েলৎসিনের মোকাবিলা করবার জন্য গরবাচভ প্রথমদিকে গোঁড়া সদস্যদের সঙ্গে রাখতে চাইলেও ১৯৯০- এ শেভার্দনাদজের পদত্যাগ আর লিথুয়ানিয়ায় সোভিয়েত বাহিনীর সংঘর্ষ গরবাচভকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। ফলে শেষপর্যন্ত ইয়েলৎসিনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে ১৯৯১- এ গণভোটের সূত্রে Treaty of Union করে রুশ ফেডারেশন তৈরী করতে বাধ্য হয়েছিলেন গরবাচভ।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ইয়েলৎসিন। কিন্তু ইতিমধ্যে গণভোট থেকে বিরত থাকা প্রজাতন্ত্রগুলি পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

প্রশ্ন ১। Treaty of Union কিভাবে গঠিত হয় ?

২.৭.১.৭ ঃ রুশ ফেডারেশন

১৯৯১-এর এপ্রিলে গরবাচভ যে ন'টি প্রজাতন্ত্রকে নিয়ে রুশ ফেডারেশন গড়েছিলেন, তা আসলে ছিল তাঁর এবং তাঁর গোষ্ঠীর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার মরিয়া চেষ্টা। জাতিগত বহুজনীনতার মধ্যে যে এতদিন সোভিয়েত রাষ্ট্রসংঘ টিকে ছিল, তার কারণ ছিল সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংহতি (political integration by socialism)। গ্লাসনস্ত, পেরেস্ত্রৈকা আর উসকোরিনি-র (uskarenie-বিকাশের গতিবৃদ্ধি) ঘোষণা সেই সংহতির গোড়ায় আঘাত হেনেছিল। ফলে সোভিয়েত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ জাতিসমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। এই সময়েই সমাজতান্ত্রিকতার বাইরে থেকে সংহতি রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন গরবাচভ ফেডারেশনের মাধ্যমে।

১৯৯১ এর এপ্রিলে গরবাচভ যে নটি প্রজাতন্ত্রকে নিয়ে রুশ ফেডারেশন গড়েছিলেন, তা আসলে ছিল তাঁর এবং তাঁর গোষ্ঠীর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার মরিয়া চেষ্টা।

সোভিয়েত দেশের জাতিবৈচিত্র্য ছিল বিস্ময়কর। জার্মান, পোল-গ্রিক এবং কোরীয় গোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ২২। ১০৪টি জেলায় তারা ছড়িয়ে ছিল, এই তথ্য ১৯৭৯-র আদমশুমারিতে পাওয়া। স্লাভ সম্প্রদায়ের প্রধান গোষ্ঠী ছিল তিনটি, ১৪.৫২ কোটি রুশ, ৪.৪২ কোটি উক্রেনীয় আর ১ কোটি বেলারুস। এছাড়াও ছিল নানা-জাতি-উপজাতি। ককেশীয় এলাকার জর্জিয়ার সত্তর শতাংশ আদি বাসিন্দা; আজারবাইজান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান বা কাজাখস্তানের মুসলিমরা তো ছিলই। সোভিয়েত গণরাজ্যে স্বেচ্ছাভুক্তি বা স্বেচ্ছাবিচ্ছেদের অধিকারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এইসব নানা জাতি-উপজাতিকে আশ্বস্ত করেছিলেন লেনিন, কিন্তু স্তালিনের রুশীকরণ বা স্তালিনাইজেশন প্রক্রিয়া তাদের পছন্দ হয়নি। তবু সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতায় তারা মোহগ্রস্ত ছিল, সেই মোহ কাটতে শুরু করে ক্রুশ্চেভের আমল থেকে, চূড়ান্ত স্বপ্নভঙ্গ হয় গরবাচভের সময়ে। ফলে একদলীয় বাধক রাষ্ট্র তাদের কাছে অসহ্য মনে হয়, গণপ্রতিনিধিসভার (Congress of Peoples Deputies) ক্ষমতা বাড়তে থাকে, উদার গণতন্ত্রীদের অনেক বেশি গ্রহণীয় মনে হতে থাকে, জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন পরিবর্তনপন্থী বরিস ইয়েলৎসিন। এই অবস্থায়, বিশেষত উক্রাইন, এস্তোনিয়া, লাতভিয়া, লিথুয়ানিয়া, বেলারুস, মোলডাভয়া এবং জর্জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার পর, ইয়েলৎসিনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে ১৯৯১-এ গণভোটের সূত্রে Treaty of Union করে রুশ ফেডারেশন তৈরি করতে বাধ্য হয়েছিলেন গরবাচভ।

গরবাচভের পতনের পর আর ক্ষমতা ফিরে পাননি, ফলে রুশ ফেডারেশনের সর্বময় কর্তা হয়ে বসেন ইয়েলৎসিন।

২.৭.১.৮ ঃ সোভিয়েতের ভাঙ্গন

কিন্তু সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ভাঙ্গন ঠেকানোর কোনো পথ আর ছিল না। ১৯৯১-এর আগস্টে, প্রচণ্ড অর্থসংকটের মধ্যে, গরবাচভ যখন ছুটি কাটাতে ক্রিমিয়ায়, মস্কোয় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাশিয়ার ক্ষমতা কেড়ে

নেয় গরবাচভ-বিরোধী গোষ্ঠী, তা তুলে দেওয়া হয় ইয়ানায়েভের হাতে। ইয়েলৎসিন ইয়ানায়েভের বিরোধিতা করেন, অভ্যুত্থানের নিন্দা করেন এবং গরবাচভের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষার কথা বলেন। কিন্তু গরবাচভ আর ক্ষমতা ফিরে পাননি, রুশ ফেডারেশনের সর্বময় কর্তা হয়ে বসেন ইয়েলৎসিন। ২৪ আগস্ট গরবাচভ কমিউনিস্ট পার্টির প্রধানের পদ ত্যাগ করেন। বাল্টিক রাজ্যগুলোর মতো উক্রাইন (ইউক্রেন), বেলারুস স্বাধীনতা ঘোষণা করে, এরপর অন্য সব প্রজাতন্ত্রই একের পর এক স্বাধীনতা ঘোষণা করতে থাকে। ১৯৯১-এর একেবারে শেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পূর্ণ ভেঙ্গে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন ইয়েলৎসিন। কাজাখস্তানের রাজধানী আলমা আটায় Commonwealth of Independent States প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করা হয়। এতে যোগ দেয় বারোটি সাবেক সোভিয়েত অঙ্গরাজ্য ঃ রাশিয়া, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বেলারুস, কাজাখস্তান, কিরঘিজস্তান, মোলডাভিয়া, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উক্রাইন এবং উজবেকিস্তান। তিনটি বাল্টিক রাষ্ট্র, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া ও লাতভিয়া এর বাইরে থেকে যায়। প্রাক-বিপ্লব রুশ পতাকা উড়তে থাকে ক্রেমলিনের সদর দপ্তরে। শুধু পূর্বতন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলো নয়, খোদ রাশিয়াও অর্থের জন্য হাত পাতে জার্মানির কাছে, আন্তর্জাতিক অর্থ-তহবিলের (IMF) কাছে। এক বিরক্ত রুশ বুদ্ধিজীবী মন্তব্য করেন 'as long as we pretend that we are carrying through reforms, the West will pretend to help us.'।

প্রশ্ন

১। গরবাচভ কিভাবে ক্ষমতাচ্যুত হন ?

২.৭.১.৯ ঃ ভাঙ্গনের পর ঃ পূর্ব ইউরোপ

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গন, পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে সমাজতন্ত্রের প্রত্যাখ্যান আর পূর্ব জার্মানিতে কমিউনিস্ট কর্তৃত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে জার্মানির দ্বিতীয় ঐক্যায়ন— এসবই প্রায়-সমান্তরাল ঘটনা। স্বাভাবিকভাবেই একে সোভিয়েতের ভাঙ্গনের প্রভাব বা ফল হিসেবে দেখানোর একটা ঝোঁক অনেকের আছে। কিন্তু ব্যাপারটা এতটা সরলরৈখিক নয়। পূর্ব-ইউরোপের পরিবর্তন ছিল একটি বৃহত্তর আর্থ-রাজনৈতিক পালাবদলের ফল, সোভিয়েত রাশিয়া নিজেও সেই ফলই ভুগেছিল।

সোভিয়েতের ভাঙন, পূর্ব ইউরোপের পরিবর্তন ছিল একটি বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক পালাবদলের ফল, সোভিয়েত রাশিয়া নিজেও সেই ফলই ভুগেছিল। পাশাপাশি পচন ধরেছিল চীন সমাজতন্ত্রেও।

স্তালিনের আমলে পূর্ব ইউরোপের যে সোভিয়েতীকরণ হয়েছিল, তার কার্যকর সূত্র ছিল তিনটি। এক, সোভিয়েতের তরফে পূর্ব ইউরোপের রাজ্যগুলোকে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য। দুই, ঐ সব রাজ্যের সরকারি কাঠামোয় সোভিয়েত অনুগত রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্রাধান্য অর্জন এবং তিন ওয়ারশ চুক্তি। এমন নয় যে, কমিউনিস্ট আদর্শের কোনো শক্ত বাস্তব ভিত্তি এখানে গড়ে উঠেছিল। সুতরাং যতদিন সোভিয়েতের অর্থ ও প্রতিপত্তি ছিল, ততদিন পূর্ব ইউরোপ ছিল সোভিয়েতমুখী। এই রুশমুখীনতায় ভাটা পড়েছিল সোভিয়েতের ভাঙ্গনের অনেক আগে থেকেই। সোভিয়েতের ভাঙ্গনের পর তা অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে যায়।

ক্রুশ্চেভের নিস্তালিনীকরণ আর ব্রেজনেভের সম্প্রসারণের সময় থেকেই খোদ রাশিয়াতে যেমন একটু একটু করে সমাজতন্ত্রে ধস নামছিল, তেমনি পূর্ব ইউরোপেও জারি হয়েছিল প্রতিবিপ্লবী প্রক্রিয়া। ১৯৮০-র দশকে রাশিয়া নিজেই অর্থসংকটে জর্জরিত ছিল। তার কাছে পূর্ব ইউরোপের আর কিছু পাওয়ার ছিল না। পুঁজিবাদী দুনিয়ার সহযোগিতাই তখন ছিল একমাত্র বাস্তব বিকল্প। ফলে মার্কিন মদতপুষ্ট পশ্চিমী সংস্থাগুলো থেকে কোটি কোটি ডলার ধার করেছিল পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো। এরপরে সমাজতন্ত্রের প্রতি তাদের বিশ্বস্ততা আশা করা কঠিন।

প্রশ্ন

১। সোভিয়েতের ভাঙনের পর পূর্ব ইউরোপে কী প্রভাব পড়েছিল ?

২.৭.১.১০ ঃ চীনা সমাজতন্ত্রের পতন

পতন যে শুধু সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রের হয়েছিল, তা নয়। পচন ধরেছিল চীনা সমাজতন্ত্রেও। এটা ঠিক যে, ১৯৪৯ সালে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বাধীন চীন প্রায় দু-দশক পর্যন্ত নির্দিষ্ট মার্কসবাদী পথেই স্থির ছিল। কিন্তু ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে চীনের সমাজতন্ত্রেও কয়েকটি জটিল সমস্যা দেখা দেয়, যার ফলে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর অবক্ষয় শুরু হয়। কিন্তু এই অবক্ষয়ের সঙ্গে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের পার্থক্য ছিল। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র নানা সমস্যা সত্ত্বেও তুলনায় বেশিদিন টিকে ছিল। কিন্তু চীনা সমাজতন্ত্রের কার্যকাল ততদিন ছিল না। যে চীন ১৯৫৫-৫৬ সালের নিস্তালিনীকরণকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিল এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রকে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী আখ্যা দিয়েছিল, সেই চীন নিজেই এক দশকের মধ্যে তার পথ পরিবর্তন করেছিল। তবে সোভিয়েতরাষ্ট্র যেমন প্রকাশ্যে পুঁজিবাদী পথ ধরে ভাঙনের পথে এগিয়ে গিয়েছিল এবং তার প্রভাব পড়েছিল পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির উপর, চীনা সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে এরকম কোন রাজনৈতিক ঘটনা দেখা যায় না। এমনকি এখনও পর্যন্ত চীন প্রকাশ্যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবেই স্বীকৃত।

তবে বাহ্যত যতই সমাজতন্ত্রের কথা বলা হোক না কেন, চীনা সমাজতন্ত্রেরও যে পতন ঘটেছে তা এখন একটা সম্পূর্ণ স্বীকৃত ঘটনা। মাও-সে-তুং-এর পরবর্তী সময়ে দেং জিয়াও পিং-এর সংস্কারের হাত ধরেই যে চীনা সমাজতন্ত্রের পতনের শুরু তা নয়, মাও-সে-তুং-এর বেঁচে থাকার সময়েই-এর সূচনা হয়েছিল এবং তার গতিরোধ করা মাও-সে-তুং-এর পক্ষেও সম্ভব হয়নি। সুতরাং সমাজতন্ত্রের পথ থেকে চীনের বিচ্যুতির একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে যেমন পররাষ্ট্রীয় প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, চীনের ক্ষেত্রে কিন্তু এই পররাষ্ট্রীয় প্রভাব তত গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বরং বলা যেতে পারে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অর্ন্তদ্বন্দ্ব এই সমাজতান্ত্রিক বিচ্যুতির জন্য প্রধানত দায়ী ছিল।

২.৭.১.১১ ঃ অবক্ষয়ের কারণ

১৯৪৯ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ হওয়ার পর ১৯৫২ সালের মধ্যে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি চীনের ভূমি সংস্কার সম্পূর্ণ করে সামন্ত কাঠামোর অবসান ঘটাতে পেরেছিল। মাও-সে-তুং ১৯৬০ সালের মধ্যে শিল্প এবং কৃষিতে তাঁর "Great Leap Forward" আন্দোলনের প্রথম পর্ব শেষ করতে পেরেছিলেন, সমবায় ভিত্তিতে কৃষি উৎপাদন সম্ভব হয়েছিল, গণ-কমিউনিস্ট এবং গণ ফৌজ নির্মাণ শেষ হয়েছিল এবং যে চীন ইস্পাত ছাড়া আর সবক্ষেত্রেই শিল্পের জন্য অন্য রাজ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল, সেই চীন শিল্পে স্বাবলম্বী হওয়ার পথে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবুও মাও-সে-তুং সমাজতন্ত্রকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিতে পারেননি।

মাও-সে-তুং - এর নেতৃত্বে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ভূমি-সংস্কার ও শিল্পকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গেলেও তারা সমাজতন্ত্রকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিতে পারেনি।

এর জন্য প্রধানত দায়ী ছিল চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দুটি পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠীর আবির্ভাব। একটি লিও-শাও-চির পথ বদল করা দক্ষিণ পন্থী গোষ্ঠী, এবং আর একটি হল লিন পিয়াও এর বামপন্থী সুবিধাভোগী গোষ্ঠী। প্রথম গোষ্ঠীর লক্ষ্য ছিল পুঁজি নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করা। এবং দ্বিতীয় গোষ্ঠীর লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বজায় রাখার স্বার্থে সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের ব্যবহার। মাও-সে-তুংকে ১৯৬০-এর দশক থেকেই এই দুই গোষ্ঠীর সমাজতান্ত্রিক বিচ্যুতির প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল। এই লড়াইয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত সফল হননি।

২.৭.১.১২ ঃ সাংস্কৃতিক বিপ্লব

১৯৬০-এর দশকে মাও-সে-তুং সমাজতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার জন্য যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু করেছিলেন, তার ভিত্তি ছিল "অব্যাহত বিপ্লবের তত্ত্ব"। মাও-সে-তুং-এর মনে হয়েছিল যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার পর অর্থনৈতিক সংস্কারের সূত্রে যে গোষ্ঠীটি নেতৃত্বে অভিষিক্ত হয়েছিল— সেই গোষ্ঠীর মধ্যেই শোষক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য দেখা দেওয়া অসম্ভব নয়, সুতরাং এই প্রবণতাকে রোধ করার জন্যেই বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াকে চালু রাখা দরকার। অব্যাহত বিপ্লব বলতে মাও-সে-তুং এই প্রক্রিয়াটিকেই বুঝিয়েছিলেন। তিনি যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন, তার প্রধান লক্ষ্য ছিল চারটি। প্রথমতঃ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গণবিরোধী দিকগুলিকে উদ্‌ঘাটিত করা। দ্বিতীয়তঃ, পুঁজিবাদী প্রবণতার পুনরাবির্ভাবকে ঠেকানো। তৃতীয়তঃ সমাজের নিচু স্তর থেকে উঁচু স্তরকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং চতুর্থতঃ বামপন্থী সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর সংকীর্ণতাকে ধ্বংস করা। কিন্তু যে যুবগোষ্ঠীর সাহায্যে মাও-সে-তুং এই সব কাজ সম্পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন, সেই যুবগোষ্ঠীই ক্রমশঃ নৈরাজ্যবাদী হয়ে ওঠায় মাও-সে-তুং আন্দোলনের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং তার আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। ফলে রাশিয়ার মতো চীনেও সংশোধনবাদী এবং মাও বিরোধী নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চীনা সমাজতন্ত্রের অবক্ষয় শুরু হয়।

প্রশ্ন

১। সাংস্কৃতিক বিপ্লবে মাও-সে-তুং - এর প্রধান লক্ষ্য কি ছিল ?

২.৭.১.১৩ ঃ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সমালোচনা

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কুফলের সুযোগে মাও পরবর্তী চীনা নেতৃত্ব মাও-সে-তুংকে ক্ষমতাহীন করে দেয়, এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দশ বছরকে "বিপর্যয়কর দশক" হিসেবে চিহ্নিত করে। মাও পরবর্তী নেতৃত্ব সমাজতান্ত্রিক নীতিরও ব্যাখা পরিবর্তন করেন। লেনিন একসময় বলেছিলেন যে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও পুঁজিবাদী প্রবণতা থাকে এবং সেই কারণে বিপ্লবের পরেও পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। কিন্তু মাও পরবর্তী চীনা নেতৃত্ব ঘোষণা করেন যে, লেনিনের এই বক্তব্য প্রস্তুত হয়েছিল রুশ বিপ্লবেরও আগে। সুতরাং বিপ্লব পরবর্তী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই বক্তব্য আর প্রযোজ্য নয়। পরবর্তী চীনা নেতৃত্বের মতে, বিপ্লব পরবর্তী চীনে পুঁজিবাদী প্রবণতা থাকলেও পুঁজিবাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বই সমাজের প্রধান দ্বন্দ্ব নয়। কেননা বিপ্লব সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চীনে শ্রেণি হিসেবে শোষকদের অবলুপ্তি ঘটেছে। অর্থাৎ প্রকাশ্যে নিস্তালিনীকরণের মতো কোন তত্ত্ব হাজির না করলেও চীনা নেতৃত্ব আসলে প্রকারান্তরে রাশিয়ার মতোই সমাজতান্ত্রিক পথ পরিবর্তন করতে শুরু করে। রুশ নিস্তালিনীকরণের আন্তর্জাতিক প্রভাব সম্পর্কে চীনা নেতৃত্ব অত্যন্ত সচেতন ছিল। সেই কারণে তত্ত্বগতভাবে মাও-সে-তুংকে অগ্রাহ্য করেনি। কিন্তু বাস্তব নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ১৯৭০-এর দশকেই মাও-সে-তুং-এর নীতিকে তারা অকার্যকর করে দিয়েছিল।

> ***পরবর্তী চীনা নেতৃত্বের মতে, বিপ্লব পরবর্তী চীনে পুঁজিবাদী প্রবণতা থাকলেও পুঁজিবাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বই সমাজের প্রধান দ্বন্দ্ব ছিল না। অর্থাৎ প্রকাশ্য নিস্তালিনীকরণের মতো কোন তত্ত্ব হাজির না করলেও চীনা নেতৃত্ব আসলে প্রকারান্তরে রাশিয়ার মতোই সমাজতান্ত্রিক পথ পরিবর্তন করতে শুরু করে।***

মাও-সে-তুং এর মৃত্যু হয়েছিল ১৯৭৬ সালে। ইতিমধ্যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বাড়াবাড়ির ফলে চীনা সমাজের বেশ কয়েকটি শ্রেণীর কাছে মাও-সে-তুং তাঁর জনপ্রিয়তা হারিয়েছিলেন। তারই সুযোগ গ্রহণ করেছিল মাও বিরোধী চীনা নেতৃত্ব। ১৯৭৭ সালে একাদশতম চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে যে দেং জিয়াও পিংকে একসময়ে মাও-সে-তুং তীব্র সমালোচনার লক্ষ্য করেছিলেন, সেই দেং জিয়াও পিং-নেতৃত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন। ১৯৭৯-১৯৮০ সালে নেতৃত্বে ফিরে এসে লিও শাও চি এ বছরেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পুনর্মূল্যায়নের দাবী তোলেন। ১৯৮১ সালে সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে একটি ভুল এবং বিপদগামী আন্দোলন বলে সমালোচনা করা হয়। ১৯৮২ সালের ২৫শে জানুয়ারি বেইজিং রিভ্যু পত্রিকায় মাও-সে-তুং এর 'ইয়েনান' তত্ত্বকে খারিজ করা হয়। মাও-সে-তুং এই তত্ত্বে বলেছিলেন যে, বিপ্লবের পরেও মানুষের সামাজিক শ্রেণিচরিত্র সম্পূর্ণ বদলায় না। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরেও শ্রেণিচরিত্র অব্যাহত থাকে। কিন্তু মাও পরবর্তী চীনা নেতৃত্ব মাও-সে-তুং-এর এই বক্তব্যকে বর্জন করেন এবং শ্রেণিদ্বন্দ্বকে প্রধান দ্বন্দ্ব হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। ফলে চীনে আবার সামন্ত ও পুঁজিবাদী প্রবণতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

মাও-সে-তুং-এর ঘনিষ্ঠ অনুগামী কমিউনিস্ট নেতা চৌ-এন-লাই-এর করা একটি সমীক্ষা থেকে এই প্রবণতা স্পষ্টভাবে বোঝা গিয়েছিল। ১৯৬০-এর দশকে চীনের শহরাঞ্চলে কয়েকটি মাত্র ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর হাতে প্রায় এক কোটি টাকা সুদ জমেছিল। এবং ঐ সময়ে চীনের গ্রামাঞ্চলে প্রায় চার কোটি টাকা ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের খোঁজ পাওয়া

গিয়েছিল। অবশ্য পুরানো অর্থনীতির সামন্ত জমিদার অথবা সামন্ত ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর উত্তরসূরিদের হাতেই সঞ্চিত হয়েছিল এই অর্থ। এছাড়াও কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন ক্ষমতাশালী নেতা এবং গণ-কমিউনের নিয়ন্ত্রকদের মধ্যেও পুঁজিবাদী প্রবণতা দেখা দিয়েছিল বলে চৌ-এন লাই মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু মাও পরবর্তী নেতৃত্ব এই প্রবণতাগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব ছিল। এবং মাও এর বিরোধী তাত্ত্বিকদের ক্ষমতায় ফিরিয়ে এনে এমন ধরনের সংস্কার কর্মসূচী হাতে নিয়েছিল যা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে ক্রমশ দুর্বল করে দিয়েছিল।

প্রশ্ন ১। চীনের পুঁজিবাদী প্রবণতার সঙ্গে রাশিয়া বা পশ্চিমের পুঁজিবাদী প্রবণতার পার্থক্য কি ছিল ?

অবশ্য চীনের এই পুঁজিবাদী প্রবণতার সঙ্গে রাশিয়া বা পশ্চিমের পুঁজিবাদী প্রবণতার পার্থক্য ছিল। ১৯৭০-এর দশকে চীনের অর্থনীতিকে উৎপাদনমুখী করে তোলার তাগিদে যেসব অর্থনৈতিক সংস্কার করা হয়েছিল সেগুলি গর্বাচভের পেরেস্ত্রৈকার সঙ্গে তুলনীয় নয়, চীনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ বজায় রেখেই উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগের জায়গা করে দেওয়া হয়েছিল। প্রথম পর্বে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল চারটি ক্ষেত্রকে। যেমন, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে। সেইকারণে সংস্কার কর্মসূচীকে বলা হয়েছিল 'চতুর্মুখী আধুনিকীকরণ পরিকল্পনা।" পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য এই সংস্কার কর্মসূচীর নামকরণ করা হয় 'সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণ'। অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ্‌রা এই বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই মাও পরবর্তী চীন সম্পর্কে "এক দেশ, দুই ব্যবস্থা" বিশেষণটি প্রয়োগ 'করেছেন। চীনে এই সময়ে গণ কমিউনগুলির পরিবর্তে ব্যক্তি পরিবারকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং রাষ্ট্রের সর্বব্যাপিতা স্বীকার করেও কৃষি ও শিল্প উভয়ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অধিকারকে মেনে নেওয়া হয়েছিল।

উইলিয়াম হিন্টন চীনের উৎপাদনমুখী এই সংস্কার কর্মসূচীতে ভবিষ্যৎ উন্নয়নের একটি বিশেষ রূপরেখা দেখতে পেয়েছেন। তবে একই সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে রাশিয়ার ক্ষেত্রে যেমন বলা হয় যে, বাজার অর্থনীতিকে স্বীকার করে নেওয়া মানেই পুঁজিবাদের সঙ্গে আপোষ নয় এবং তা সত্ত্বেও যেমন রাশিয়াতে পুঁজিবাদী প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, তেমনি চীনের ক্ষেত্রেও বাজারের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও পুঁজিবাদের প্রভাব অনিবার্য। অবশ্য উনিশ শতকের এবং কুড়ি শতকের পশ্চিমী পুঁজিবাদের সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে সমাজতন্ত্রের আঙ্গিক যেমন পরিবর্তিত হতে পারে, পুঁজিবাদের ধরণও তেমন অবস্থান ভেদে ভিন্ন রকমের হতে পারে। তাই যেভাবেই দেখানো হোক না কেন চীনে মাও পরবর্তীকালের সংস্কার যে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোকে দুর্বল করে পুঁজিবাদী কাঠামোকে নিশ্চিত করেছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কুড়ি শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এশিয়ার রাজনীতিতে চীনা পুঁজির অনুপ্রবেশের জন্য চীন সরকারের তৎপরতা থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

২.৭.১.১৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

অলক কুমার ঘোষ ঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব, ১৮৭০-২০০৬

Eric Hobsbawm : The Age of Extremes

Archie Brown : The Gorbachev Factor

F. L. Allen : The Big Change

A. K. Ghosh : Globalization

২.৭.১.১৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতন ঘটেছিল কেন? পূর্ব ইউরোপে এর কী প্রভাব পড়েছিল?

২। চীনের 'এক দেশ দুই ব্যবস্থা'র পরিণতি কী হয়েছিল?

৩। গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

৪। রুশ ফেডারেশন কীভাবে গড়ে উঠেছিল? এর দুর্বলতা কোথায় ছিল?

পর্যায় গ্রন্থ - ৭
সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার পতন ও ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসান
Disintegration of Socialist Block and end of Cold War

একক - ২
Socialism in Decline, Globalization and its Economic and Political Impact

বিন্যাস ক্রম ঃ

২.৭.২.১ ঃ এক মেরু পৃথিবী

২.৭.২.২ ঃ বিশ্বায়ন

২.৭.২.৩ ঃ বিশ্বায়নের প্রস্তুতি ও পরিণতি

২.৭.২.৪ ঃ বিশ্বায়ন ও সমাজ-সংস্কৃতি

২.৭.২.৫ ঃ সারসংক্ষেপ

২.৭.২.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

২.৭.২.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

২.৭.২.১ ঃ এক মেরু পৃথিবী

একদিকে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র আর অন্যদিকে চীনা রাষ্ট্রকাঠামো, এই দুইয়ের অবক্ষয় মার্কিন রাষ্ট্রের সামনে একক আধিপত্যের পথ খুলে দেয়। ফলে তৈরি হয় একমেরু বিশ্বব্যবস্থার সম্ভাবনা।

১৯৯১-এর জানুয়ারিতে মার্কিন হোয়াইট হাউস নয়া আন্তঃরাষ্ট্রব্যবস্থার (New International Order) যে ছবি আঁকে, তা প্রথম ধাক্কাতেই আন্তর্জাতিক সমঝোতার সব সম্ভাবনা নষ্ট করে দেয়। মার্কিন মুখপাত্রের কথায়, এই নতুন ব্যবস্থায় কোনো বোঝাপড়া নয়, স্বত্বক্ষমতাকামী ছোট কিম্বা বড় অথচ দুর্বল রাষ্ট্রের ওপর নজরদারিই হবে মার্কিন নীতির মূল লক্ষ্য। এরপর রাষ্ট্রসংঘের সক্রিয়তার কোনো প্রশ্নই আর ছিল না। বাঁধা গণ্ডির মধ্যে থেকে মার্কিন সিদ্ধান্তের বৈধতা নির্মাণই যে তার একমাত্র কাজ, সেটা স্পষ্ট হয়ে যায় 'কুয়েত-হন্তা' ইরাকের শাস্তিদান যজ্ঞে মার্কিনি ঔদ্ধত্য প্রকাশের মধ্যে। সুতরাং বাকি থাকে শুধু একমেরুত্বের সম্ভাবনাটি।

একদিকে সোভিয়েত সমাজতন্ত্র আর অন্যদিকে চীনা রাষ্ট্রকাঠামো, এই দুইয়ের অবক্ষয় মার্কিন রাষ্ট্রের সমান একক আধিপত্যের পথ খুলে দেয়। এর ফলে তৈরী হয় এক মেরু বিশ্বব্যবস্থার সম্ভাবনা। কিন্তু সত্যি সত্যিই আমেরিকা স্বনিয়ন্ত্রিত একমেরু বিশ্ব গড়ে তুলতে পেরেছিল কিনা, এ নিয়ে বিতর্ক আছে।

সত্যি সত্যিই আমেরিকা স্বনিয়ন্ত্রিত একমেরু বিশ্ব গড়ে তুলতে পেরেছিল কিনা, এই বিতর্কে অবশ্য দুটো মত আছে। একদল পণ্ডিত মার্কিন একমেরুকরণকে স্বীকার করেন না। 'ক্ষমতা' ও 'আধিপত্য' তাদের কাছে দুটো বহুমাত্রিক শব্দ। শুধু সামরিক শক্তি দিয়ে তার ব্যাখ্যা চলে না। কুড়ি শতকের শেষ দুই দশকের হিসেবে, আমেরিকা হল পৃথিবীর বৃহত্তম ঋণী রাষ্ট্র, তার বাজেট ঘাটতি আর বাণিজ্যিক সংকট তখন ভয়াবহ। বিল ক্লিন্টন ও জুনিয়র জর্জ বুশের জমানায় অবস্থার সামান্য গতিকফের ঘটলেও অর্থনীতিতে মার্কিনিরা জার্মান বা জাপানিদের থেকে অনেক পিছিয়ে, ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর তুলনায় আমেরিকা অনেক দুর্বল। এমনকি চীনও তখন প্রায় তাকে ছাপিয়ে যায়। মার্কিন অর্থনীতিবিদ ফ্রেড বার্জস্টান (Fred Bergsten)- এর কথায়, তখন আমেরিকা "caught in a scissors movement between increasing dependence on external economic forces and a shrinking capacity to influence the factors."।

বার্জস্টানের মন্তব্য অবহেলা করবার মতো নয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (World Trade Organization) সভায় কৃষিপণ্যের ভর্তুকির প্রশ্নে তীব্র ইঙ্গ-মার্কিন বিবাদ মার্কিন একাধিপত্যের ধারণাকে অবশ্যই চ্যালেঞ্জ করে। ভারতের মতো গরিব দেশও সম্প্রতি ওই প্রশ্নে মার্কিনিদের বিরুদ্ধে মত দিয়েছে। জাপান তার বাজার সবরকমের মার্কিন পণ্যের জন্য খুলে দেয়নি। চীনকে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত দেশের মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে মার্কিন দ্বিধার উত্তরে চীনও তাকে পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়েছে। অনেকে একে বলেন অর্থনৈতিক যুদ্ধ (economic warfare)।

এই যে মার্কিন রাষ্ট্রের দিকেও চোখ পাকানোর ক্ষমতা কোনো রাষ্ট্র রাখে, এটাই তো একমেরুকরণের তত্ত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে দেয়। 'Pentagon capitalism' এর অন্যতম ব্যক্তিত্ব হেনরি কিসিঞ্জারের মনেও এই প্রশ্ন ছিল। তাই তিনি বলেছিলেন, "Peace requires hegemony or balance of Power. We have neither the resources nor the strength for the former."। স্বাভাবিকভাবেই অনেকে দুই মেরুর অবসানের পর বহুমেরুত্বের উদ্ভবের ওপর জোর দেন। একদিকে সংযুক্ত জার্মানিকে নিয়ে ইউরো-মুদ্রার ইউরোপ, আর অন্যদিকে চীন-জাপানের প্রাচ্য-কর্তৃত্ব, এগুলোই বহুমেরুত্বের ভিত্তি বলে তাঁরা মনে করেন।

কিন্তু তবুও একমেরু রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষে একটা বড় যুক্তি থেকে যায়। সেটা হল সামরিক দৃষ্টিকোণের যুক্তি। অর্থনৈতিক দিক থেকে জার্মানি বা ইউরোপ এগিয়ে থাকলেও, মার্কিন সামরিক ক্ষমতার ধারে কাছে তারা আসতে পারে না, আসতে চেষ্টাও করে না। ভিয়েতনামের প্রসঙ্গ বাদ দিলে দ্যাঁতাতের পর গোটা বিশ্বে একটানা সামরিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার সাফল্য একমাত্র আমেরিকার, আর কারো নয়। বছরে গড়ে প্রায় ৩৭০০ কোটি ডলার মোট জাতীয় আয়ের প্রায় ৩.১ শতাংশ মার্কিনিরা সামরিক খাতে খরচ করে। পৃথিবীর সব গোলমেলে জায়গাতেই তাদের সেনা-ঘাঁটি। তার ওপর আমেরিকার উন্নত শিল্প ও তথ্য প্রযুক্তি, গোয়েন্দা বাহিনীর সর্বত্রগামিতা, মেধাসম্পদ আকর্ষণের ক্ষমতা এবং আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের বড়ো অংশীদারত্ব। সমাজতন্ত্রচ্যুত রুশ নেতৃত্ব এখন মার্কিনিদের কথাতেই চলে, জি-৭ রাষ্ট্রজোটে ঢোকার জন্য তার মার্কিন-খোসামোদের অন্ত ছিল না, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো তো ন্যাটোর সদস্য হতে পেরে কৃতার্থ বোধ করে।

সুতরাং, গ্রামশ্চি যাকে 'hegemony' বলেছেন, তা না থাকলেও, গোটা বিশ্বেই যে মার্কিন সুপার পাওয়ার-এর প্রতিষ্ঠা আছে, তা না মেনে উপায় নেই। সেদিক থেকে দ্যঁতাতের পরের পৃথিবীতে একমেরুকরণ হয়েছিল, একথা নিশ্চয়ই বলা যায়। কিন্তু সেইসঙ্গে উঠে আসে আর একটি প্রশ্ন। তা হল, বহুমেরুত্বই যদি বিশ্বব্যবস্থায় না থাকে, তাহলে রাষ্ট্রসংঘের মতো একটি বহুজাতিক সংগঠনের কার্যকরতা কতটা থাকতে পারে বা থাকবে।

প্রশ্ন

১। একমেরু বিশ্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিতর্ক দুটি কি ?

২.৭.২.২ ঃ বিশ্বায়ন

মার্কিন একমেরুত্ব গড়ে উঠেছিল সামরিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ওপর। কিন্তু কুড়ি শতকের শেষে একটি অর্থনৈতিক ভোগ্যপণ্যবাদী একমেরুত্বেরও আবির্ভাব ঘটেছিল। এর পোশাকী নাম দেওয়া হয়েছিল Globalization বা বিশ্বায়ন। ব্যাখ্যা করে একে বলা যায় 'Economic Integration of the World.'

প্রশ্ন

১। কিভাবে বিশ্বায়ন গড়ে উঠেছিল ?

২.৭.২.৩ ঃ বিশ্বায়নের প্রস্তুতি ও পরিণতি

একদিনে হঠাৎ এই বিশ্বায়নের প্রসঙ্গ আসেনি। একদিকে হায়েক তাঁর *The Road to Serfdom* বইতে যে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণহীন সর্বশক্তিমান অর্থনৈতিক সমাজের কথা বলেছিলেন, তার নমনীয়তা, অন্যদিকে পল সুইজি যে *বিপ্লবোত্তর সমাজ*-এর ছবি এঁকেছিলেন, তার নমনীয়তা, আর তৃতীয় পক্ষে নোয়ম চমস্কি *Deterring Democracy* বইতে যে সমাজতান্ত্রিক সমঝোতার কথা ভেবেছিলেন তার বাস্তবতা— এই তিন-এর পারস্পরিক লেনদেনই সম্ভবত বিশ্বায়নের ধারণাকে দানা বাঁধতে সাহায্য করেছে। ১৯৬০-৮০-র দশক ছিল Convergence theory বা 'বৈপরীত্যের মিলন'-তত্ত্বের যুগ। ধনতান্ত্রিক দেশগুলো তখন মিশ্র অর্থনীতি, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রতত্ত্ব আর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের পথে হেঁটেছে। আবার সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোও নজর রাখতে শুরু করেছে বাজার অর্থনীতির দিকে। *End of Ideology*-র লেখক ড্যানিয়েল বেল যে দুই বিরোধী শিবিরের নিঃশব্দ বোঝাপড়ার আভাস দিয়েছিলেন, তাই হয়তো

কুড়ি শতকের শেষে একটি অর্থনৈতিক ভোগ্যপণ্যবাদী এক মেরুত্বের আবির্ভাব ঘটেছিল। এর পোশাকী নাম দেওয়া হয়েছিল Globalization বা বিশ্বায়ন।

ঘটেছে তখন। দুই মার্কিন অর্থনীতিবিদ কার্ল ও মিনস-এর সমীক্ষার ভিত্তিতে বার্নহ্যাম তখন 'ম্যানেজেরিয়াল তত্ত্ব'-এর দিকে ঝুঁকেছিলেন। জাতীয় কোম্পানিগুলো 'ম্যানেজেরিয়াল এফিসিয়েন্সি'র ওপর ভর করে পুঁজির ঘনত্ব বাড়াবে, একই ভঙ্গিতে তা ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দুই শিবিরেই ঘটবে, এই ছিল পরিকল্পনা। 'ম্যানেজেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট'-এর অন্যতম হাতিয়ার হবে টেকনোক্রাটরা, যাদের গলব্রেথ বলেছিলেন 'Countervailing Power'। টেকনোক্র্যাটদের ভোগ্যপণ্যপ্রযুক্তি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা আর রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষণার ওপর ভর করে যখন জাতীয় সীমানা ভেঙে বহুজাতিকতায় অভিষিক্ত হয়, তখন ঘটে পুঁজির বিশ্বায়ন। ঘটে পুঁজির একরূপীকরণ। ইতিহাসের যে সমাপ্তির কথা ফুকুয়ামা বলেছিলেন, সম্ভবত সেই সমাপ্তিকে তিনি বিশ্বায়িত ভোগ্যপণ্য - সংস্কৃতির একরূপত্বের কাছে বহুমুখী অর্থনীতির নতিস্বীকারের সমার্থক বলে ভেবেছিলেন।

২.৭.২.৪ ঃ বিশ্বায়ন ও সমাজ-সংস্কৃতি

কিন্তু শুধু বাণিজ্যেই এর শেষ নয়। নিয়ন্ত্রিত জগতের সংস্কৃতির ওপরেও বিশ্বায়নের প্রভাব গভীর। একধরনীকরণ (uniformity), আত্তীকরণ (appropriation) আর বিনির্মাণ (deconstruction) — এই তিন বৈশিষ্ট্য দিয়ে সেই প্রভাবটিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। একধরনীকরণের দিকচিহ্ন দুটি। একদিকে বাজার-দেশের (market country) লোকসাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করে একরকমের সমাজ মানসিকতা তৈরি করা হয়, যাতে দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে একই ধরনের পণ্যের চাহিদা, তাতে সুবিধে হয় পণ্য উৎপাদক দেশের বা বহুজাতিক কোম্পানির। অন্যদিকে ধনতন্ত্রমুখী সাংস্কৃতিক স্রোতটা বয়ে চলে পশ্চিম থেকে পুবে, পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্যে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে বা উন্নত জগৎ থেকে অনুন্নত বিকাশমান জগতে। গ্রহণের প্রান্তে পড়ে থাকে যে সমাজ সে সমাজ সহজেই এটা মেনে নেয়, কেননা, পণ্যভিত্তিক আধুনিকতার মোহ তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। আধুনিকতার পণ্যরূপটির শেকড় অবশ্যই পশ্চিমী সংস্কৃতিতে, অনেকটা সেই কারণেও এই একধরনীকরণ, যাকে প্রচার করা হয় 'হোমোজেনাইজেশন' (homogenization) বলে।

তবে কিছু কিছু সামাজিক প্রবণতা থেকেই যায়, যেগুলোকে এই একধরনীকরণ প্রক্রিয়ার ভেতরে আনা যায় না। বিশ্বায়নের উৎপাদন ব্যবস্থা সেই প্রবণতাকেও নিজের সঙ্গে জুড়ে নেয়। এইভাবেই বহুজাতিক উৎপাদক সংস্থাগুলো ভারতে আয়ুর্বেদকে ব্যবহার করে, কিংবা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যোগশাস্ত্রকে আধুনিক পণ্যের মোড়কে বিক্রি করে। এমনকি যে হিন্দুত্বের স্লোগান ভারতে একসময়ের দাঙ্গার কারণ হয়ে উঠেছিল, সেই হিন্দুত্বকেই পণ্য করে পুঁজি বাড়িয়ে নেয় বিশ্বায়িত চলচ্চিত্রশিল্প। বিশ্বায়নের ব্যাকরণে একেই বলে আত্তীকরণ।

বিশ্বায়নের তৃতীয় প্রভাবটিই সবচাইতে বেশি ধ্বংসাত্মক। যে সমাজ-এর লক্ষ্য, সেই সমাজের সাংস্কৃতিক বিনির্মাণ থেকেই এই ধ্বংসের শুরু। সামাজিক মূল্যবোধের স্থায়িত্ব বিশ্বায়ন সহ্য করে না, কেননা সেই মূল্যবোধ

একরূপী পণ্যকাঠামোর সঙ্গে খাপ খায় না। হিংস্রতা, সন্ত্রাস, খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, অপহরণ, প্রেমহীন যৌনতা সবই বিশ্বায়নের পণ্য, তাই সে এমন মূল্যবোধের পক্ষে সওয়াল করে যে মূল্যবোধে এগুলো মোটেই অস্বাভাবিক নয়। নারী - পুরুষের সম্পর্কের ধারণাও বিশ্বায়নের ফলে বদলে যায়। আগে যে অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর পরিবার দাঁড়িয়েছিল সেটা এর আগেই পারিবারিক শ্রম ও শ্রমবিভাজনের বদলের ফলে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ধনতন্ত্রায়ন তার কাঠামোটিকে পুরো ভাঙতে পারেনি। সেই ভাঙনকেই সম্পূর্ণ করে বিশ্বায়ন। গড়ে তোলে পণ্যভোগী অচেতন কিংবা মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিসত্তা।

প্রশ্ন ১। সমাজ-সংস্কৃতিকে বিশ্বায়নের কি প্রভাব পড়েছিল ?

বিশ্বায়ন যেমন পুঁজির সীমান্তহীন অবাধ চলাচলে চূড়ান্ত নমনীয়তা চায়, তেমনি দাবি করে জাতিরাষ্ট্রের সমঝোতার মানসিকতা, কূটনৈতিক কাঠামোর নম্রতা এবং সুশীল সমাজের (Civil Society) সৌজন্য-স্বীকৃতি। যেহেতু সুশীল সমাজের মানসিকতার সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্মতির প্রশ্ন জড়িয়ে থাকে, তাই বিশ্বায়ন সেই সমাজের সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধেরও নমনীয়তা চায়, সেই নমনীয়তা তৈরিও করে নেওয়া হয় সর্বত্রগামী গণমাধ্যমের (Media) সাহায্যে।

২.৭.২.৫ ঃ সারসংক্ষেপ

আর্থ-রাজনৈতিক নানা টানা পোড়েনের মধ্য দিয়ে কুড়ি শতকে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার পতন ঘটেছিল। সেই সঙ্গে সম্ভাবিত হয়েছিল মার্কিন পুলিশরাজ এবং পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন। সমাজ-সংস্কৃতির প্রতিটি স্তরে অনুভূত হয়েছিল এর প্রভাব। কুড়ি শতকের গোড়ায় পুঁজিবাদ বনাম সমাজতন্ত্রের যে দ্বান্দ্বিক বৈচিত্র্য ইতিহাসকে উত্তেজনাময় করে তুলেছিল, কুড়ি শতকের শেষে তার আর কোন অস্তিত্ব ছিল না।

২.৭.২.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

অলক কুমার ঘোষ ঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব, ১৮৭০-২০০৬

Eric Hobsbawm : The Age of Extremes

Archie Brown : The Gorbachev Factor

F. L. Allen : The Big Change

A. K. Ghosh : Globalization

২.৭.২.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। বিশ্বায়ন বলতে কী বোঝায়? সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর এর কী প্রতিফলন ঘটেছিল?

পর্যায় – ৬

একক- ১৫

৩১২.৬.১৫.০ উদ্দেশ্য

৩১২.৬.১৫.১ প্রস্তুতিপর্ব

৩১২.৬.১৫.২ তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব ও বিশ্বায়ন

৩১২.৬.১৬.৩ সংস্কৃতি ও বিশ্বায়ন

৩১২.৬.১৬.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩১২.৬.১৬.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৩১২.৬.১৫.০ উদ্দেশ্য ঃ বর্তমান পর্যায়টি ছাত্র- ছাত্রীদের বিশ্বায়ন সম্পর্কে এবং তার প্রভাব সম্পর্কে ধারণা দেবে। কিভাবে এই প্রক্রিয়া সমাজের বিভিন্ন দিকে গভির প্রভাব বিস্তার করল তা ব্যাখ্যা করা এই অংশের মূল উদ্দেশ্য।

ভুমিকাঃ আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাসে বিশ্বায়ন একটি অতি আলোচিত বিষয়। বিশ্বায়ন এমন একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া যার সঙ্গে রাজনীতি, সংস্কৃতি ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় যুক্ত থাকলেও এটির চরিত্র মূলত অর্থনৈতিক, তবে এক্ষেত্রে বলে রাখা প্রয়োজন বিশ্বায়ন কথাটির এত বিভিন্ন অর্থ এবং এত বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহ হয়েছে যে তার কোন সর্বজনগ্রাহ্য অভড়া দেওয়া সম্ভব নয়। রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান সকল ক্ষেত্রেই বিশ্বায়নের প্রভাব আছে। এটি একটি জগ্যব্যাপী প্রক্রিয়া, তবে, স্বল্পকথায় বলতে তোলে বলতে হয় বিশ্বাসন হল বিশ্বজুড়ে রাজার অর্থনীতির নজিরবিহীন বিস্তারের প্রেরিতে উৎপাদন ও মূলধনের অন্তঃরাষ্ট্রীয়করণ। তবে এই বিষয়ে আলোচনায় যাওয়ার আরো অর্থাৎ বিশ্বায়িত পৃথিবীর আত্মপ্রকাশ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণের আগে আমরা ঠাণ্ডা যুদ্ধ-উত্তর অন্য এক বিভাজিত বিশ্বের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব।

বিশ্বায়ন হল এক বিশেষ ধরনের প্রক্রিয়া। সম্ভবত ৯০-এর দশকে মার্কিন ব্যাংক আমেরিকান এক্সপ্রেস তাদের ব্রেডিং বিজ্ঞান বিশ্বায়ন কথাটি প্রথম প্রয়োতা করেছিলেন। এই বিশ্বায়ন বলতে বোঝায় এমন এক ব্যবস্থা সেখানে বিশ্বের প্রতিটি দেশের অর্থনীতি উন্মুক্ত এবং বিশ্বজুড়ে পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন বন্টন ও বিপনন ব্যবস্থা বাজার অর্থনীতির নিয়ম মেনে চলে ধরে বর্তমান সময়ে আর্থিক লেনদেন ও কার্যকলাপ বেড়েছে।

১৮৭০ থেকে ২০২১, এই অর্ধশতকে বিশ্বব্যবস্থা বদলে গেছে বারবার। উপনিবেশবাদী বিশ্ব থেকে দুই মেরু বিশ্ব, তারপর একমেরু বা বক্ষনের, তার থেকে পরমাণু বিশ্ব আবার অর্থনীতির ঐক্যায়নের বিশ্ব কত ব্যবস্থার আসা-যাওয়ায় বিশ্বব্যবস্থার ইতিহাস আকর্ষক হয়ে উঠেছে। ১৮৭০ সালে এক জাতি এক রাষ্ট্র-র আদর্শ অলঙ্ঘনীয় সীমান্ত বা বর্ডার-এর ধারণা তৈরি করেছিল। সেই সীমান্ত থেকেই নতুন নতুন জাতির জন্ম হয়েছে, আবার সেই সীমান্তে এসেই শেষ হয়ে গেছে অনেক জাতি। এইভাবেই রহস্যময়তা অর্জন করেছে বর্ডার, ইংরেজিতে যাকে বলে 'mystification of borders' । কখনও বাধ্য হয়ে, বিতাড়িত হয়ে, কখনও বা নতুন জীবনের খোঁজে মানুষও সীমান্ত পেরিয়েছে, জাতিত্যাগ করেছে, জাতিযোগ ঘটিয়েছে। বোর্নিও থেকে সিয়াকোয়াং-এ, লাইবেরিয়া বা সিয়েরা লিওন থেকে গায়নায়, কসোভো থেকে ইউরোপে, আফগানিস্তান থেকে ইরানে, পশ্চিম পাঞ্জাব (পাকিস্তান) থেকে পূর্ব পাঞ্জাবে (ভারত), পূর্ব-পাকিস্তান পরে বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল, তিব্বত, শ্রীলঙ্কা থেকে ভারতে, মায়ানমার বা বার্মা থেকে বাংলাদেশে বা ভারতে এই যাত্রা অন্তহীন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কেন্দ্রেও তারা। অনুপ্রবেশ আর অতি-সীমান্তক গুপ্তচর নিয়ে পাক-ভারত, বাংলাদেশে ভারত উত্তেজনা কখনও কমেনি। জর্ডনের উপাস্ত্র শিবির থেকে প্যালেস্তিনীয়দের

সংগঠনের জন্ম, ইসরাে তাই জর্ডনের উপর খড়গহস্ত হয়েছিল, লেবাননে তারা ঘাঁটি গেড়েছিল, আমেরিকা তাই লেবাননের ওপর বোমা ফেলেছিল। আবার পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তু স্রোতকে কূটনীতিতে কাজে লাগিয়ে ১৯৭০-৭১ সালে পাকিস্তানকে বিধ্বস্ত করেছিল ভারত। সেই উদ্বাস্তুর স্রোত, জাতিগঠন ও বিবর্তনের প্রক্রিয়া এখনও আছে পৃথিবীর সর্বত্র, কিন্তু কূটনীতির ধরন, কুড়ি শতকের শেষ দশক আর এই শতকের প্রথম দুই দশকে অনেক বদলে গেছে। উচ্চবর্গের পুঁজির নিয়ন্ত্রকরা আর বর্ডার নিয়ে অত ভাবে না, উদ্বাস্তুর চলাচলকে তারা দেখে শ্রম বা মেধার স্থানান্তর (diaspora) হিসেবে। ১৮৭০-এর দশকের 'জাতি' নিয়ে ভাবনা, তার থেকে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা'র চিন্তা, সেসব এখন আর মুখ্য নয়, এখন প্রধান হল অর্থনীতির বিশ্ব, আন্তর্জাতিকায়নের চাইতেও এখন বড়ো হল বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশন (Globalisation) বা ইকনমিক ইনটেগ্রেসন অব্ নি ওয়ার্ল্ড (Economic Integration of the World)।

৩১২.৬.১৫.১ প্রস্তুতিপর্ব

একদিনে হঠাৎ এই বিশ্বায়নের প্রসঙ্গ আসেনি। একদিকে হায়েক তাঁর The Road of Serfilom বইতে যে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণহীন সর্বশক্তিমান অর্থনৈতিক সমাজের কথা বলেছিলেন, তার নমনীয়তা, অন্যদিকে পল সুইজি যে বিপ্লবোত্তর সমাজ এর ছবি এঁকেছিলেন, তার নমনীয়তা, আর তৃতীয় পক্ষে নোয়াম চমস্কি Deterring Democracy বইতে যে সমাজতান্ত্রিক সমঝোতার কথা ভেবেছিলেন তার বাস্তবতা- এই তিন-এর পারস্পরিক লেনদেনই সম্ভবত বিশ্বারানের ধারণাকে দান বাধতে সাহায্য করেছে। ১৯৬০-৮০-র দশক ছিল Convergence theory বা বৈপরীত্যের মিলন"- তত্ত্বের যুগ। ধনতান্ত্রিক দেশগুলো তখন মিশ্র অর্থনীতি, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রতত্ত্ব আর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের পথে হেঁটেছে। আবার সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোও নজর রাখতে শুরু করেছে। বাজার অর্থনীতির দিকে। End of Ideology-র লেখক ড্যানিয়েল বেল যে দুই বিরোধী শিবিরের নিঃশব্দ বোঝাপড়ার আভাস দিয়েছিলেন, তাই হয়তো ঘটেছে তখন। দুই মার্কিন অর্থনীতিবিদ কার্ল ও মিনস-এর সমীক্ষার ভিত্তিতে বার্নহ্যাম তখন 'ম্যানেজেরিয়াল তত্ত্ব'-এর দিকে ঝুঁকেছিলেন। জাতীয় কোম্পানিগুলো ম্যানেজেরিয়াল এফিসিয়েন্সির ওপর ভর করে পুঁজির ঘনত্ব বাড়াবে, একই ভঙ্গিতে তা ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক দুই শিবিরেই ঘটাবে, এই ছিল পরিকল্পনা। 'ম্যানোজেরিয়াল ম্যানেজমেন্ট'-এর অন্যতম জাতিয়ার হবে টেকনোক্র্যাটরা, যাদের গলব্রেথ বলেছিলেন 'Countervailing Power টেকনোক্র্যাটদের ভোগ্যপণ্য প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা আর রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষণার ওপর ভর করে যখন জাতীয় সীমানা ভেঙ্গে বহুজাতিকতায় অভিষিক্ত হয়, তখন ঘটে। পুঁজির বিশ্বায়ন। ঘটে পুঁজির একরূপীকরণ। কল্যাণ রাষ্ট্রের বিদায় অনিবার্য হয়ে পড়ে, জাঁকিয়ে বসে পণ্যের স্বৈরতন্ত্র, সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ায় বিশ্বব্যাপী ভাসমান মূলধন। ইতিহাসের যে সমাপ্তির কথা ফুকুয়ামা বলেছিলেন, সম্ভবত সেই সমাপ্তিকে তিনি বিশ্বায়িত ভোগ্যপণ্য-সংস্কৃতির এই একরূপত্রের কাছে বহুমুখী অর্থনীতির নতিস্বীকারের সমার্থক বলে ভেবেছিলেন।

৩১২.৬.১৫.২ তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব ও বিশ্বায়ন

বিশ্বায়িত ভোগ্যপণ্য সংস্কৃতি এবং কেন্দ্রীয় উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যতম শর্ত অবশ্যই তথ্যপ্রযুক্তি। বিশ্বায়ন গতি পেয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি (Information Technology) হাত ধরে New International Information Order এর প্রতিশ্রুতি দিয়ে। তথ্যপ্রযুক্তির নতুন অবয়বকে এভার্ট রজার্স পুরোনো কাঠামোর ওপর নতুন ব্যবস্থার প্রসারিত প্রভাব হিসেবে দেখতে চেয়েছেন, আর মার্শাল ম্যাকলুহান একে বলেছেন নাটকীয় বা বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

এই তথ্যপ্রযুক্তির মূল্যায়ন তিনদিক থেকে করা যেতে পারে। এক, তথ্যসজ্ঞান, তথ্যসঞ্চালন ও তথ্যবাজারের সংরক্ষণ ও প্রসারণ। দুই, তথ্যমাধ্যমিক পণ্যায়ন এবং তিন, উদ্বৃত্ত মূল্যজনক প্রযুক্তি।প্রথম দিকটির ভিত্তি হল সাংখ্য বৈদ্যুতিন (digital) পদ্ধতির প্রয়োগ। ১৯৮ দশক থেকে উন্নত বিশ্বের অর্থনৈতিক এজেন্টগুলো স্যাটেলাইট কমপিউটারভিত্তিক তথ্যসংগ্রহ ব্যবস্থা (Computer Synthesized Satellite Receiver) চালু করেছে। তার ফলে গোটা বিশ্বের সম্পদ, চাহিদা, অসংখ্য জ ক্রয়ক্ষমতা, আঞ্চলিক সৃজনশীলতা এইসব তথ্যই যত বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে চলে যায়, প্রয়োজনমতো পুঁজির বিশ্বায়নে বা অলীকরণে বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট'-এর বা টেকনোক্র্যাটদের কাজে লেগে যায়। ডিজিটাল আর্কাইভ ব্যব দরকারি তথা জমিয়েও রাখা যায়, সময়মতো কাজে লাগবে বলে, বা সেই তথ্য মোটা দামে বিক্রি

করা যাবে বলে। এইভাবেই তথ্য নিজেই পণ্যায়িত (commoditised) হয়ে যায়, প্রসারিত হয় তথ্যবাজার। সাধারণ অবস্থায় এই তথ্যবাজারের সবচাইতে দরকারি যোগাযোগ প্রযুক্তি হল ইন্টারনেট এবং ইন্ট্রানেট। এদের দৌলতেই পৃথিবীর ভোক্তারা আজ আর কোনও বিশেষ রাষ্ট্রের 'সিটিজেন' বা নাগরিক নন, তাঁরা সকলেই হয়ে

পড়েন 'নেটিজেন', ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ ছাড়া তাদের জীবন চল দ্বিতীয়ত, এই তথ্যপ্রযুক্তিই এখন গোটা পৃথিবীর পণ্য বাণিজ্যের সবচাইতে বড়ো হাতিয়ার। এর মাধ্যমেই তৈরি হয় ক্রেতা, গড়ে ওঠে তার চাহিদা আর তার যোগাযোগ হয় বিক্রেতা বা উৎপাদকের সঙ্গে। ১৯৯০-এর দশকে স্যাটেলাইট সম্প্রচারে ছাড়পত্র দিয়ে ভারতে এই ব্যবস্থার সূচনা করেছিলেন অর্থমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং, যে মনমোহন সিং পরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী। মানুষের খাওয়া পরা প্রসাধন বা শরীরচর্চা সবই ঠিক করে নেয় এই স্যাটেলাইট পণ্যায়ন, নিউজ কর্পোরেশনের কর্ণধার রুপার্ট মার্তোককে এখন বলা হয় 'আকাশের আলেকজান্ডার'। তার একমাত্র কাজ ছিল সংবাদ, খেলাধুলা, বিনোদন এবং মানুষের শৈশবকেও স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা। এই নিয়েই যেন তিনি পৃথিবীকে পণ্যসংস্কৃতি ছেয়ে দেবেন, জয় করে নেবেন গোটা বিশ্বকে।

তৃতীয়ত, তথ্যসংগ্রহ আর তার উৎপাদনমুখী ব্যবহারের নানা কৌশল উদ্ভাবন করে উদ্বৃত্ত মূল্যও সৃষ্টি করতে পারে তথ্যপ্রযুক্তি। বিভিন্ন রকমের সফট্ওয়্যারই তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সারা বিশ্বে যে নেটভিত্তিক বাণিজ্য চলে ই-কমার্স, ই-ব্যাংকিং বা ই-শপিং এর হাত ধরে তার মূলেও এই সফট্ওয়্যার।

অর্থনীতি ও পুঁজিশাস্ত্রের একটি দরকারি বিষয়ের আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক। উনিশ শতকে রিকার্ডো 'Theory of Comparative Advantage' শীর্ষক একটি আলোচনা করেছিলেন। তিনি এমন একটি বাণিজ্য ব্যবস্থার কথা ভেবেছিলেন, যেখানে নিচু হারে থাকা মজুরির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শ্রম-নিবিড় দেশগুলোকে উৎপাদনের ব্যাপারে তুলনামূলক সুবিধা (comparative advantage) দেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে ঐসব দেশে পণ্যের মূল্যমান কম থাকবে এবং মুক্ত বাণিজ্যের আবহাওয়ায় উঁচু হাতেবাঁধা মজুরির যন্ত্র-নিবিড় উৎপাদনের বিদেশী পণ্য ঐ দেশগুলোর বাজার দখল করতে পারবে না। এইভাবে অনুন্নত দেশ মুক্ত বাণিজ্যের দুনিয়ায় আপেক্ষিক সুবি করতে পারবে।

বিশ্বায়নের অর্থনীতি, প্রযুক্তির হাতবদল এবং তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার রিকার্ডোর ভাবনাটাকে অচল করে ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে মুশকিলে ফেলে দিয়েছে। উন্নত প্রযুক্তি ও পুঁজির দ্রুত চলাচল নিচু মজুরির দেশের শ্রমকে উন্নত অর্থনীতির দেশে রফতানির সুযোগ করে দিয়েছে। ফলে উন্নত দেশেই নিচু মঞ্জুরির সমান্তরাল উৎপাদন কাঠামো তৈরি হয়ে গেছে। মুক্ত বাণিজ্যের আপেক্ষিক সুবিধার তা এইভাবেই উন্নত দেশের পক্ষে দাঁড়িয়ে গেছে। অবশেষে ডিজিটাল ও তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লব রিকার্ডোর তত্ত্বকেই বিপরীত মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আউটসোর্সিং-এর কা এখন শ্রম-প্রতুল দেশে বসেই যোগাযোগ বিপ্লবের (Information Revolution সুযোগে উন্নত দেশের উৎপাদনের কাজ সেরে ফেলা যায়। এ এক নতুন ধরনের পুঁজির উপনিবেশায়ন।

৩১২.৬.১৬.৩ সংস্কৃতি ও বিশ্বায়ন

কিন্তু শুধু বাণিজ্যেই এর শেষ নয়। নিয়ন্ত্রিত জগতের সংস্কৃতির ওপরেও বিশ্বায়নের প্রভাব গভীর। একধরনীকরণ (uniformity), আত্তীকরণ (appropriation), আর বিনির্মাণ (deconstruction)—এই তিন বৈশিষ্ট্য দিয়ে সেই প্রভাবটিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। একধরনীকরণের দিকচিহ্ন দুটি। একদিকে বাজার দেশের (market country) লোকসাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করে একরকমের সমাজ-মানসিকতা তৈরি করা হয়, যাতে দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে একই ধরনের পণ্যের চাহিদা, তাতে সুবিধে হয় পণ্য উৎপাদক দেশের বা বহুজাতিক কোম্পানির। অন্যদিকে ধনতন্ত্রমুখী সাংস্কৃতিক স্রোতটা বয়ে চলে পশ্চিম থেকে পূর্বে, পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্যে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে বা উন্নত জগৎ থেকে অনুন্নত বিকাশমান জগতে। গ্রহণের প্রান্তে পড়ে থাকে যে সমাজ সে সমাজ সহজেই এটা মেনে নেয়, কেননা, পণ্যভিত্তিক আধুনিকতার মোহ তাকে। আচ্ছন্ন করে রাখে। আধুনিকতার পণ্যরূপটির শেকড় অবশ্যই পশ্চিমী সংস্কৃতিতে, অনেকটা সেই কারণেও এই একধরনীকরণ, যাকে প্রচার করা হয় 'হোমোজেনাইজেশন' (homogenisation) বলে।

তবে কিছু কিছু সামাজিক প্রবণতা থেকেই যায়, যেগুলোকে এই একধরনীকরণ প্রক্রিয়ার ভেতরে আনা যায় না। বিশ্বায়নের উৎপাদন ব্যবস্থা সেই প্রবণতাকেও নিজের সঙ্গে জুড়ে নেয়। এইভাবেই বহুজাতিক উৎপাদক সংস্থাগুলো ভারতে আয়ুর্বেদবো ব্যবহার করে, কিংবা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যোগশাস্ত্রকে আধুনিক পণ্যের মোড়কে বিভিন্ন করে। এমনকি যে ধর্মান্ধতার স্লোগান ভারতে একসময়ের দাঙ্গার কারণ হয়ে উঠেছিল, সেই ধর্মান্ধতাকেই গণ্য করে পুঁজি বাড়িয়ে নেয় বিশ্বায়িত উৎপাদক সংস্থা। বিশ্বায়নের ব্যাকরণে একেই বলে আত্তীকরণ।

বিশ্বায়নের তৃতীয় প্রভাবটিই সবচাইতে বেশি ধ্বংসাত্মক। যে সমাজ এর লক্ষ্য, সেই সমাজের সাংস্কৃতিক বিনির্মাণ থেকেই এই ধ্বংসের শুরু। সামাজিক মূল্যবোধের স্থায়িত্ব বিশ্বায়ন সহ্য করে না, কেননা সেই মূল্যবোধ একরূপী পণ্যকাঠামোর সঙ্গে খাপ খায়। না। হিংস্রতা, সন্ত্রাস, খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, অপহরণ, প্রেমহীন যৌনতা সবই বিশ্বায়নের পণ্য, তাই সে এমন মূল্যবোধের পক্ষে সওয়াল করে, যে মূল্যবোধে এগুলো মোটেই অস্বাভাবিক নয়। নারী-পুরুষের সম্পর্কের ধারণাও বিশ্বায়নের ফলে বদলে যায়। আগে যে অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর পরিবার দাঁড়িয়েছিল সেটা এর আগেই পারিবারিক শ্রম ও শ্রমবিভাজনের বদলের ফলে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ধনতন্ত্রায়ন তার কাঠামোটিকে পুরো ভাঙ্গতে পারিনি। সেই ভাঙ্গনকেই সম্পূর্ণ করে বিশ্বায়ন। গড়ে তোলে পণ্যভোগী অচেতন কিংবা মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিসত্তা।

বিশ্বায়ন যেমন পুঁজির সীমান্তহীন অবাধ চলাচলে চূড়ান্ত নমনীয়তা চায়, তেমনি দাবি করে জাতিরাষ্ট্রের সমঝোতার মানসিকতা, কূটনৈতিক কাঠামোর নয়তা এবং সুশীল সমাজের (Civil Society) সৌজন্য-স্বীকৃতি। যেহেতু সুশীল সমাজের মানসিকতার। সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্মতির প্রশ্ন জড়িয়ে থাকে, তাই বিশ্বায়ন সেই সমাজের সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধেরও নমনীয়তা চায়, সেই নমনীয়তা তৈরিও করে নেওয়া হয়। সর্বত্রগামী গণমাধ্যমের (Media) সাহায্যে।

এই গণমাধ্যমই একুশ শতকে এক 'পোস্ট-ট্রুথ' যুগের অভ্যুদয় ঘটিয়েছে। নিউ মিডিয়া'র দৌলতে এখন 'Networked global public arena' যে দ্রুততায় তথ্যরাজি উৎপাদন করছে, তাতে আর শুদ্ধাশুদ্ধ বিচারের কোনও জায়গা নেই। সত্যি আর সত্যি বলে কিছু নেই, এখন শুধুই উত্তর-সত্য। পাঠক, দর্শক, শ্রোতা এখন তথ্যের গ্রাহকও বটে, অষ্টাও বটে। ইয়েটস্ যে বলেছিলেন, 'centre cannot hold' সেই অবস্থাই তৈরি হয়েছে এখন। নানা ব্যাখ্যানের ‘cacophony' ব্যাখ্যা তার কেন্দ্রীয় আধিপত্যকেই ভেঙ্গে দিয়েছে।

৩১২.৬.১৬.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১) আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বর্তমান বিশ্ব ঃ অলক কুমার ঘোষ

২) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস- প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

৩১২.৬.১৬.৫ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

1) What do you mean by Globalization ? Do you feel its impacts?

2) Do you think Globalization impacted the present day culture of human civilization?

3) How did information revolution changed the world?